অন্তর্ভারতীয় পুস্তক-মালা

উর্দু গল্প সংকলন

উর্দু গল্প সংকলন

কৃশন চন্দর
রাজেন্দ্র সিং বেদী
ইস্মত চুগতাই

অনুবাদক
ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নয়াদিল্লি

প্রথম মুদ্রণ 1975 (শকাব্দ 1897)
দ্বিতীয় মুদ্রণ 1983 (শকাব্দ 1905)
তৃতীয় মুদ্রণ 1985 (শকাব্দ 1906)

Rs. 13·00

Original Title : URDU KAHANIYAN (HINDI)
Bengali Translation : URDU GALPA SANKALAN

Published by Director, National Book Trust, India,
A-5 Green Park, New Delhi-110016 and printed by
Jupiter Offset Press, B-10/3, Jhilmil Industrial Area,
Delhi-110032

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

উর্দু সাহিত্যের ধারা তিনটি : সংস্কৃত আর প্রাকৃতের ধারা, আরবী আর ফারসীর ধারা, এবং ইংরেজী আর অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষার ধারা। উর্দু সাহিত্যের এশীয় উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত লোককথা, সাহিত্যিক কথা আর উচ্চাঙ্গের কাব্যাত্মক তথা গদ্যাত্মক গল্পের মাঝে মাঝে ছোট ছোট উপ-কথার অমূল্য সম্পদ পাওয়া যায়।

জীবনে আর সাহিত্যে পরম্পরা আর নব নব পরিবর্তনের এক ক্রম পাওয়া যায়। এ দুয়ের মধ্যে কখনো সংঘর্ষ হয়, আবার কখনো সামঞ্জস্য ও সমন্বয় হয়। বর্তমান উর্দু গল্পের পুঁজি প্রাচীন পরম্পরা আর নূতন প্রবর্তনের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ।

অন্বেষণের দৃষ্টিকে অনেকদূর পর্যন্ত নিয়ে গেলে আমরা দেখতে পাব 1857 খৃস্টাব্দের আগেই যে উর্দু সমাচার-পত্র উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের কেন্দ্রগুলি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে সংবাদসমূহকে গল্পের রূপ দেওয়া হত আর কখনো-কখনো ছোট ছোট কল্প-কাহিনীও প্রকাশিত হত। এই ক্ষেত্রে 'ফবায়দুলনাজরীন'-এর সম্পাদক মাস্টার রামচন্দ্র দেহ্লবীর সংবাদপত্র-সেবা বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে পশ্চিমী গল্প উর্দু গল্পের রঙ-ঢঙ কাট-ছাঁট আর সংগঠন-সংরচনকে বিংশ শতাব্দে স্পষ্টরূপে প্রভাবিত করেছে। এই শতাব্দীর গোড়া থেকে রোমানিয়ত (রোমান্টিকতা)-এর প্রভাব দেখা যায়। পশ্চিমী দুনিয়াতেও রোমান্টিক প্রবৃত্তি গোড়া থেকেই বিকশিত হয়েছিল আর তার প্রভাব উর্দু গল্পের উপর পড়েছিল। দ্বিতীয় কথা এই যে, উর্দু সাহিত্যের সাধারণ প্রকৃতি, বিশেষতঃ দাস্তান আর কিস্সা-কাহিনীর মুখ্য প্রকৃতি, রোমান্টিক ছিল। রোমান্টিকতার পরে য়ুরোপে বাস্তববাদ (রিয়্যালিজম) সূচিত হয় আর উর্দু গল্পের দুনিয়াতেও তার প্রতিফলন দেখা যায়।

এ কথা বলা উচিত হবে না যে বাস্তববাদ রোমান্টিকতার মূল থেকে বেরিয়েছে। বিংশ শতাব্দে অনেক দিন পর্যন্ত রোমান্টিকতা আর বাস্তববাদের দুই ধারা একই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয়েছে; কখনো এরকমও হয়েছে যে এক প্রবৃত্তি অপর প্রবৃত্তিকে প্রভাবিত করেছে। সাহিত্য আর জীবনের মাঝে এমন কোনো লোহার পাঁচিল নেই যা পার হওয়া যায় না। ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, যদি কলাকার বাস্তবতার গভীরতায় ডুবে যান তা হলে রোমান্টিকতার নবীনতম ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। বাস্তব দৃষ্টির গভীরতার ভিতরে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্চর্য সম্পদ তার নতুন অভিব্যক্তির দ্বারা পাঠকদের মধ্যে রোমান্টিক ভাবনা জাগিয়ে তোলে। একইভাবে রোমান্টিকতার এক অপরিবর্তনীয় সত্য আছে। ব্যাপক দৃষ্টিসম্পন্ন কলাকার রোমান্টিকতার উপস্থিতিতে বাস্তবকে চমৎকার রূপে দেখেন ও দেখান।

উর্দু গল্পের জগৎকে আর-এক মহত্ত্বপূর্ণ বিশ্বব্যাপী আন্দোলন প্রভাবিত করেছে। তাকে বলা হয় প্রগতিশীল আন্দোলন। সত্যি কথা বলতে, বিশ্বসাহিত্যে এই আন্দোলনের সূচনা রুশ-বিপ্লবের আগেই হয়েছিল। রুশী, ফরাসী, ইংরেজী আর উর্দু সাহিত্যে 1918 খৃস্টাব্দের আগে থেকেই প্রগতিশীল মনোভাব দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, প্রগতিশীল আন্দোলনের বিধিবদ্ধ সংগঠন রুশদেশের সাম্যবাদী বিপ্লবের পরেই হয়েছে। এই আন্দোলনের প্রবর্তকেরা আলোচনাত্মক, সামাজিক, বৈপ্লবিক বাস্তবতাকে সাহিত্যের জন্য অনিবার্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। উর্দু গল্পে এই আন্দোলনের গুঞ্জন উচ্চগ্রামে শোনা যেতে থাকে 1936 খৃস্টাব্দ থেকে। তখন পর্যন্ত প্রগতিশীল কাহিনীকার আপন সৃজনাত্মক কর্মে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু 1936 থেকে 1946 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রগতিশীলতার ক্ষেত্রে অনেক সমৃদ্ধ উপলব্ধির জন্ম হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে আর এর পরে এই আন্দোলনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে বিরোধও ঘটেছিল।

প্রগতিশীল আন্দোলনে সম্মিলিত সব কাহিনীকারই সাম্যবাদী বা সমাজবাদী ছিলেন না। উর্দু প্রগতিশীলতার চক্রনেমি বৈচিত্র্যপূর্ণ, তথাপি প্রগতিশীল লেখক আর কবিদের মধ্যে আমরা কিছু সাধারণ লক্ষণও খুঁজে পাই। এক মূল বিষয়ের চর্চা গোড়াতেই হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া আমাদের প্রগতিশীল লেখক ও কবি রাষ্ট্রপ্রেমী হবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিস্টবিরোধী আর সাম্রাজ্যবিরোধী ছিলেন। এই রঙ উর্দু গল্পলেখকদের গায়েও লেগেছিল।

প্রগতিশীলতার চরমোৎকর্ষের কালেই উর্দু গল্পে মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের গভীর প্রবৃত্তি উছলে পড়েছিল। তারপরে এই মনো-বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি রহস্যবাদিতার সঙ্গে মিলে গিয়ে 'আধুনিকতা'র আর-এক প্রবৃত্তির জন্ম দিয়েছিল। আধুনিকতা এক দিক থেকে প্রগতিশীলতার তীব্র সংগঠনের প্রতিক্রিয়াও বটে। আজকাল নবীন উর্দু গল্পলেখকদের একটা বড়ো অংশ আধুনিকতার জন্য প্রাণ দিতে-চায়, কিন্তু বর্তমান যুগে উর্দু গল্পলেখকদের উপরোক্ত প্রবৃত্তি আর আন্দোলনের রচনাত্মক উপলব্ধিও আমরা দেখছি।

উর্দু রোমান্টিক গল্পের প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের সূচীতে আমরা পাই সাজ্জাদ হায়দর 'অলদরল', নিয়াজ ফতেহপুরী, লতীফ আহমদ আকবরাবাদী, হিজাব, ইমতিয়াজ আলী তাজ, মজনু গোরখপুরী, মীরজা আদীব, কুর্‌রতুল-ঐন হায়দার প্রভৃতির নাম। এঁরা ছাড়া আরো অনেক গল্পকার রোমান্টিক ঢঙে লিখে থাকেন। বাস্তববাদীদের অগ্রভাগে আছেন প্রেমচন্দ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন, আজম কুরৈবী, আলী আব্বাস হুসৈনী ও আরো অনেক নিপুণ কাহিনীকার উর্দু সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কৌতূহলের বিষয় এই যে বাস্তববাদ আন্দোলন রোমান্টিকতাকেও প্রভাবিত করেছিল, আর তা থেকে কোনো কোনো সাহিত্যকার কখনো কখনো সামাজিক বাস্তববাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রেমচন্দ আর আলী আব্বাস হুসৈনীর অনেক গল্প এ কথাই প্রমাণ করে যে এই দুই কলাকার প্রগতিশীলতার ধারাতেও নিজস্ব ধারা বজায় রেখেছিলেন। উর্দু গল্পের দুনিয়ায়

প্রগতিশীল আন্দোলন অনেক উৎকৃষ্ট কলাকারের জন্ম দিয়েছিল, যেমন— সআদত হসন মঁটো, অখতর হুসৈন রায়পুরী, রসীদ জঁহা, কৃশন চন্দর, রাজেন্দ্রসিংহ বেদী, ইসমত চুগ্‌তাই, আহমদ নদীম কাসিমী, মুমতাজ মুফতী, হয়াতুল্লাহ্ আনসারী প্রভৃতি। এ ছাড়াও প্রগতিশীল আন্দোলনের চরমোৎকর্ষের কালে প্রগতিশীলতা কেবল উর্দূ সাহিত্য কাব্যের উপর ছায়া ফেলে নি, পরন্তু আমার যতদূর জানা আছে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্য, কাব্যের ভূমির উপরেও ঘন ছায়া ফেলেছিল।

সাহিত্য আর জীবনপ্রবৃত্তি, যুগ আর প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো নিশ্চিত অনুশাসিত সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া যায় না। আমার বিচারে, উর্দূ গল্পে মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তথা সমন্বয় এবং বিস্তীর্ণ সীমায় অগ্রসর আধুনিকতার প্রবৃত্তি প্রগতিশীলতার চরমোৎকর্ষের কালেই সূচিত হয়েছিল। পরন্তু কোনো কোনো লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রগতিশীল কাহিনীকার মানবিক সংবেদনের কোণ আর অন্তরালকে দৃষ্টিগোচর করিয়ে দেওয়ার মতো প্রকাশসামর্থ্য দেখিয়েছিলেন। এই সন্দর্ভে রাজেন্দ্রসিংহ বেদী, সআদত হসন মঁটো, কৃশন চন্দর, ইস্মত চুগ্‌তাই আর মুমতাজ মুফতীর কয়েকটি গল্পে মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লে-ষণকে নৈপুণ্যসমৃদ্ধ বলা যেতে পারে। মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের বিশেষ ধারার অগ্রদূত হলেন হসন অসকরী আর মোহসিন আজীমা-বাদী। হসন অসকরী অবিবেক থেকে উছলে-পড়া তরঙ্গকে বিবেকের স্তরে প্রবাহিত পরিস্থিতিতে পৌঁছে দেন। তার গল্প 'হারামজাদী' এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু মোহসিন আজীমাবাদী মনোবৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলিকে নিজের গল্পের শীর্ষক বানিয়ে গল্প লেখেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গল্প 'অনৌখী মুস্‌কুরাহট' তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প। শহীদ আহমদ দেহলবী-প্রকাশিত সংগ্রহ 'রেজা-ঐ-মীনা'কে এক মহত্ত্বপূর্ণ গল্পরূপে তা গৃহীত। কর্‌রতুল-ঐন হায়দরের প্রারম্ভিক গল্পগুলির মধ্যে অবি-বেকাত্মক আর বিবেকাত্মক ধারা স্বাভাবিক বিশৃঙ্খলায় রূপায়িত; কিন্তু তা উন্মাদনা থেকে চেতনার জন্ম দিয়ে সার্থকতা লাভ করেছে।

এ কথা স্পষ্ট যে প্রত্যেক নিপুণ গল্পকার তখনি সফল হতে পারেন যখন তিনি পার্থিবতা আর নৈসর্গিকতা, এ দুয়ের সঙ্গে খুব ভালোভাবে পরিচিত হন, এবং চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনা-সংগঠন ও বাতাবরণ-সংযোজনে ঐ ঘনিষ্ঠ পরিচয়কে শিল্পোচিত ব্যবহার করেন। আমার বিচারে রাজেন্দ্র সিংহ বেদী মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর এই জ্ঞানকে তিনি বড়ো কলানিপুণতার সঙ্গে প্রয়োগ করেন। অবশ্য তাঁর এক-আধটা গল্পে কিছুটা ত্রুটি থেকে গেছে। মোহসিন অজীমাবাদীর শিল্পনৈপুণ্যের উপর তাঁর মনোবিজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে থাকে, কিন্তু মঁটো, মুমতাজ মুফতী, কৃশন চন্দর আর ইস্মত চুগ্‌তাই এই দুর্বলতার দ্বারা খুব কমই অভিভূত হয়েছেন।

বর্তমান সংকলনে কৃশন চন্দর, বেদী আর ইস্মত চুগ্‌তাইয়ের গল্প সংকলিত হয়েছে। এই কারণে তাঁদের সম্পর্কে কিছুটা সবিস্তারে বলতে চাই। প্রথমেই আমি এ কথা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে আমাদের অন্যান্য লেখকদের সৃজনশক্তি হ্রাস পায় নি, পরম্পরায় তাঁদের গভীর প্রভাব উর্দু গল্পজগৎ থেকে চলে যায় নি। তা আজ পর্যন্ত প্রবল আছে, বেড়ে চলেছে এবং ব্যক্তিকতার অভিব্যক্তির সঙ্গে কুর্‌রতুল-ঐন হায়দার, কাজী অবদুস সত্তার, গয়াস আহমদ গদ্দী এবং কোনো কোনো নতুন আর নিপুণ গল্পকার উর্দু গল্পসম্পদ বিশেষরূপে বিস্তার করে দিচ্ছেন। আধুনিকতাবাদী দলেও এমন কিছু কিছু নিপুণ গল্পকার আবির্ভূত হচ্ছেন। তাঁরা প্রতীকাত্মক আর বিশ্লেষণাত্মক নতুন গল্প নতুন-নতুন রূপে আর প্রকারে লিখে চলেছেন।

কৃশন চন্দর অনেক লিখেছেন। তাঁর গোড়ার দিকে গল্পগুলি তো রোমান্টিকতায় অভিষিক্ত, কিন্তু তাঁর রচনায় গোড়া থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে এই রোমান্সবাদী কলাকার বাস্তবের প্রতিও গভীর দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। আমার বিচারে তো শ্রেষ্ঠ সমর্থ লেখক রোমান্টিকতা আর বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয় আর সামঞ্জস্য সাধন করে

জাদু সৃষ্টি করেন।

কৃশন চন্দর কেবল উর্দু ভাষার প্রসিদ্ধ গল্পলেখক নন, পরন্তু তাঁর বেশ কিছু গল্প সকল ভাষার শ্রেষ্ঠ গল্পের পর্যায়ে রাখা যেতে পারে। কৃশন চন্দর অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন, বিচারশীল, মানববাদী, আর বাস্তববাদী কাহিনীকার। তাঁর রচনাশৈলী খুব গতিসম্পন্ন। তাতে আছে মধুরতা, আলোক আর সুগন্ধ, কিন্তু তিনি জীবনের কালিমাপূর্ণ স্রোতের চিত্রও নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন।

রাজেন্দ্র সিংহ বেদীর শিল্পকলা অত্যন্ত গাঢ় আর মধুর। তাঁর গল্পে গাম্ভীর্য আর গভীরতা পাওয়া যায়। তিনিও উচ্চকোটির বাস্তববাদী লেখক। কিন্তু তাঁর প্রগতিশীল মানববাদী উপদেশাত্মকতা এত সংযত যে কলার মধু কলস থেকে উপচে পেয়ালা পর্যন্ত অসংযত ভাবে অতিক্রম করে যায় না। বেদীর গল্পের শিল্পকলা তাঁর ব্যক্তিত্ব আর আপন কলা-অভিরুচির অনুসারী। তিনি মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ খুব নিপুণ ঢঙে করেন। কৃশন চন্দরের শৈলী বেদীর শৈলী থেকে ভিন্ন, কিন্তু দুজনেই কলার অনুশাসনের সঙ্গে গল্পের প্রকৃতির সামঞ্জস্য সাধন করে শিল্পের দাবি পূরণ করে থাকেন।

ইস্মত চুগ্‌তাইও এক উচ্চকোটির কলাকার। তিনি উর্দু সাহিত্যকে বেশকিছু অতি মূল্যবান গল্প দিয়েছেন। তাঁর সামাজিক দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর। মনোবিজ্ঞানের সমস্যার জটিলতার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় আছে। তাঁর শৈলীতে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। নারীচরিত্রের মুখে ভাষা দিতে তিনি অদ্বিতীয়।

কৃশন চন্দর, বেদী আর ইস্মত উর্দু গল্পের পুষ্প-সমুচ্চয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুল। তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পের নির্বাচনে মতভেদ থাকতে পারে, তবে এই বইয়ে সংকলিত গল্পগুলি আমাদের উর্দু সাহিত্যের তিন মহান কলাকারের প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প, তাতে সন্দেহ নেই।

অধ্যক্ষ, উর্দু বিভাগ,
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

অখতর ওরেন্বী

সূচীপত্র

লেখক-পরিচয়

কৃশন চন্দর

কৃশন চন্দর উর্দুর অতি প্রসিদ্ধ কাহিনীকার। তাঁর বহুসংখ্যক গল্প প্রথম শ্রেণীর গল্প বলে গণ্য হয়। কৃশন চন্দর জীবনের প্রতি আস্থা এবং মানব-সহানুভূতির কথাশিল্পী। তাঁর কথাশৈলীতে আছে আশ্চর্য প্রবাহ। এতে আছে মধুরতা, আলোক আর সুগন্ধ। তিনি জীবনের কালো দিকগুলিকেও নিপুণতার সঙ্গে প্রকাশ করেন।

রাজেন্দ্র সিং বেদী

রাজেন্দ্র সিংহ বেদীও উর্দুর এক অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ কাহিনীকার। তাঁর শিল্পকলা নিপুণ আর পরিপুষ্ট। তাঁর গল্পে শান্তি আর গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। বেদী প্রথম শ্রেণীর সত্যনিষ্ঠ লেখক। তাঁর শৈলী ও কলানিপুণতা তাঁর স্বভাবানুসারী। তিনি বড় নিপুণভাবে মানুষের বাস্তব জীবনের বিশ্লেষণ করেন।

ইস্মত চুগ্‌তাই

ইস্মত চুগ্‌তাই এক উচ্চকোটির গল্পলেখিকা। তিনি উর্দু সাহিত্যকে অনেক ভালো ভালো গল্প দিয়েছেন। তাঁর বাস্তব-অধ্যয়ন গভীর। তিনি মানবমনের গোপন কোণগুলিকেও খুব ভালো করে জানেন। ইস্মতের শৈলীতে আছে নিপুণ কুশলতা। নারীচরিত্রের স্বভাব ও ভাষা চিত্রণে তাঁর জুড়ি নেই।

কৃশন চন্দর

ভরা চাঁদের রাত

সেদিন ছিল এপ্রিল মাস। বাদামগাছের ডালগুলি ফুলে ভরে গেছে। বাতাস বরফের মতো ঠাণ্ডা। তা সত্ত্বেও বসন্ত ঋতুর সৌন্দর্যের ইসারা পাওয়া গেছে। উঁচু উঁচু চূড়ার পাদদেশে সবুজ মখমলের মতো দূর্বার উপর এখানে-ওখানে বরফের টুকরো পড়ে আছে। দেখে মনে হয় শাদা ফুল ফুটে আছে। আগামী মাস পর্যন্ত এই সবুজ দূর্বার উপর এইসব শাদা ফুল শোভিত হয়ে থাকে। দূর্বার রঙ হয়ে যাবে গাঢ় সবুজ, আর বাদামগাছের শাখাগুলিতে সবুজ সবুজ বাদামফল পোখরাজ-মণির মতো ঝিকমিক করবে। আর নীল নীল পর্বতের মুখ থেকে কুয়াশা বিলীন হয়ে যাবে। এই ঝিলের পুলের ওপারে পাকদণ্ডীর মোলায়েম ধুলো ভেড়াগুলির আনন্দসূচক 'বা-আ' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠবে। আর এই উঁচু উঁচু চূড়ার পাদদেশে রাখালেরা ভেড়াদের শরীর থেকে শরৎ ঋতুতে উপজিত মোটা পশম কাটতে থাকবে আর গান গাইতে থাকবে।

কিন্তু এখন এপ্রিল মাস নয়। এখন পাহাড়ের চূড়ায় গাছের পাতা দেখা যায় না। এখন পাহাড়ের গায়ে রযেছে বরফ আর কুয়াশা। এখন পাকদণ্ডী ভেড়ার ডাকে মুখরিত হয়ে ওঠে নি। এখন সমল ঝিলে কমলের দীপ জ্বলে নি। পদ্মপাতায় আচ্ছাদিত ঝিলের গভীর সবুজ জল আপন বুকের ভিতর লাখো লাখো পদ্ম এখন লুকিয়ে রাখে নি। ঐসব পদ্ম বসন্ত ঋতুর আগমনে ঝিলের বুকে স্তরে স্তরে সহজ মৃদু হাসির মতো ফুটে উঠবে। পুলের কিনারে বাদামগাছের শাখাগুলিতে এখন কুঁড়ি ফুটি-ফুটি করছে। এপ্রিলের শেষ রাতে যখন বাদামের ফুলগুলি জাগতে শুরু করে আর বসন্ত ঋতুর দূতরূপে ঝিলের জলে আপন নৌকা ভাসায়, তখন ফুলের মতো ছোট নরম ভেলাগুলি জলের উপর বসন্ত ঋতুর প্রতীক্ষায় নাচতে থাকে।

পুলের রেলিঙ ধরে আমি অনেকক্ষণ তার প্রতীক্ষা করছিলাম। বিকেল শেষ হয়ে গেছে, সন্ধ্যা নেমে আসছে। বুল্লর ঝিলগামী

হাউসবোটগুলি পাথরের থামগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাচ্ছিল। দিকচক্রবাল কাগজের নৌকার মতো অস্পষ্ট আর ঝাপসা দেখাচ্ছিল। সন্ধ্যার আবীর-রঙ ক্রমশ ঘনকালো হয়ে আসছিল। এখানে বাদাম-গাছগুলির আড়ালে পাকদণ্ডী-পথ ঘুমিয়ে গেল। আর রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রথম তারাটি কোনো-এক পথিকের গানের মতো মনে হল। বাতাসের শিরশিরানি অসহ্য হয়ে উঠল আর নাকের পাটা বাতাসের বরফ-স্পর্শে অসাড় হয়ে গেল।

আর ঐ যে চাঁদ উঠল।

আর ঐ তো সে আসছে।

খুব দ্রুতপদক্ষেপে সে আসছে। বরং বলা যায় পাকদণ্ডীর ঢালু পথ বেয়ে সে দৌড়ে আসছে। ও একেবারে আমার সামনে এসে থেমে গেল আর ধীরস্বরে বলল, 'এই যে।'

দ্রুতলয়ে তার শ্বাস পড়ছে। মাঝে মাঝে শ্বাস বন্ধ হয়ে আবার দ্রুত চলছে। ও আমার কাঁধের উপর আপন আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল আর মাথাটি সেখানে রাখল। তার ঘন কালো কেশের রাশি আমার হৃদয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। তখন আমি তাকে বললাম : 'বিকেল থেকে আমি তোমার প্রতীক্ষা করছি।'

সে হেসে বলল, 'এখন রাত হয়ে গেছে। এ খুব সুন্দর রাত।'

সে তার নরম হাতখানি আমার অন্য কাঁধের উপর রাখল, যেন ফুলে-ভরা বাদামের শাখাগ্র ঝুঁকে পড়ে আমার কাঁধের উপর শুয়ে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ সে চুপ করে রইল। আমিও অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। সে আপন মনে হেসে উঠল। ফের বলল, 'আমার বাবা পাকদণ্ডীর মোড় পর্যন্ত আমার সঙ্গে এসেছিল, কেননা আমি বলেছিলাম যে আমার ভয় করছে। আজ আমি আমার সখী রজ্জার বাড়িতে ঘুমাব। ঘুমাব না, জেগে থাকব। কারণ বাদামের প্রথম ফল ধরার আনন্দে আমরা সব সখী মিলে সারা রাত গান গাইব। আর সেইজন্যেই তো বিকেল পর্যন্ত এখানে আসার জন্য তৈরী

হচ্ছিলাম। কিন্তু ধান ঝাড়তে হল। কাল এই কাপড়-জোড়া ধুয়েছিলাম, আজ তা শুকোয় নি। আগুনে সেঁকে তা শুকিয়েছি। আমার মা বনে জ্বালানি কাঠ কুড়োতে গিয়েছে। মা এখন পর্যন্ত আসে নি। আর যতক্ষণ না মা আসছে ততক্ষণ আমি কী করে তোমার জন্য মকাইয়ের ভুট্টো, শুকনো খোবানি আর জরদালু নিয়ে আসি। দেখ, তোমার এই সব-কিছু নিয়ে এসেছি। তুমি তো খালি-খালি রাগ করে দাঁড়িয়ে আছ। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। আমি এসে গেছি। আজ ভরা চাঁদের রাত। এসো, কিনারায় বাঁধা নৌকা খুলি আর ঝিলে বিহার করি।'

সে আমার চোখের দিকে গভীর ভাবে তাকাল। আমি তার ভালবাসা আর বিচলিত ভাবের মধ্যে ডুবে-যাওয়া চোখের মণির দিকে তাকালাম। এইসময় চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐ চাঁদ আমাকে বলছিল, 'যাও, নৌকা খুলে নিয়ে ঝিলে বিহার কর। আজ বাদামের প্রথম ফলের আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠ। আজ ও তোমারই জন্য আপন সখী, বাবা, ছোট বোন, বড় ভাই— সবাইকে ধোঁকা দিয়েছে; কারণ আজ ভরা চাঁদের রাত আর বাদামের শুভ্র শীতল ফুল বরফের সোনার মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আর কাশ্মীরের গীত বাচ্চাদের দুধের মতো বুকে উৎসারিত হয়ে আসছে। তুমি ওর গলায় মোতির সাতনরী হার দেখেছ? এই গাঢ়লাল সাতনরী হার তার গলায় ঝুলিয়ে দাও আর বলো, তুমি আজ রাত-ভোর জাগবে। আজ কাশ্মীরে বসন্তের প্রথম রাত। আজ তোমার গলায় কাশ্মীরের গীত ফুটে উঠবে যেমন করে কেসর ফুল চাঁদনী রাতে ফুটে ওঠে,— নাও, এই সাতনরী হার পরে নাও।'

তার বিচলিত চোখের মণির মধ্যে উঁকি দিয়ে চাঁদ এই সব-কিছুই দেখছিল। কোনো গাছ থেকে এক বুলবুল ডেকে উঠল, দূরের নৌকার আলো ঝলমল করে উঠল, আর পাহাড়ের কোলে দূরবর্তী গ্রাম থেকে ঢিমে তালে গান জেগে উঠল। গান আর বাচ্চাদের হাসি, পুরুষের ভারী গলার আওয়াজ আর বাচ্চাদের মিষ্টি-মিষ্টি কথা

শোনা গেল। দূরের কুটিরগুলি থেকে ধীরে ধীরে ধোঁয়া উঠছে আর রাতের আহারের সুঘ্রাণ ভেসে আসছে। মাছ ভাত আর কড়ম শাকের মৃদু নোনতা গন্ধ ভেসে আসছে। আজ ভরা চাঁদের রাতে ভরা যৌবন জেগে উঠেছে। আমার ক্রোধ ধুয়ে গেল। আমি তার হাত আপন হাতে নিলাম আর তাকে বললাম, 'এসো, ঝিলে বিহার করি।'

নৌকা পুল ছাড়িয়ে গেল। পাকদণ্ডী পিছনে পড়ে রইল। বাদাম গাছের সারি শেষ হয়ে গেল। সোপানশ্রেণী রইল পিছনে পড়ে। এখন আমরা ঝিলের কিনারে কিনারে চলেছি। ঝোপে ঝোপে ব্যাঙ আর ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। তাদের অর্থহীন ডাক গানের মতো বেজে উঠছে। এক স্বপ্নালু পরিবেশ। যেন প্রেমের প্রতীক্ষায় ঘুমন্ত ঝিলের বুকে চাঁদের প্রতিবিম্ব নিথর হয়ে আছে। হাজার হাজার বছর ধরে এইভাবেই প্রতীক্ষা করছে— আমার ও তার প্রেমের প্রতীক্ষা করছে। তোমার আর তোমার প্রেমিকার মুচকি হাসির প্রতীক্ষায় রয়েছে। মানুষের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা প্রতীক্ষায় রয়েছে। এই ভরা চাঁদের সুন্দর নির্মল রাত যেন কোনো কুমারীর অস্পৃষ্ট শরীরের মতো প্রেমের পবিত্র স্পর্শের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

ঝিলের কিনারায় বেড়ে-ওঠা এক খোবানি-গাছের গোড়ায় নৌকা বাঁধলাম। এখানে মাটি খুব নরম আর চাঁদের আলো পাতার আড়াল থেকে ছেঁকে এসে পড়ছে। ধীরে ধীরে ব্যাঙ ডাকছে। ঝিলের জল বারবার পটভূমিকে চুম্বন করে যাচ্ছে আর বারবার চুম্বনের শব্দ আমার কানে ভেসে আসছে। আমার দু হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরলাম আর তাকে সজোরে বুকে চেপে ধরলাম। ঝিলের জল বারবার তটভূমিকে চুম্বন করে যাচ্ছে। আমি প্রথমে তার দুই আঁখিতে চুমু খেলাম আর ঝিলের বুকে যেন অসংখ্য কমল ফুটে উঠল। আমি আবার তার গালে চুমু খেলাম আর নির্মল কোমল ঝিরঝিরে হাওয়া যেন হঠাৎ শতশত গান গেয়ে উঠল। আমি আবার তার ঠোঁটে চুমু খেলাম আর অসংখ্য মন্দির মসজিদ গির্জা থেকে যেন

গম্ভীর প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারিত হল আর ধরিত্রী আকাশের তারা উড়ন্ত বাজপাখি সবাই মিলে নাচতে শুরু করল। আমি আবার তার চিবুক চুম্বন করলাম আবার তার ঘাড়ে চুমু খেলাম আর ফুলের কুঁড়ির মতো কমল যেন খুলতে আর বন্ধ হতে লাগল। আর গানের সুর জেগে উঠে স্তিমিত হয়ে এল আর জগৎব্যাপী নাচ ঢিমে লয়ে এসে ধীরে ধীরে থেমে গেল। এখন ঐ ব্যাঙের ডাক, ঐ ঝিলের জলের কোমল চুম্বন যেন কোনো নায়িকার জন্য ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিল।

আমি ধীরে নৌকা খুলে দিলাম। সে নৌকায় উঠে বসল। আমি আপন হাতে বৈঠা নিলাম আর ঝিলের মাঝখানে নৌকা চালিয়ে নিয়ে গেলাম। এখানে নৌকা আপনি থেমে গেল। এদিকেও যায় না, ওদিকেও যায় না। আমি বৈঠা তুলে নিয়ে নৌকায় রেখে দিলাম। সে উঠে পুঁটলি খুলল। তার থেকে জরদালু বার করে আমাকে দিল আর নিজেও খেতে শুরু করল।

জরদালু ছিল শুকনো আর টক-মিষ্টি।

সে বলল, 'এগুলি গত বসন্তের।'

আমি জরদালু খেতে লাগলাম আর ওর দিকে দেখতে লাগলাম।

সে ধীরে বলল, 'গত বসন্তে তুমি ছিলে না।'

গত বসন্তে আমি ছিলাম না। সেদিন জরদালু গাছ ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছিল আর শাখাগ্র একটু হেলে পড়লেই মোতির মতো ফুল ছড়িয়ে পড়ছিল। গত বসন্তে আমি ছিলাম না আর জরদালু গাছ ফলে ফলে নত হয়েছিল। সবুজ সবুজ জরদালু। নুন-লংকা দিয়ে প্রচুর জরদালু লোকে খেত আর জিভে জল টানত আর তাদের নাক দিয়ে জল ঝরত। আবার টক জরদালুও লোকে খেত। গত বসন্তে আমি ছিলাম না। সেদিন সবুজ সবুজ জরদালু পেকে হলুদ, সোনালি আর লাল হয়ে যেত। আর ডালে ডালে খুশিভরা লাল লাল ফুল ঝুলে থাকত। ওর খুশিভরা সরল উজ্জ্বল দুটি চোখ ঝুলে পড়া ঐ ফুলের গুচ্ছ দেখে নেচে উঠত। গত বসন্তে আমি ছিলাম না···আর

সুন্দর দুটি হাতে সে লাল-লাল জরদালু সংগ্রহ করত। তার সুন্দর দুটি ঠোঁট জরদালুর তাজা রস চুষে নিত। সে তাদের ঘরের ছাতে জরদালু ফল শুকোবার জন্য বিছিয়ে দিত। এই জরদালু যেদিন শুকিয়ে যাবে, সেদিন এক বসন্ত চলে যাবে আর দ্বিতীয় বসন্ত আসার সময় হবে, সেদিন আমি আসব আর জরদালুর স্বাদ নিয়ে খুশি হব।

আমরা দুজনে জরদালু খাওয়ার পর শুকনো খোবানি খেলাম। এমনিতে খোবানি খুব মিষ্টি মনে হয় না কিন্তু যখন তা মুখের মধ্যে গিয়ে গলে যায় তখন তা মধু আর গুড়ের স্বাদ দিতে থাকে।

আমি বললাম, 'এগুলি নরম-নরম, খুব মিষ্টি লাগছে।'

সে দাঁত দিয়ে একটা বিচি ভাঙল আর খোবানির বীজ বার করে আমায় দিল, 'খাও'।

ঐ বিচি বাদামের মতো মিষ্টি।

সে বলল, 'এ রকম খোবানি আমি কখনো খাই নি। এ আমাদের আঙিনার গাছের ফল। আমাদের এখানে খোবানির এই একটিই গাছ আছে, কিন্তু এত বড় এত মিষ্টি খোবানি হয় যে তোমাকে আমি কী বলব। যখন খোবানি পাকে তখন আমার সব সখী এক হয়ে খোবানি খাওয়াতে বলে। গত বসন্তে...'

আর আমি ভাবলাম, গত বসন্তে আমি ছিলাম না কিন্তু আঙিনায় খোবানির গাছ এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল। গত বসন্তে এই গাছ কচি কচি পাতায় ভরে গিয়েছিল আর তাতে কচি সবুজ ছুঁচালো খোবানি ফল ধরেছিল। এখন তাতে কচি কচি খোবানি হয়েছে। আর কাঁচা টক ফল দুপুরের আহারে চাটনির কাজ দেয়। গত বসন্তে আমি ছিলাম না, তখন এই খোবানিতে বিচি হয়েছিল আর খোবানির রঙ তার মাধুর্যে সবুজ বাদামকে মাত্ করে দিয়েছিল। গত বসন্তে আমি ছিলাম না। সেদিন এই লাল-লাল খোবানি আপন রঙে সুন্দরী যুবতীদের মতো সুন্দর হয়ে উঠেছিল আর তাদের মতোই রসালো হয়ে উঠেছিল। সবুজ-সবুজ পাতার ওড়নার আড়াল থেকে তারা উঁকি দিচ্ছিল। কচি কচি মেয়ে আঙিনায় নাচতে শুরু করেছিল আর

ছোট ভাই গাছের উপর চড়ে খোবানি ছিঁড়ে ছিঁড়ে আপন বোনের সখীদের জন্য নীচে ফেলছিল। গত বসন্তের খোবানি কত মিষ্টি আর রসালো ছিল···সেদিন আমি ছিলাম না···। খোবানি খাওয়ার পর সে মকাইয়ের ভুট্টা বার করল। তার এমন সোঁদা-সোঁদা সুগন্ধ···সোনালি সেঁকা ভুট্টা ঠিক যেন মোতির আভাযুক্ত। দানাগুলি মুচমুচে আর মিষ্টি।

সে বলল, 'এ হল মিষ্টি মকাইয়ের ভুট্টা।'

আমি ভুট্টা খেতে খেতে বললাম, 'খুব মিষ্টি।'

সে বলল, 'গত ঋতুর স্বাদ লেগে রয়েছে এই ভুট্টাগুলিতে। মাকে লুকিয়ে এগুলি রেখে দিয়েছিলাম।'

আমি মকাইয়ের একদিক থেকে ভুট্টা খেয়েছিলাম। কয়েক পংক্তি দানা রেখে দিয়েছিলাম। সে ঐখান থেকেই দানা খেয়েছিল আর কিছুটা আমার জন্যে রেখে দিয়েছিল। আমি তা খেলাম। এইভাবেই আমরা দুজনে একই ভুট্টা খেতে থাকি। তখন আমি ভেবেছিলাম এই মিষ্টি মকাইয়ের ভুট্টা কতই না মিষ্টি! এ হল গত বসন্তের ফসল, তখন তুমি ছিলে কিন্তু আমি ছিলাম না। তখন তোমার বাবা ক্ষেতে হাল চালিয়েছিল, ক্ষেতের মাটি আলগা করে দিয়েছিল, বীজ রুয়েছিল, বর্ষার জল দিয়েছিল। ধরিত্রী সেদিন সবুজ রঙের ছোট ছোট গাছ উঠিয়েছিল আর তুমি নালা বানিয়েছিলে। মকাইয়ের ছোট ছোট গাছ বড় হয়ে গিয়েছিল আর সেগুলির মাথায় শীষ এসেছিল, হাওয়ায় সেগুলি দুলছিল আর মকাইয়ের সবুজ ভরা দানাগুলি ফুটে উঠছিল। সেগুলির কোমল ছালের উপর যদি একটু নখ লেগে যেত তো ভুট্টার দুধ বেরিয়ে যেত। এসব নরম লাজুক ভুট্টা ধরিত্রী উৎপন্ন করেছিল। সেদিন আমি ছিলাম না। আর সেই সব ভুট্টাগাছ পরিপুষ্ট তাগড়া হয়ে গিয়েছিল। ভুট্টার দানায় রস এসেছিল। তখন দানায় নখ লাগালে কিছুই হত না, নিজেরই নখ ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকত। ভুট্টার খোসা আগে ছিল হলুদ। এখন তা সোনালি ও শেষে কালো হয়ে গেল। মকাইয়ের ভুট্টার রঙ মাটির মতো বাদামি হয়ে গেল ···

তখনো তো আমি আসি নি। তারপর ক্ষেতের স্থানে স্থানে শস্য সঞ্চিত হল আর সেই সঞ্চিত শস্য বলদ দিয়ে মাড়ানো হল। তার ফলে ভুট্টার দানাগুলি আলাদা হয়ে গেল। তখন সখীদের নিয়ে তুমি প্রেমের গান গেয়েছিলে। কিছু ভুট্টা লুকিয়ে আর সেঁকে নিয়ে তুমি আলাদা করে রেখে দিয়েছিলে। সেদিন আমি ছিলাম না। ধরিত্রী ছিল, শস্য ছিল, আগুনে সেঁকা ভুট্টা ছিল, কিন্তু আমি ছিলাম না।

আমি খুশির চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আজ ভরা চাঁদের রাতে যেন আমার সব ইচ্ছেই পূরণ হয়ে গেল। কাল পর্যন্ত তা পূর্ণ হয় নি, কিন্তু আজ পূর্ণ হয়েছে।'

সে আমার মুখে ভুট্টাদানা দিয়েছিল। তার ঠোঁটের গরম-গরম স্পর্শ এখনো ভুট্টাদানায় লেগে আছে। আমি বললাম, 'তোমায় চুমু খাই?'

সে বলল, 'ধুৎ। ··· নৌকা ডুবে যাবে।'

আমি শুধালাম, 'তাহলে কী করা যায়?'

সে বলল, 'নৌকা ডুবতে দাও।'

সেদিনের ভরা চাঁদের রাত আমি আজ পর্যন্ত ভুলি নি। আজ আমার বয়স সত্তরের কাছাকাছি হল। কিন্তু সেই ভরা চাঁদের রাত আমার মনে এমন জ্বল জ্বল করছে যেন তা গতকাল ঘটেছিল। এমন পবিত্র প্রেমের স্বাদ আমি আজ পর্যন্ত পাই নি। সে-ও পায় নি। সেদিনের জাদু ছিল অন্যরকম। সেই ভরা চাঁদের রাতে আমরা দুজনে একে অপরের সঙ্গে এমনভাবে মিলে গিয়েছিলাম যে সে রাতে ঘরেও যাই নি। ঐ রাতে সে আমার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। আমরা পাঁচ-ছ দিন প্রেমে হারিয়ে গিয়েছিলাম। বাচ্চাদের মতো জঙ্গলের এখানে-ওখানে, নদী-নালার কিনারে, আখরোট গাছের ছায়াতলে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। ঐ বিলের ধারে আমি একটি কুটির কিনেছিলাম আর দুজনে সেখানে বাস করেছিলাম। এক মাস বাদে আমি শ্রীনগর গিয়েছিলাম। তাকে বলে গিয়েছিলাম যে আমি তিনদিন পরে ফিরে আসব। তৃতীয় দিনে আমি ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু ফিরে এসে দেখি সে এক নবযুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলছে।

তারা দুজনেই একই রেকাবি থেকে খানা খাচ্ছে। একে অপরের মুখে গ্রাস তুলে দিচ্ছে আর হাসাহাসি করছে। আমি তাকে দেখেছিলাম, কিন্তু সে আমাকে দেখতে পায় নি। তারা দুজনে দুজনের মধ্যে এতই মশগুল হয়েছিল যে অন্য কোনোদিকে তাকায় নি। আমি ভাবলাম— এই নবযুবক গত বসন্ত বা তার আগের বসন্তের প্রেমিক। সেদিন তো আমি ছিলাম না। পরে বোধহয় এমন বসন্ত আরো কত আসবে। আবার কত ভরা চাঁদের রাত আসবে যখন প্রেম এক পতিতা নারীর মতো অবশ হয়ে যাবে আর উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করবে। যেমনভাবে বসন্তের পর পাতাঝরার দিন আসে তেমন ভাবেই আজ তোমার পাতাঝরার দিন এসে গেছে। আর এখানে আমার কী কাজ আছে? এই কথা ভেবে আমি তার সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে চলে গিয়েছিলাম। আমার সেই প্রথম বসন্ত আর কোনোদিন ফিরে আসে নি।

আর আজ আটচল্লিশ বছর পরে আমি সেখানেই ফিরে এসেছি। আমার সঙ্গে আমার ছেলেরা এসেছে। আমার স্ত্রী মারা গেছে। আমার পুত্রবধূরা আর তাদের ছেলেমেয়েরা আমার সঙ্গে এসেছে। আমরা বেড়াতে বেড়াতে সেই সমল ঝিলের কিনারে এসে গেছি। আবার সেই এপ্রিল মাস ফিরে এসেছে। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমি অনেকক্ষণ সেতুর ধারে দাঁড়ানো বাদামগাছের সারি দেখছি। ঠাণ্ডা বাতাসে শাদা ফুলের গুচ্ছ ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পাকদণ্ডীর ধূলার পথে কোনো চেনা পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছি এক সুন্দরী হাতে পুঁটলি নিয়ে সেতু পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। তা দেখে আমার হৃদয় লাফিয়ে উঠছে। ঐ দূরে পাহাড় পেরিয়ে গ্রামে কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে ডাকছে। সে তাকে খেতে ডাকছে। কোথাও দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা যাচ্ছে আর একটি ক্রন্দনরত শিশু হঠাৎ চুপ করে যাচ্ছে। ছাত দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কলরবকারী পাখির দল গাছের ঘন পাতাভরা শাখায় পাখা ঝাপটাচ্ছে আবার একেবারে নীরব হয়ে যাচ্ছে। কোনো

মাঝি গান গাইছে। তার কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে দিগন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

আমি সেতু পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। আলাদা আলাদা দলে ভাগ হয়ে আমার ছেলেরা, তাদের বউ ও ছেলেমেয়েরা আমার পিছনে আসছে। এখানে বাদামগাছের সারি শেষ হয়ে গেছে। খাড়াইপথ পেরিয়ে গিয়ে ঝিলের কিনারায় এসে গেছি। এই তো সেই খোবানির গাছ, কিন্তু কত বড় হয়ে গেছে। কিন্তু এই নৌকা ··· এই নৌকা··· কিন্তু এ কি সেই নৌকা? সামনে ঐ তো সেই কুটির। আমার প্রথম বসন্তের কুটির। আমার সেই ভরা চাঁদের প্রেম।

কুটিরে আলো দেখা যাচ্ছে। বাচ্চাদের কলরব শোনা যাচ্ছে। কেউ ভারী গলায় গান গাইছে। কোনো এক বুড়ি তাদের চীৎকার করে থামিয়ে দিচ্ছে। আমি ভাবলাম, অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে এলাম। এতদিন আমি ঐ কুটির দেখি নি। দেখতে দোষ কী? যাই হোক, আমিই তো ঐ কুটির কিনেছিলাম। যদি আমি ভাবি যে ঐ কুটিরের মালিক আমিই, তবে দেখতে দোষ কী? আমি কুটিরের ভিতরে ঢুকলাম।

কী সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা! এক যুবতী স্ত্রী তার স্বামীর জন্য রেকাবিতে খানা সাজিয়ে রাখছে। আমাকে দেখে সে সংকুচিত হয়ে গেল। দুটি বাচ্চা লড়াই করছিল। আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে চুপচাপ হয়ে গেল। যে বুড়ি এতক্ষণ পর্যন্ত সক্রোধে বকাবকি করছিল সে থামের আড়ালে এসে দাঁড়াল। বলল, 'কে তুমি?'

আমি বললাম, 'এই বাড়ি আমার।'

বুড়ি বলল, 'হু:, একি তোর বাপের বাড়ি!'

আমি বললাম, 'আমার বাপের নয়, আমার। আটচল্লিশ বছর আগে আমি এটি কিনেছিলাম। এখন আমি এমনিই এ বাড়ি দেখতে এসেছি। আপনাদের এখান থেকে বের করে দিতে আসি নি। এখন তো এই বাড়ি আপনারই। আমি এমনিই···' এই কথা বলে আমি ফিরে চলে আসছি। বুড়ি আঙুল দিয়ে জোর করে থামটাকে

চেপে ধরল। সে এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, 'তাহলে সেই তুমিই···আজ এত বছর পরে কেউ কি কাউকে চিনতে পারে ?···' সে অনেকক্ষণ থাম ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি নীচে আঙিনায় চুপ করে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর সে আপন মনেই হেসে উঠল। বলল, 'তাহলে এসো, তোমার সঙ্গে আমার ঘরের লোকদের আলাপ করিয়ে দিই।···দেখ, এই আমার বড় ছেলে। এ ওর চেয়ে ছোট, ও বড় ছেলের বউ, ও আমার বড় নাতি। বাবা, প্রণাম করো। এ আমার বড় নাতনি··· আর এ···এ আমার স্বামী, দেখ তো, ধুৎ। একে জাগিয়ো না। পরশু থেকে ওর অসুখ করেছে, ওকে ঘুমোতে দাও।'···

সে আবার বলল, 'তোমার জন্যে কি করতে পারি ?'

আমি দেওয়ালের খুঁটিতে টাঙানো মকাইয়ের ভুট্টার দিকে তাকালাম···সেঁকা ভুট্টা, সোনালি মোতির মতো উজ্জ্বল দানাগুলি।

আমরা দুজনেই হেসে ফেললাম।

সে বলল, 'আমার তো অনেক দাঁত পড়ে গেছে আর যা আছে তা কাজে লাগে না।'

আমি বললাম, 'আমারো তো একই অবস্থা, ভুট্টা খেতে পারি না।'

আমাকে বাড়ির ভিতর ঢুকতে দেখে আমার আত্মীয়রাও ভিতরে চলে এল। তখন খুব হৈ-চৈ হল। বাচ্চারা শীঘ্রই একে অন্যের সঙ্গে মিলে মিশে গেল।

আমরা দুজনে ধীরে ধীরে বাইরে চলে এলাম। ধীরে ধীরে ঝিলের কিনার ধরে হাঁটতে লাগলাম।

সে বলল, 'আমি তোমার জন্য ছ' বছর অপেক্ষা করেছি। তুমি সেদিন ফিরে এলে না কেন ?'

আমি বললাম, 'আমি এসেছিলাম, কিন্তু অন্য এক নবযুবকের সঙ্গে তোমাকে দেখে ফিরে চলে গিয়েছিলাম।'

সে বলল, 'কি বলছ তুমি ?'

'হ্যাঁ, তুমি তার সঙ্গে একই রেকাবি থেকে খানা খাচ্ছিলে, তুমি

তার মুখে আর সে তোমার মুখে গ্রাস তুলে দিচ্ছিলে।'

সে একেবারে চুপ হয়ে গেল, তারপর সজোরে হাসতে লাগল। আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালাম, 'কী হল?'

সে বলল, 'আরে, সে তো আমার সহোদর ভাই।'

সে আবার জোরে জোরে হাসতে লাগল। 'সে ঐদিনই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ঐ দিন তোমারো আসার কথা ছিল। সে ফিরে যাচ্ছিল। আমি তাকে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আটকে রেখেছিলাম...কিন্তু তুমি তো এলে না।'

সে হঠাৎ চুপ করে গেল। 'ছ বছর আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম। তুমি চলে যাবার পর ভগবান আমাকে একটি ছেলে দিয়েছিলেন, তোমারই ছেলে, কিন্তু এক বছর বাদে সে মারা গেল। চার বছর আমি তোমারই জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম, কিন্তু তুমি এলে না।'

খেলা করতে করতে এক বাচ্চা আরেক বাচ্চাকে মকাইয়ের ভুট্টা দিচ্ছিল।

সে বলল, 'এটি আমার নাতি।'

আমি বললাম, 'এটি আমার নাতনি।'

বাচ্চা দুটি দৌড়তে দৌড়তে ঝিলের কিনারে অনেক দূরে চলে গেল। আমরা অনেকক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে আমার কাছে এল। বলল, 'আজ তুমি এসেছ বলে আমার খুব ভাল লাগছে। আমি আমার পথ বেছে নিয়েছি। এই জীবনের সুখ আর দুঃখ দেখেছি। আমার ঘর ভরে গেছে, আর আজ তুমি এসেছ। আমার একটুও খারাপ লাগছে না।'

আমরা দুজনেই চুপ করে গেলাম। বাচ্চা দুটি খেলতে খেলতে আমাদের কাছে ফিরে এল। সে আমার নাতনিকে কোলে তুলে নিল, আমি তার নাতিকে কোলে তুলে নিলাম। আমরা দুজনে খুশি মনে একে অপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। তার চোখের মণিতে চাঁদ প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল। ঐ চাঁদ আশ্চর্য খুশির সঙ্গে

বলতে লাগল, 'মানুষ মরে যায়, কিন্তু জীবন মরে না। বসন্ত শেষ হয়ে যায়, কিন্তু জীবনের মহান শুদ্ধ প্রেম সর্বদা স্থির হয়ে থাকে। তোমরা দুজনে গত বসন্তে ছিল না। এই বসন্ত তোমরা দেখছ, আগামী বসন্তে তোমরা থাকবে না, কিন্তু জীবন আর প্রেম থাকবে, আর থাকবে যৌবন সৌন্দর্য মাধুর্য আর সরলতা…।'

বাচ্চা দুটি আমাদের কোল থেকে নেমে পড়ল, তারা আলাদা খেলতে চাইছিল। তারা দৌড়তে দৌড়তে খোবানি গাছের কাছে চলে গেল, সেখানে নৌকা বাঁধা ছিল।

আমি শুধালাম, 'এ তো সেই গাছ?'

সে মুচকে হেসে বলল, 'না, এ অন্য গাছ।'

জঞ্জাল-বুড়ো

যখন সে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল, তখন ওর পা দুটি কাঁপছে। ওর সারা শরীর ভেজা তুলোর মতো চুপসে গিয়েছে বলে মনে হয়েছিল। ওর মন চলতে চাইছিল না, ঐ ফুটপাথে বসে পড়তে চাইছিল।

জেল-হাসপাতালে তার আরো এক মাস থাকা উচিত ছিল, কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওকে ছেড়ে দিলেন। হাসপাতালের প্রাইভেট ওয়ার্ডে সে সাড়ে চার মাস ছিল আর দেড় মাস ছিল জেনারেল ওয়ার্ডে। এই সময়ের মধ্যে তার একটি কিডনী অপারেশন করে বাদ দেওয়া হয়েছিল আর অন্ত্রের এক অংশ কেটে দিয়ে তার অন্ত্রের ক্রিয়া ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। এখনো তার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক হয় নি তবু হাসপাতাল ছেড়ে ওকে চলে আসতে হয়েছিল, কারণ তার চেয়েও খারাপ অবস্থার অন্য রোগী প্রতীক্ষা করছিল।

ডাক্তার তার হাতে এক লম্বা প্রেসক্রিপশন দিয়ে বলেছিল, 'এই টনিক খেয়ো আর পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ো। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে, এখন আর হাসপাতালে থাকার কোনো আবশ্যকতা নেই।'

'ডাক্তার সাহেব, আমি যে-আর হাঁটতে পারছি না।' সে ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিল।

'ঘরে যাও, কিছুদিন বিবি সেবাযত্ন করবে, বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে।'

খুব ধীরে ধীরে টলমলে পদক্ষেপে ফুটপাথ দিয়ে চলতে চলতে সে ভেবেছিল, 'ঘর !— কিন্তু আমার ঘর কোথায় ?'

কিছুদিন আগেও আমার একটি ঘর নিশ্চয় ছিল—এক বিবিও ছিল —তার এক বাচ্চা হবার কথা ছিল— তারা দুজনে ঐ আগতপ্রায় বাচ্চার কল্পনায় কত খুশি হয়েছিল। দুনিয়ার জনসংখ্যা অনেক হতে পারে, কিন্তু সে তো তাদের দুজনের প্রথম সন্তান ছিল। দুনিয়ায় তাদের প্রথম সন্তান জন্ম নিতে আসছিল।

দুলারী নিজের বাচ্চার জন্য খুব সুন্দর জামা সেলাই করেছিল। হাসপাতালে তা নিয়ে এসে দেখিয়েছিল আর ঐ জামায় হাত বুলিয়ে তার মনে হয়েছিল যে সে তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আদর করছে।

কিন্তু গত কয়েক মাসের মধ্যে তাকে অনেক কিছুই হারাতে হল। যখন তার কিডনির প্রথম অপারেশন হল তখন দুলারী নিজের গয়না বেচে দিয়েছিল, কারণ গয়না তো এই রকম সময়ের জন্যই লোকে ভাবে গয়না স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য, কিন্তু অন্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য তার ব্যবহার হয়। পতির অপারেশন, বাচ্চাদের লেখাপড়া, মেয়ের বিয়ে— এইসব প্রয়োজনের জন্যই স্ত্রীলোকের গয়নার ব্যাংক খালি করে দেওয়া হয়। স্ত্রীলোক গয়নাগাঁটি সামলাতে ব্যস্ত থাকে, আর জীবনে বড় জোর পাঁচ ছ'বার এই গয়না পরবার সৌভাগ্য লাভ করে।

কিডনির দ্বিতীয় অপারেশনের আগে দুলারীর বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেল। তা তো হবেই— দুলারীকে দিনরাত খুব খাটুনি পোয়াতে হয়েছিল, তার জন্যে এই বিপদ গোড়াতেই জমা ছিল। মনে হয়েছিল যে দুলারীর একহারা উজ্জ্বল শরীর এই কড়া খাটুনির জন্য তৈরী হয় নি। এইজন্য ঐ বুদ্ধিমান বাচ্চা মাঝপথেই সরে পড়েছিল। বিরূপ পরিবেশ আর বাপ-মায়ের দুর্দশা আঁচ করতে পেরে সে নিজেই বুঝেছিল জন্ম নেওয়া উচিত হবে না। কোন কোন বাচ্চা এরকম বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। দুলারী কিছুদিন হাসপাতালে আসতে পারে নি, তারপর যখন এসে সে খবরটা দিল তখন দুলারীর স্বামী খুব কেঁদেছিল। যদি তার জানা থাকত যে ভবিষ্যতে তাকে আরো অনেক কাঁদতে হবে তাহলে এই ঘটনায় কান্নার বদলে সে সন্তোষ প্রকাশ করত।

কিডনির দ্বিতীয় অপারেশনের পর তার চাকরি চলে গেল। দীর্ঘকালীন রোগভোগে এইরকমই হয়, কে আর কতদিন অপেক্ষা করতে পারে। রোগ তো মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। এই কারণে যদি সে চায় যে তার চাকরি বজায় থাকবে তবে তার দীর্ঘদিনের

রোগভোগে পড়া ঠিক হবে না। মানুষ যন্ত্রের মতোই। যদি কোন যন্ত্র দীর্ঘকাল ধরে বিগড়ানো অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকে এক ধারে ফেলে রেখে দেওয়া হয় আর তার জায়গায় নূতন যন্ত্র এসে যায়। কারণ কাজ থেমে থাকতে পারে না, ব্যবসা বন্ধ হতে পারে না আর সময় থেমে থাকতে পারে না। কাজেই যখন তার উপলব্ধি হল যে তার চাকরি চলে যাচ্ছে, তখন দ্বিতীয়বার কিডনি অপারেশনের সময় যে-রকম ধাক্কা লেগেছিল সে রকমই ধাক্কা লাগল। এই ধাক্কায় তার চোখ দিয়ে জলও পড়ে নি। সে অনুভব করেছিল, তার হৃদয়ের মধ্যে এক শূন্যতা বিরাজ করছে, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে আর নাড়িতে রক্তের বদলে ভয় দ্রুত প্রবাহিত হচ্ছে।

কিছুদিন যাবৎ আগামী দিনগুলির কথা ভেবে ভয়ে সে ঘুমোতে পারে নি। অনেকদিনের রোগের চিকিৎসায় খরচও হল অনেক। এক এক করে ঘরের সব দামি জিনিষ বিক্রি হয়ে গেল, কিন্তু দুলারী হাল ছেড়ে দিল না। সে তার স্বামীকে সাড়ে চার মাস প্রাইভেট ওয়ার্ডে রেখেছিল, তার সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা করিয়েছিল, এক এক করে নিজের ঘরের সব জিনিষ বেচে দিয়েছিল আর শেষ পর্যন্ত চাকরিও নিয়েছিল। দুলারী এক ফার্মে কর্মচারী হয়ে গেল। একদিন তাদের ফার্মের মালিককে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিল। মালিক এক রোগা-পাতলা বেঁটে মতো লোক। তাকে দেখায় মাঝবয়েসী আর লাজুক। তাকে দেখতে শুনতে কোনো ফার্মের মালিকের বদলে কোনো দোকানের মালিক বলে মনে হয়। দুলারী ঐ ফার্মে দু শ' টাকার মাস মাইনার কর্মচারী হয়ে গেল, কেননা সে খুব বেশী লেখাপড়া জানত না, তাই তার কাজ ছিল খামের উপর ডাকটিকিট লাগানো।

দুলারীর স্বামী বলল, 'এ খুব সহজ কাজ।'

ফার্মের মালিক বললেন, 'কাজ তো সোজাই, কিন্তু যেদিন পাঁচ-ছ শ' চিঠির খামের উপর টিকিট লাগাতে হয় সেদিন এই খুব সোজা কাজই খুব কঠিন মনে হয়।'

দুলারী মুচকি হেসে বলল, 'সত্যি খুব হয়রান হয়ে যাই।'

ফার্মের মালিক তাকে বললেন, 'তুমি সেরে ওঠ, তারপর তুমি তোমার বিবির বদলে খামে টিকিট লাগিয়ো, আমি এই কাজ তোমাকে দেব।'

যখন ফার্মের মালিক চলে যাচ্ছেন তখন দুলারীও তার সঙ্গে চলে গেল। সে (দুলারীর স্বামী) অনুভব করল যে আজ দুলারীর পদক্ষেপে এক অদ্ভুত আত্মমর্যাদা প্রকাশ পাচ্ছে। দুলারীর শরীর কোনো এক ফুলন্ত ডালের মতো নমনীয় হয়ে গেছে। ওয়ার্ডের বাইরে এসে মালিক দুলারীর জন্যে এক হাতে দরজা খুলে ধরলেন আর খাতির করে দুলারীকে দরজার বাইরে যেতে সাহায্য করার জন্য কিছুটা ঝুঁকে পড়লেন, আর এক মুহূর্তের জন্য তাঁর অপর হাত দুলারীর কোমরের উপর রাখলেন। ফার্মের মালিকের প্রথম হাতের ভঙ্গি দুলারীর স্বামীর ভাল লেগেছিল কিন্তু দ্বিতীয় হাতের ভঙ্গি পছন্দ হয় নি। কিন্তু সে আপন মনকে এ কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল যে কখনো কখনো এক হাত যা' করে তা অপর হাত জানতে পারে না। আবার এও তো হতে পারে যে তার চোখের নজর ঠিক চলে নি —কেবল ভ্রম মাত্র— এ কারণে সে বিশ্বাসের সঙ্গে নিজের চোখদুটি বন্ধ করে নরম নরম বালিশের উপর মাথা রেখে গ্লুকোজ ইনজেকশনের প্রতীক্ষা করেছিল।

তার তৃতীয় অপারেশন হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে হয়েছিল। সে সময় দুলারী ফার্মের মালিকের সঙ্গে দার্জিলিং চলে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কে আর কতদিন অপেক্ষা করতে পারে! জীবন ক্ষণস্থায়ী আর জীবনের বসন্ত তার চেয়েও ক্ষণস্থায়ী। যখন আবেগ প্রবল হয় আর চোখে নেশা লাগে, যখন আঙুলের ডগায় আগুনের জ্বলুনি অনুভূত হয় আর বুকে মিষ্টি-মিষ্টি বেদনা হতে থাকে, যখন চুম্বন ভ্রমরের মতো ওষ্ঠের পাপড়ির উপর এসে পড়ে আর বঙ্কিম হংসগ্রীবা কারুর গরম-গরম নিশ্বাসের মৃদু মৃদু আঁচে ব্যাকুল হয়, তখন কেউ কতদিন পর্যন্ত ফিনাইল আর পেচ্ছাবের গন্ধ শুঁকতে পারে, থুতু

পুঁজ আর রক্তের রঙ দেখতে পারে আর মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরে আসা হেঁচকি শুনতে পারে ? সহ্য করার একটা সীমা আছে ; বিশ বছরের যুবতী সহ্য কি করে নি ? যার বিয়ের পর দু বছরও পেরোয় নি, যে আপন পতির সঙ্গে বিপদ ছাড়া আর কিছুই দেখে নি, সে যদি আপন স্বপ্নে ভর করে দার্জিলিং চলে যায় তবে তাতে কার কী দোষ ?

দুলারী যখন বাড়ী থেকে চলে যায় তখন দুলারীর স্বামী অন্য কাউকে দোষী বলার মতো অবস্থা থেকে চ্যুত হয়েছিল। তার উপর একটার পর একটা এত আঘাত পড়েছিল যে সে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল। এখন তার বিপদ আর কষ্টে কোনো ভাবনা বা অশ্রু ছিল না। বারবার হাতুড়ির চোট খেয়ে তার হৃদয় ধাতুর পাতের মতো হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে আজ সে (দুলারীর স্বামী) যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল তখন সে ডাক্তারের কাছে কোনো মানসিক পীড়ার কথা বলে নি। সে ডাক্তারকে বলে নি, এই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এখন সে কোথায় যাবে ? এখন তার নেই কোনো ঘর, নেই বিবি, নেই বাচ্চা, নেই কোনো চাকরি, তার হৃদয় শূন্য, তার পকেট ফাঁকা ; তার সামনে এক বিরাট শূন্য ভবিষ্যৎ।

কিন্তু তখন সে কোনো কথাই বলে নি, কেবল বলেছিল, 'ডাক্তার সাহেব, আমি আর চলতে পারছি না।'

ঐ একমাত্র সত্য তখন সে অনুভব করেছিল, বাকি সব কথা তার মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এসময় চলতে চলতে সে কেবল অনুভব করতে পারল যে তার শরীর ভিজে তুলো দিয়ে তৈরী, তার শিরদাঁড়া কোনো পুরনো ভাঙা চারপাইয়ের মতো খটখট করছে। রোদের তেজ খুব, আলো তীরের মতো চোখে বিঁধছে, আকাশে এক ময়লা হলুদ রঙের বার্নিশ লেপে দেওয়া হয়েছে, সারা পরিবেশ কালো ঘোলাটে আর জড়ো-হওয়া নোংরা মাছির মতো ভনভন করছে আর লোকের দৃষ্টি যেন তার গায়ের নোংরা রক্ত ও পুঁজের মতো তার শরীরে সেঁটে যাচ্ছে। তাকে কোথাও পালিয়ে যেতে হবে, দূরে কোথাও লম্বা লম্বা তার-জড়ানো আলোর থামওয়ালা রাস্তা দিয়ে

যেতে হবে, তার মধ্য দিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি পথ ধরে অনেকদূরে পালিয়ে যেতে হবে। তার মনে এল তার মরা মায়ের কথা, তার মরা বাপের কথা, তার আফ্রিকা-চলে-যাওয়া ভাইয়ের কথা। সন্-সন্-সন্ শব্দ করে একখানা ট্রাম তার কাছ দিয়ে চলে গেল। ট্রামের বিজলীর ট্রলি, বিজলীর লম্বা তারে ঘষতে ঘষতে যেন তার শরীরে ঢুকে যেতে লাগল। তার আপন শরীরে পুরো ট্রামটাই ঢুকে যাচ্ছে বলে সে অনুভব করল, তার মনে হল সে যেন কোনো মানুষ নয়, যেন এক ক্ষয়ে যাওয়া রাস্তা।

অনেকক্ষণ ধরে সে চলছিল, হাঁপিয়ে পড়ছিল আর চলছিল। আন্দাজে এক অজানা দিকে চলছিল—যেদিকে কোনো একদিন তার ঘর ছিল। এখন তার মনে হয়েছে তার কোনো ঘর নেই। কিন্তু এ কথা জেনেও সে ঐ দিকেই চলছিল, ঘরে যাবার তাগিদে অসহায় হয়ে সে পথ চলছিল। কিন্তু রোদ খুব চড়া ছিল, তার শরীরে পোকা কিলবিল করছিল আর সে রাস্তাও ভুলে গিয়েছিল। এখন তার শরীরে এমন শক্তি ছিল না যে সে কোনো পথিকের কাছে রাস্তার খোঁজ নেয়, জেনে নেয় শহরের এটা কোন অঞ্চল। ধীরে ধীরে তার কানের মধ্যে ট্রাম আর বাসের আওয়াজ বাড়তে লাগল, চোখের সামনে দেয়াল বাঁকা হয়ে যেতে লাগল, বাড়িঘর ভেঙে পড়তে লাগল, বিজলীবাতির থামগুলি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে যেতে লাগল। সে তার চোখের সামনে আঁধার আর পায়ের তলায় ভূমিকম্প অনুভব করল আর হঠাৎই মাটিতে পড়ে গেল।

যখন তার হুঁশ ফিরে এল, তখন রাত হয়ে গেছে, এক ঠাণ্ডা আঁধার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সে চোখ খুলে দেখল, যে জায়গায় সে পড়ে গিয়েছিল এখন পর্যন্ত সেই জায়গাতেই শুয়ে আছে। এটা ফুটপাথের এমন একটা মোড় যার পিছনে দু দিকে দুই দেয়াল খাড়া হয়ে আছে। এক দেয়াল ফুটপাথের গায়ে গায়ে সোজা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে, অপর দেয়াল উত্তর থেকে পশ্চিম দিকে চলে গেছে, আর দুই দেয়ালের জোড়ের মুখে সে শুয়েছিল। এ দুই

দেয়াল প্রায় চার ফুট উঁচু আর এই দেয়ালগুলির পিছনে ছিল বাঁশঝাড় আর ম্যাগনোলিয়া লতার ঝাড়, পেয়ারা আর জাম গাছ। ঐ সব গাছের পিছনে কী ছিল তা সে দেখতে পায় নি। অন্য দিকে, পশ্চিমদিকের দেয়ালের সামনে পঁচিশ-তিরিশ ফুট ছেড়ে দিয়ে ছিল এক পুরনো বাড়ির পিছনের অংশ। বাড়িটি তিনতলা; প্রতি তলার পিছনদিকে একটি জানালা আর ছ'টি বড় বড় পাইপ। পিছনদিকের পাইপ আর পশ্চিমদিকের দেয়ালের মাঝখানে এক পঁচিশ-তিরিশ ফুট চওড়া কানাগলি, তার তিন দিকে দেয়াল আর চতুর্থ দিকে পথ। দূরে কোথাও গিরজার ঘণ্টায় রাত তিনটে বাজল। সে ফুটপাথের উপর শুয়ে শুয়ে কনুইয়ের উপর জোর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে এদিক-ওদিক দেখতে থাকে। পথ একেবারে খালি। সামনের দোকানগুলি বন্ধ আর ফুটপাথের আঁধারে ছায়ায় কোথাও কোথাও কমজোর বিজলীবাতি ঝলমল করছে। কিছুক্ষণের জন্য এই ঠাণ্ডা আঁধার তার খুব ভাল লাগল। কিছুক্ষণের জন্য সে নিজের চোখ দুটি বন্ধ করে ভাবল, সে বোধহয় কোনো দয়ার সমুদ্রের জলে ডুবে যাচ্ছে।

কিন্তু এই অনুভূতি দিয়ে সে নিজেকেই কিছুক্ষণের জন্য ধোঁকা দিচ্ছিল, কারণ এখন তার খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। কিছুক্ষণের জন্য আরামদায়ক ঠাণ্ডা উপভোগের পর সে অনুভব করল যে তার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। তার অন্ত্রের অপারেশন হওয়ার পর থেকে তার খুব ক্ষিদে পায়। সে ভাবল যে ডাক্তার তার অন্ত্রের কাজ জাগিয়ে দিয়ে তার কোনো রকম উপকার করেন নি। পেটের মধ্যে নাড়ী বিচিত্র-ভাবে পাক খাচ্ছিল আর অন্ত্রের একেবারে ভিতরে মোচড় দিচ্ছিল, আহারের জানান দিচ্ছিল। এসময়ে তার নাসিকা সভ্য নাগরিকের নাসিকার মতো কাজ করছিল না, বরং কোনো জংলী পশুর ঘ্রাণে-ন্দ্রিয়ের মতো কাজ করছিল। তার নাকে নানা বিচিত্র গন্ধ আসছিল। সুগন্ধের এক ঐকতান তার চেতনায় ছড়িয়ে পড়ছিল। আর আশ্চর্যের কথা এই যে সে এই সুগন্ধ-ঐকতানের এক এক সুরের আলাদা আলাদা অস্তিত্ব চিনে নিতে পারছিল। এই হল জামের গন্ধ, এটা হল পেয়ারার

গন্ধ, এটা হল রজনীগন্ধার কলির গন্ধ, এ হল তেলেভাজা পুরীর গন্ধ। এটা হল পেঁয়াজ-রসুনে-সাঁতলানো আলুর গন্ধ, এটা মূলোর গন্ধ, এটা টমাটোর গন্ধ, এটা হল কোনো পচা ফলের গন্ধ, এটা পেচ্ছাবের গন্ধ, এটা জলে ভেজা মাটির গন্ধ— বোধহয় নানা গন্ধের সমাবেশ থেকেই আসছিল। এইসব গন্ধের প্রতিটি রূপ, ধরন, গতি আর উগ্রতা পর্যন্ত সে অনুভব করতে পারছিল। হঠাৎ তার সম্বিৎ হল, আর কী বুভুক্ষা তার সুপ্ত ঘ্রাণশক্তিকে সজাগ করে দিয়েছে তা ভেবে সে চমকে উঠল। কিন্তু এই কথা নিয়ে বেশি ভাবনা চিন্তা না করে যেদিক থেকে তেলেভাজা পুরী আর রসুনে-সাঁতলানো আলুর গন্ধ আসছিল সেইদিকে শরীরটাকে ঘেঁষে ধীরে ধীরে আঁধার গলির ভিতরে টেনে নিয়ে যেত লাগল কারণ নিজের শরীরে হাঁটবার সামর্থ্য সে একেবারেই পাচ্ছিল না। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল যে সে গভীর জলে ডুবে যাচ্ছে। আগে মনে হচ্ছিল যে কোনো ধোপা তার পেটের অন্ত্রগুলিকে ধরে মোচড় দিচ্ছে। আবার তার নাসারন্ধ্রে পুরী আর আলুর ক্ষিদে-জাগানো গন্ধ আসছিল। সে অধীর হয়ে আধ-বোঁজা চোখে নিজের প্রায় নির্জীব শরীরটাকে ঘেঁষে টেনে নিয়ে যেদিক থেকে আলু পুরীর গন্ধ আসছিল সে দিকে যেতে চেষ্টা করল।

খানিকটা সময় পরে সে যখন ঐ স্থানে পৌঁছল তখন দেখল পশ্চিমের দেয়াল আর তার সামনের ইমারতের পিছন দিকের পাইপ-গুলির মাঝখানে পঁচিশ-তিরিশ ফুট ব্যবধানে আবর্জনার একটা খুব বড় খোলা লোহার টব রয়েছে। এই টবটা পনেরো ফুট চওড়া আর তিরিশ ফুট লম্বা। রকমারি আবর্জনায় ভরা। পচাগলা ফলের খোসা, পাঁউরুটির ময়লা টুকরো, চায়ের পাতা, একটা পুরনো জ্যাকেট, বাচ্চাদের নোংরা ন্যাকড়া, ডিমের খোলা, খবরের কাগজের ছেঁড়া টুকরো, পত্রিকার ছেঁড়া পাতা, রুটির টুকরো, লোহার পাত, প্ল্যাস্টিকের ভাঙা খেলনা, কড়াইশুঁটির খোসা, পুদিনার পাতা, কলার পাতায় কিছু এঁটো পুরী আর আলুর তরকারী। পুরী আর আলুর তরকারী দেখে তার পেটের মধ্যে মোচড় দিল। কিছু সময়ের

জন্যে সে তার অধীর হাত টেনে নিল, কিন্তু আর সব সুগন্ধ যখন তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করল তখন আগের পুরী আর তরকারীর ক্ষিদে-জাগিয়ে-দেওয়া সুগন্ধ তীব্র হয়ে উঠল। মনে হল ঐকতানের বিশেষ কোনো স্বর হঠাৎ খুব চড়া হয়ে বেজে উঠল আর হঠাৎই সংযমের শেষ প্রাচীর ভেঙে পড়ল। তখনি তার কম্পিত অধীর হাত কলার পাতা খাবলে নিল আর অমানুষিক ক্ষুধা অসহায় হয়ে ঐ পুরীগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুরী-তরকারী খেয়ে সে বারবার কলার পাতা চাটল। পাতাখানিকে চেটে এত সাফ করে দিয়েছিল যে মনে হল তা গাছের নতুন পাতা। কলার পাতা চাটার পর সে নিজের আঙুল চাটল আর লম্বা লম্বা নখের মধ্যে জমে থাকা আলুর তরকারি জিভের ডগা দিয়ে চেটে নিয়ে খেল। এতেই তার তৃপ্তি হল না। সে হাত বাড়িয়ে আবর্জনা রাশি নেড়ে চেড়ে তার থেকে পুদিনার পাতা বার করে খেল; মূলোর দুটি টুকরো আর আধখানা টমাটো মুখ দিয়ে আরাম করে তার রস খেল। আর সব যখন খাওয়া হয়ে গেল তখন তার সাড়া শরীরে আলস্যভরা ঘুমের ঢেউ নেমে এল। সে ঐ টবের ধারেই ঘুমিয়ে পড়ল।

আট-দশ দিন এইভাবেই আলস্যভরা ঘুম আর অর্ধচেতনার মধ্যে কেটে গেল। সে ঘষতে ঘষতে টবের ধারে যেত। যা খাবার পাওয়া যেত তা খেয়ে নিত। আর যখন ক্ষিদে-জাগানো গন্ধের তৃপ্তিসাধন হয়ে যেত তখন তা ছাপিয়ে অন্য নোংরা গন্ধ উঠত। তখন সে ঘষতে ঘষতে টব থেকে দূরে ফুটপাথের মোড়ে চলে গিয়ে পিছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

পনেরো-বিশ দিন পরে ধীরে ধীরে তার শরীরে বল ফিরে এল। ধীরে ধীরে সে নিজের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে— এই জায়গা কেমন ভাল এখানে রোদ নেই, এখানে আছে গাছের ছায়া, কখনো কখনো পিছনের ইমারত থেকে কেউ জানলা খুলত আর কেউ হাত ঘুরিয়ে নীচের টবে রোজ আবর্জনা ফেলত। এই আবর্জনা [illegible] তার অন্নদাতা, তাকে দিনেরাতে আহার দিত। এ ছিল তার

জীবনরক্ষক। দিনে পথ মুখরিত হয়ে উঠত, দোকানপাট খুলত, লোকজন ঘুরে বেড়াত, বাচ্চারা পাখির মতো কিচমিচ করতে করতে পথ দিয়ে যেত, স্ত্রীলোকেরা রঙীন ঘুড়ির মতো হেলেদুলে চলে যেত—কিন্তু তা ছিল অন্য এক জগৎ। এই জগতের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না, এই জগতে তার কেউ ছিল না আর সে কারুর ছিল না। এই দুনিয়ার প্রতি তার ছিল ঘৃণা। এই দুনিয়া থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। শহরের গলি বাজার পথ তার কাছে ছিল এক ধোঁয়াটে ছায়ায় তৈরী জগৎ। বাইরের মাঠ খেত আর খোলা আকাশ তার কাছে ছিল এক ব্যর্থ কল্পনা। ঘরসংসার, কাজকর্ম, জীবন, সমাজসংঘর্ষ— এইসব অর্থহীন শব্দ পচে গলে আবর্জনারাশিতে গিয়ে মিশেছিল। ঐ দূরের জগৎ থেকে সে তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এই ছিল তার নিজের জগৎ—পনেরো ফুট লম্বা আর তিরিশ ফুট চওড়া।

মাস আর বছর চলে গেল। সে ঐ পথের মোড়ে বসে থাকত। লোকের দৃষ্টিতে সে ছিল এক পুরনো ন্যাড়া গাছের মতো, এক পুরনো স্মৃতিচিহ্নের মতো। সে কারুর সঙ্গে কথা বলত না, কাউকে সাহায্য করত না, কারুর কাছে ভিক্ষে চাইত না। কিন্তু যদি কোনোদিন সে উঠে চলে যেত তো সেখানকার প্রতিটি ব্যক্তি এতে বিস্মিত হত, আর বোধ হয় কিছুটা দুঃখিত হত।

সবাই তাকে বলত জঞ্জাল-বুড়ো। কারণ সবাই জানত যে সে কেবল জঞ্জালের টব থেকেই আপন আহার্য সংগ্রহ করে খেত। আর যেদিন তা থেকে কিছু মিলত না, সেদিন সে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ত বছরের পর বছর ধরে পথিকেরা আর ইরানী রেস্তোরাঁওয়ালারা তার এই স্বভাবের কথা জেনেছিল। তারজন্য যা কিছু দেবার তারা প্রায়ই জঞ্জাল-স্তূপে ফেলে দিত। আবার ইমারতের পিছনের জানালা দিয়ে ময়লা আবর্জনার অতিরিক্ত অন্য খাবার জিনিষ প্রায়ই লোকে ফেলে দিত। আস্ত আস্ত পুরী, কাবাব, অনেকটা তরকারি, মাংসের টুকরো, আধখাওয়া আম, চাটনি, কাবাবের টুকরো আর ক্ষীরমাখানো

কলাপাতা। খাওয়া-পরার সব ভালোমন্দ জিনিষ জঞ্জাল-বুড়ো এই টবের মধ্যেই পেয়ে যেত। কখনো কখনো ছেঁড়া পাজামা, ফেলে-দেওয়া জাঙিয়া, ধুলধুলি-ছেঁড়া জামা, প্ল্যাস্টিকের গেলাস। এ কি আবর্জনার টব? তার জন্যে এটা ছিল খোলা বাজার— যেখানে সে দিনে দুপুরে সকলের চোখের সামনে গালগল্প করত। যে দোকানে যে সওদা প্রয়োজন তা সে বিনা পয়সায় নিত। এই বাজারের সে ছিল একমাত্র মালিক। গোড়ায় গোড়ায় কয়েকটি ক্ষুধার্ত বিড়াল আর ঘেয়ো কুকুর তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। কিন্তু মারমার করে সে তাদের ভাগিয়ে দিয়েছিল। এখন সে এই টবের একমাত্র অধীশ্বর হয়েছিল। সবাই তার অধিকার মেনে নিয়েছিল। মাসে একবার মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা আসত আর এই টব খালি করে দিয়ে চলে যেত। জঞ্জাল-বুড়ো তার বিরোধিতা করত না কারণ তার জানা ছিল পরদিন থেকেই টব আবার ভর্তি হতে শুরু করবে। তার বিশ্বাস ছিল যে এই দুনিয়ায় মঙ্গল শেষ হয়ে যেতে পারে, প্রেম শেষ হয়ে যেতে পারে, বন্ধুত্ব শেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আবর্জনা কোনোদিন শেষ হয়ে যাবে না। সারা দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে বাঁচবার শেষ উপায় শিখে নিয়েছিল।

কিন্তু কথা এ নয় যে সে বাইরের দুনিয়ার খবর রাখত না। যখন শহরে চিনির দাম বেড়ে যেত তখন মাসের পর মাস আবর্জনার টবে মিঠাইয়ের টুকরোর চেহারা দেখা যেত না। যখন গমের দাম বেড়ে যেত তখন পাউরুটির একটি টুকরোও মিলত না। যখন সিগারেটের দাম বেড়ে যেত তখন এত ছোট সিগারেটের পোড়া টুকরো মিলত যে সে তা ধরিয়ে ধুমপান করতে পারত না। যখন জমাদারেরা হরতাল করেছিল তখন দুমাস ধরে টবের কোনো সাফাই হয় নি। আবার বকরীদের দিন যত মাংসের টুকরো মিলত তা অন্যদিন পাওয়া যেত না। দেয়ালীর দিন তো টবের আলাদা আলাদা কোণে মিঠাইয়ের অনেক টুকরো পাওয়া যেত। বাইরের দুনিয়ার এমন কোনো ঘটনা ছিল না যার সন্ধান সে আবর্জনার টব থেকে না পেত। গত মহাযুদ্ধ

থেকে শুরু করে মেয়েদের গোপন ব্যাধি পর্যন্ত সবকিছুরই সন্ধান পেত। কিন্তু বাইরের দুনিয়ার প্রতি তার কোনো রুচি ছিল না।

পঁচিশ বছর ধরে সে এক আবর্জনার টবের ধারে বসে বসে আপন জীবন কাটিয়ে দিল। দিনরাত, মাস-বছর তার মাথার উপর দিয়ে বায়ুতরঙ্গের মত প্রবাহিত হয়ে গেল। তার মাথার চুল শুকিয়ে শুকিয়ে বটগাছের ঝুরির মতো ঝুলতে লাগল। তার কালো দাড়ি সাদা হয়ে গেল। তার গায়ের রঙ তামাটে হয়ে গেল, মেটে আর বেগুনী রঙ হয়ে গেল। নোংরা চুল, ছেঁড়া ন্যাকড়া আর দুর্গন্ধভরা শরীর নিয়ে পথচারীর কাছে সে নিজেই যেন একটা জঞ্জাল-টবের মতো প্রতিভাত হত। সে ছিল এমন একটা টব যা কখনো কখনো অঙ্গভঙ্গি করত, আর অন্যের সঙ্গে নয়, নিজের সঙ্গে আর জঞ্জাল-টবের সঙ্গে কথা বলত।

জঞ্জাল-বুড়োকে জঞ্জাল-টবের সঙ্গে কথা বলতে দেখে লোকে আশ্চর্য হয়ে যেত। কিন্তু এতে আশ্চর্যের কথা কী আছে? জঞ্জাল-বুড়ো লোকদের সঙ্গে কোনো কথা বলত না, কিন্তু ওদের আশ্চর্য হতে দেখে মনে মনে নিশ্চয় ভাবত যে এই সংসারে কে আছে যে অপরের সঙ্গে কথা বলি। বাস্তবে এই সংসারে যত কথাবার্তা হয় তা মানুষের মধ্যে হয় না, হয় কেবল নিজের জাতের সঙ্গে আর তাদের কোনো স্বার্থের মধ্যেই। দুই বন্ধুর মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তা বাস্তবে এক প্রকার স্বগত কথন মাত্র। এই দুনিয়া একটা খুব বড় আবর্জনার স্তূপ। এখানে সব লোক আপন আপন স্বার্থের কোনো টুকরো, ব্যক্তিগত লাভের কোনো খোসা বা মুনাফার কোনো ন্যাকড়া খাবলানোর জন্যে সব সময় তৈরী হয়ে আছে। যারা আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বা নীচ মনে করে তারা মনের পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখুক— সেখানে কত না ময়লা আবর্জনা রয়েছে। ঐ আবর্জনা কেবল যমরাজই উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

এইভাবে দিনের পর দিন যায়, কত দেশ স্বাধীন হল, কত দেশ পরাধীন হল, কত সরকার এল, কত সরকার গেল, কিন্তু

জঞ্জালের এই টব যেখানে ছিল সেখানেই আছে আর তার কিনারে জঞ্জাল-বুড়ো ঐভাবেই অর্ধচেতনভাবে দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসে থাকত, মনে মনে বকবক করত, জঞ্জালের টব হাতড়াত।

তারপর এক রাতে ঐ আঁধার গলিতে যখন সে টব থেকে কয়েক ফুট দূরে দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে ছেঁড়া কাপড় গায়ে কুঁজো হয়ে ঘুমোচ্ছিল, তখন সে এক খুব তীক্ষ্ণ চীৎকার শুনে ঘাবড়ে গিয়ে জঞ্জাল-টবের দিকেই দৌড়েছিল। তারই ভিতর থেকে ঐ তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা যাচ্ছিল।

জঞ্জালের টবের কাছে গিয়ে সে টব হাতড়াল। তখন তার হাত কোনো নরম-নরম মাংসপিণ্ডে ধাক্কা খেল। আর একবার তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা গেল। জঞ্জাল-বুড়ো দেখল টবের মধ্যে পাঁউরুটির টুকরো, চোষা হাড়, পুরনো জুতো, কাঁচের টুকরো, আমের খোসা, বাসি চাট আর টেড়াভাঙা বোতলের মাঝখানে এক নবজাত উলঙ্গ শিশু পড়ে আছে আর হাত-পা নেড়ে নেড়ে তীক্ষ্ণ চীৎকার করছে।

এসময় পর্যন্ত জঞ্জাল-বুড়ো আশ্চর্য হয়ে এই মানবকটিকে দেখছিল। বাচ্চাটি নিজের ছোট্ট বুকের সব জোর দিয়ে নিজের আগমন ঘোষণা করছিল। বুড়ো খানিকক্ষণ চুপচাপ হতভম্ব হয়ে চোখ বড় বড় করে এই দৃশ্য দেখতে থাকে। তারপর তাড়াতাড়ি সামনে ঝুঁকে পড়ে জঞ্জালের টব থেকে বাচ্চাকে নিজের বুকে তুলে নিয়ে তাকে ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে নিল।

কিন্তু বাচ্চা তার কোলে গিয়ে কোনোমতেই চুপ করে থাকে নি। সে এ জীবনে সদ্য-সদ্য এসেছে, তারস্বরে নিজের ক্ষুধা ঘোষণা করছিল। সে এখনো বোঝে নি দারিদ্র্য কী হতে পারে, মমতা কতটা ভীরু হতে পারে, জীবন কিভাবে বিগড়ে যেতে পারে, জীবনকে কিভাবে ময়লা দুর্গন্ধময় হয়ে জঞ্জালের টবে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। এখন তার কিছুই জানা নেই। এখন সে কেবল ক্ষুধার্ত। সে কেঁদে কেঁদে নিজের পেটে হাত রাখছিল আর পা ছুঁড়ছিল।

জঞ্জাল-বুড়ো কিছুতেই বুঝতে পারছিল না সে কী করে এই

বাচ্চাকে চুপ করাবে। তার কাছে কিছুই ছিল না— না দুধ, না চুষিকাঠি। তার তো কোনো ছড়াও জানা নেই। সে অস্থির হয়ে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে চাপড়াতে শুরু করল আর খুব হতাশ হয়ে রাতের আঁধারে চারদিকে চেয়ে দেখল এ সময়ে বাচ্চার জন্যে দুধ কোথায় পাওয়া যাবে। কিন্তু যখন তার মাথায় কিছু এল না তখন সে তাড়াতাড়ি জঞ্জালের টব থেকে একটা আমের আঁটি বার করে নিয়ে তার প্রান্তভাগ বাচ্চার মুখে দিয়ে দিল।

আধ-খাওয়া আমের মিষ্টি-মিষ্টি রস যখন বাচ্চার মুখে যেতে থাকল তখন সে কাঁদতে কাঁদতে চুপ করে গেল আর চুপ করতে-করতে জঞ্জাল-বুড়োর কোলে ঘুমিয়ে গেল। আমের আঁটি পিছলে মাটিতে পড়ে গেল আর. বাচ্চা তার কোলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে রইল। আমের হলুদ হলুদ রস তখন পর্যন্ত তার কোমল ঠোঁটের উপর লেগেছিল আর তার কচি কচি হাত দিয়ে সে জঞ্জাল-বুড়োর বুড়ো আঙুল খুব জোরে ধরে রেখেছিল।

এক মুহূর্তের জন্য জঞ্জাল-বুড়োর মনে চিন্তা এল যে বাচ্চাটাকে এখানে ফেলে দিয়ে কোথাও পালিয়ে যায়। ধীরে ধীরে জঞ্জাল-বুড়ো বাচ্চার হাত থেকে নিজের বুড়ো আঙুল ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু বাচ্চা খুব জোরে ধরে রেখেছিল। জঞ্জাল-বুড়োর মনে হল, জীবন তাকে ফের ধরে ফেলেছে আর ধীরে ধীরে ধাক্কা দিয়ে তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে আসছে। হঠাৎ তার দুলারীর কথা মনে পড়ল। আর মনে পড়ল সেই বাচ্চার কথা যে দুলারীর গর্ভেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর হঠাৎই জঞ্জাল-বুড়ো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। মনে হল, আজ সমুদ্র-জলে এত বুদ্‌বুদ্‌ নেই যা তার চোখের জলে ছিল। গত পঁচিশ বছরে যত ময়লা আর নোংরা তার মনে জমে ছিল, আজ তা অশ্রুর তুফানে এক ধাক্কায় সাফ হয়ে গেল।

সারা রাত জঞ্জাল-বুড়ো ঐ নবজাত শিশুকে নিজের কোলে নিয়ে অস্থির ও অশান্ত হয়ে ফুটপাথে পায়চারি করল। যখন সকাল হল

আর সূর্যের আলো দেখা দিল তখন লোকে দেখল জঞ্জাল বুড়ো আজ জঞ্জালের টবের কাছাকাছি বসে নেই, পরন্তু পথের ধারে তৈরী-হওয়া ইমারতের নীচে ইঁট বইছে, আর এই ইমারতের কাছে এক কৃষ্ণচূড়া-গাছের ছায়ায় ফুলের নক্সাওলা কাপড়ে শুয়ে এক ছোট্ট শিশু মুখে দুধের চুষিকাঠি নিয়ে হাসছে।

গালিচা

আজ তো এই গালিচা পুরনো হয়ে গেছে, কিন্তু আজ থেকে দু বছর পূর্বে যেদিন হজরতগঞ্জের এক দোকান থেকে আমি এটি কিনেছিলাম সেদিন এটি ছিল নরম। এর জমি ছিল নরম, হাসি ছিল নরম, এর প্রতিটি রঙ ছিল নরম; এখন না, দু বছর আগে! আজ তো এ পুরনো হয়ে গেছে। এর প্রত্যেকটি তন্তু পুরনো আর দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। রঙ জ্বলে গেছে। এর মুচ্‌কি হাসিতে অশ্রুর ছোঁয়া আর জমিতে স্থানে স্থানে কোনো উপদংশগ্রস্ত রোগীর মতো গর্ত হয়ে গেছে। পূর্বে এই গালিচা ছিল উজ্জ্বল, এখন মলিন। এখন বিষাক্ত হাসি হাসে আর এমনভাবে শ্বাস নিতে থাকে যে মনে হয় সংসারের সমস্ত আবর্জনা তার বুকে মেখে নিয়েছে।

এই গালিচা দৈর্ঘ্যে ছিল নয় ফুট। চওড়ায় পাঁচ ফুট। একটা পুরো পালঙ্ক যত চওড়া হয় ততটাই চওড়া। গালিচার চৌকোণ বাদামী রঙের, দেড় ইঞ্চি চওড়া। এর পর আসল গালিচা শুরু। গাঢ় লাল রঙে শুরু হয়েছে। গালিচার পুরো প্রস্থ আর দৈর্ঘ্য জুড়ে এই গাঢ় লাল রঙ ছড়িয়ে আছে। অর্থাৎ ২ ফুট × ৬ ফুট ক্ষেত্র জুড়ে আছে। লাল রঙের একটা ঝিল তৈরি হয়েছে। আবার এই ঝিলের মধ্যেও লাল রঙের ঝলক আরো কয়েকটি রঙের খেলা দেখিয়েছে। ঘন লাল, গোলাপী, হাল্কা গোলাপী আর রক্তের মতো গাঢ় লাল রঙ। ঘুমোবার সময় আমি সর্বদাই গালিচার এই অংশের উপর মাথা রাখতাম আর প্রতিবার অনুভব করতাম যে আমার মাথায় জোঁক লেগে আছে, তারা আমার দুর্গন্ধময় রক্ত চুষে খাচ্ছে।

আবার এই রক্তাক্ত চৌকোণাক্ষেত্রের ভিতরে আরো পাঁচটি চৌকোণ আছে। সেগুলির রঙ আলাদা আলাদা। এই চৌকোণগুলি গালিচার পুরো চওড়া আয়তনে ছড়িয়ে আছে। শেষ চৌকোণে গালিচার দৈর্ঘ্য শেষ হয়ে গেছে। তারপর শতরঞ্জর বর্ডার শুরু হয়েছে। রক্তিম চৌকোণের ঠিক নিচেই আছে তিনটি ছোট ছোট

চৌকোণ— প্রথমটি শাদা আর কালো রঙের শতরঞ্জ, দ্বিতীয়টি শাদা আর নীল রঙের, তৃতীয়টি কৃষ্ণনীল আর খাকি রঙের। এই শতরঞ্জগুলি দূর থেকে ঠিক বসন্তের গুটিদাগের মতো দেখায় আর কাছ থেকে দেখলেও এর সৌন্দর্য খুব একটা বেশি দেখা যায় না, পরন্তু নীলামে-তোলা পুরনো কোটের জমির মতো ময়লা-ময়লা আর বিশ্রী দেখায়। প্রথম চৌকোণ যদি রক্তের ঝিল হয় তো, বাকি তিন ছোট ছোট চৌকোণ একত্রে পুঁজের ঝিলের মতো দেখায়। এদের শাদা, কালো, হল্‌দে, ব্লু-ব্ল্যাক রঙ পাপের ঝিলের মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে, এটা দেখা যায়। এই ঝিলের মধ্যে আমার দুই কাঁধ, আমার হৃদয় আর আমার হাড়ের খাঁচার মধ্যে শ্বাসযন্ত্র থাকে।

চতুর্থ চৌকোণের রঙ হলদে আর পঞ্চমের রঙ সবুজ, তা গভীর সমুদ্রের রঙের মতো সবুজ। বসন্ত ঋতুর মতো সবুজ রঙ নয়। এ এক সর্বনাশা রঙ। এই রঙ দেখে হাঙ্গরের কথা মনে পড়ে যায়। আবার ডুবন্ত জাহাজযাত্রীদের আর্তনাদ শোনায়। আবার উছলে-পড়া তুফানের তরঙ্গের ভীম গর্জন আর কম্পন সৃষ্টি করে। এই হলদে কর্দমাক্ত রঙ অশুভ রঙ। এই রঙ কেসরের রঙের মতো, বসন্তের মতো হলুদ রঙ নয়। এ রঙ মাটির মতো হলদে, ক্ষয়রোগীর মতো হলদে। প্রথম পাপের মতো হলুদ রঙ। এমন এক হলুদ রঙ যার মধ্যে অনুতাপের অগভীর অনুভবও আছে। আমার তো মনে হত যে এই চৌকোণ বারবার বলছে, 'আমি কী বলব? আমি কী বলব?'

গালিচার যে অংশে আমি মাথা রেখে শুই তার ডান কোণে নীল আর হলদে রঙের দশটি সরল রেখা অঙ্কিত আছে আর যে অংশে আমি পা ছড়িয়ে দিয়ে শুই সেখানে এগারোটি সরল রেখা আছে। এগুলি হলদে আর ফিরোজা রঙের। গালিচার মাঝখানে লাল আর শাদা রঙের ছয়টি সোজা রেখা, আর তারই মধ্যে আছে এক গাঢ় কালো রঙের বিন্দু···যখন আমি গালিচায় ঘুমিয়ে পড়ি তখন আমার

মনে হয় যে কেউ আমাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত এই রেখার জালে বন্দী করে ফেলেছে। আমাকে কেউ যেন ক্রুশে আটকে দিয়ে আমার মনের ভিতরে এক গাঢ় কালো রঙের কীলক প্রোথিত করে দিয়েছে। চারদিকে দুর্গন্ধময় রক্ত, পুঁজ আর সবুজ রঙের সমুদ্র না জাঙ্গর আর সহস্র-পাদ সামুদ্রিক প্রাণীতে ভরা। গালিচায় ঘুমোবার সময় যে কষ্ট আমার হত বোধহয় ক্রুশের উপর শায়িত যীশুরও এত কষ্ট হয় নি। কিন্তু কষ্ট-সাধনা মানবজীবনের এক নিয়ম। এই কারণে আমি নিজের থেকেই গালিচাকে দূর করে দিতে পারি না। আর তা হয় না বলে অন্য কোনো গালিচা কেনার সাহস হয় না। আমার কাছে এই একখানি গালিচা আছে, আর মনে হয় আমার মরার সময় পর্যন্ত এই একই গালিচা থেকে যাবে।

আসলে এক যুবতী এই গালিচা কিনতে চেয়েছিল। হজরতগঞ্জে এক দোকানের ভিতরে সে যখন এটিকে খুলিয়ে নিয়ে দেখছিল, তখনই এটি আমার দৃষ্টিতে পড়েছিল ও পছন্দ হয়েছিল। ঐ যুবতী কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারছিল না আর এটা ছেড়ে ব্লাউজের জন্য রেশমী কাপড় দেখছিল।

আমি ম্যানেজারকে বললাম, 'আমি এই গালিচাখানা কিনতে চাই।'

যুবতীর দিকে ইঙ্গিত করে সে বলল, 'মিস রূপবতী বোধহয় পছন্দ করে ফেলেছেন···বোধহয়। দাঁড়ান, আমি ওঁকে শুধাই।'

রূপবতী বলল, 'গালিচাখানা খারাপ নয়।'

···খারাপ নয়, কী বলছেন আপনি? আমি ভড়কে গিয়ে বললাম, "এইরকম গালিচা দুনিয়াতে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। দান্তের কল্পনাতেও এইরকম সুন্দর নক্সা তৈরী হবে না। এই গালিচা হাসপাতালের দুর্গন্ধ বালতির মতো সুন্দর। উন্মাদরোগীর মতো আত্মপ্রশংসায় মুখর। আগুন আর পুঁজের নদীতে হাতিমতাইয়ের যাত্রার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। প্রাচীন ইতালীয় সন্ন্যাসী চিত্রকরদের আঁকা অনুপম ছবির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এ তো

গালিচা নয়, ইতিহাস, মানবতার আত্মা।'

যুবতী মুচকি হাসল। তার দাঁতগুলি খুব শাদা, কিন্তু একটু টেড়া-বেঁকা, একটির উপর আরেকটি জুড়ে আছে। তবু তার মুচকি হাসি খুব ভাল লাগল। সে বলল, 'আপনি কি কখনো ইটালি গিয়েছিলেন?'

আমি উত্তর দিলাম, 'ইটালি কোথায়? আমি তো এখন পর্যন্ত হজরতগঞ্জের ওপারেও যাই নি। এখানেই জীবন কেটে গেল— এই পানের দোকানে আর সামনে কফি হাউসে।'

ম্যানেজার তখন দুজনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত মনে করল আর বলল, 'ইনি শিল্পী। কাগজে ছবি আঁকেন। আর ইনি মিস্ রূপবতী। এখানে মেয়েদের কলেজে প্রিন্সিপ্যাল হয়ে এসেছেন। সবেমাত্র ইংল্যাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে এখানে...'

সে বলল, 'বেশ, এই গালিচা আপনিই নিয়ে নিন। আমার তো খুব একটা পছন্দ নয়।'

'আপনার বিশেষ অনুগ্রহ।' আমি গালিচার দাম দিতে দিতে বললাম, 'আপনি কি আমার সঙ্গে কফি পান পছন্দ করবেন? চলুন না কফি হাউসে, অবশ্য যদি আপনার খারাপ না লাগে...অর্থাৎ...'

'ধন্যবাদ। কিন্তু তার আগে এই ব্লাউজের কাপড়টা দেখে নিই।' সে ফের মুচকি হাসল।

তার মুচকি হাসি বড় সুন্দর লাগল। হলুদ রঙের সুন্দর গোল চেহারা। ফিকে হলুদ রঙের উপর ঠোঁটের লাল রঙ এক বিচিত্র প্রকারের রসের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিল। ব্লাউজের কাপড় কিনে যখন সে আমার সঙ্গে চলতে শুরু করল তখন সে টলমল করছে। আমি তার বাহু ধরে তাকে চলতে সাহায্য করতে করতে প্রশ্ন করলাম, 'কী ব্যাপার? আপনি কি সবসময়েই টলমল করে হাঁটেন?'

সে বলল, 'না তো...'

আমি নজর করে দেখলাম। পায়ে পট্টী বাঁধা আছে।

'ঘা আছে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ, বুড়ো আঙুলের নখ বেড়ে গেছে। জমির ভিতর··· জাহাজের সার্জনটা ছিল একেবারে গাধা···' সে তার মাথার উপর শাড়ীর আঁচল টেনে দিয়েছিল। আর সে যখন প্রথমবার বাঁক মুড়েছিল তখন দেখলাম তার ডান কাঁধের কাছে কেশের মধ্যে হলদে গোলাপ ফুল আটকানো রয়েছে। যখন সে আবার বাঁক নিয়েছিল তখন তার মাথায় কুঙ্কুমের ঔজ্জ্বল্য আমার নজরে এসেছিল। এর পূর্বে এই কুঙ্কুম এত সুন্দর কেন ছিল না আমি মনে মনে ভেবেছিলাম।

কফি হাউসে বসে আমি অনুভব করলাম সে কত সুন্দর। কফি হাউসে আলোর ব্যবস্থা এমনই ছিল যে পুরুষদের দেখায় কুরূপ আর মহিলাদের দেখায় সুন্দর। তবু—হ্যাঁ—কিছু আলো তো ছিল, অন্যথা সব লোক বারবার মুখ ঘুরিয়ে কী দেখছিল? মহিলাদের খর দৃষ্টি কেন ঘুরছিল? বেয়ারার দল কেনই বা এত ঘন ঘন টেবিলের কাছে আসছিল?

সে মুচকি হেসে বলল, 'দেখো বেয়ারা, একটু গরম দুধ আর আলাদা পেয়ালায় গরম জল নিয়ে এসো।'

'গরম জল তো···' থমকে গিয়ে বেয়ারা বলল।

'অল্প একটু গরম জল, ব্যস।' সে ফের মুচকি হাসল আর বেয়ারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত গলে গেল যেন তার শরীর কাঁচের তৈরী। আমি তাকে গলে যেতে দেখলাম। তার ঠোঁটে মুচকি হাসি দেখা দিল। সারা শরীর গলে যেতে যেতে সে চলে গেল। এই দৃষ্টি কী? এই চমক কী রকম? এ কফি হাউসের বিজলীর চমক নয় তো?

'বেয়ারা, ডিমের স্যাণ্ডউইচ···' সে ফের বলল।

বেয়ারা ফিরে এসে বলল, 'জী. ডিম স্যাণ্ডউইচ তো শেষ হয়ে গেছে।'

'একটুও কি নেই?' তার বড় বড় অমলিন মর্মঘাতী চোখদুটি আরো বেশি বিস্ফারিত হল বলে মনে হল। ব্যস নাচার! 'এক প্লেটও নেই?'

স্যাণ্ডউইচ পাওয়া গেল।

সে বলল, 'না, বিল আমি দেব।'

আমি বললাম, 'না, তা কী করে হতে পারে? আমি তো পুরুষ।'

সে হেসে বলল, 'খুব পুরনো কথা।' সে বিল দিয়ে দিল।

ঘরের চাকরের গালিচা পছন্দ হয় নি। ঐ সময় বাড়িতে এক তেজী কবি অতিথি ছিলেন। তিনি প্রতি বছর কবিতা লিখতেন, মদ খেতেন আর পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তেন। তাঁরও গালিচা পছন্দ হয় নি। আমি যখন শুধোলাম উনি কেবল 'হুঁ' বলে থেমে গেলেন। উনি কবিতা যত লম্বা লিখতেন কথা ততই কম বলতেন

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'হুঁ মানে কী? কিছু তো বলো। এই রঙের মিল…'

'হুঁ।'

রূপবতী মনোযোগের সঙ্গে কবিকে দেখছিল। তারপর খিলখিল করে হাসল। ঐ জরাজীর্ণ কবিকে বলল, 'আপনার নতুন কবিতা শোনান।…আপনার জানা আছে যে আজকাল স্পেণ্ডার আর লাউডন কোন্ বিষয় নিয়ে কবিতা লিখছেন?'

'হুঁ।' সে তার নিজের দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল।

আমি রূপবতীকে শুধোলাম, 'আপনি কি তাঁদের আপনার কবিতা শুনিয়েছিলেন?'

'না, কিন্তু আমাকে জো বলেছিল।'

'কোন্ জো?'

'জো ব্রাউন। তার নাম শোনেন নি? আজকাল অক্সফোর্ডের সর্বজনপ্রিয় কবি। ভারতে এখনো তাঁর কবিতা পৌঁছয় নি। লণ্ডনে সে আমার ওপর মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।' সে কিছুটা বিচিত্র, কিছুটা নির্লজ্জ, কিছুটা লজ্জাজড়িত হাসির সঙ্গে কথা বলছিল আর তার মাথার কুম্কুম্ গোমেদের মতো চমকাচ্ছিল।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তোমার জীবন বিজয়পূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।'

'না।' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। এমনভাবে বলল যে তাকে আমার বুকে নিতে ইচ্ছে করল।

'হুঁ।' কবি বলল।

রূপবতী মুচকি হেসে বলল, 'তোমার কবি তো খুব কম কথা বলে?...শোনো, আমি তোমাদের একটি কবিতা শোনাচ্ছি।'

আমার বিস্ময় বেড়ে চলছিল। আমি শুধালাম, 'তুমি কবি?'

'না, এ কবিতা আমার মা লিখেছিলেন।'

'থামো, আমাকে এই গালিচা বিছিয়ে নিতে দাও।'

গালিচা বিছানো হল আর রূপবতী গান গেয়ে কবিতা শুনাল। বাংলা কবিতা। উদাস, বিরহের রাতের মতো জ্বলছে...দীপের সুন্দর আভা। কণ্ঠস্বরের মৃদু কাঁপন, তার প্রভাব মদের নেশার মতো, যুবতীদের সারি...ঘড়া কাঁখে নিয়ে ঘাটের দিকে যাচ্ছিল। সমুদ্রের সবুজ তরঙ্গমালা উছলে পড়ছিল।...এখন পরিবেশ মৌন আর রূপবতীর দু'চোখে অশ্রু...গাল দিয়ে গড়িয়ে অশ্রু গালিচায় পড়ল আর ঐ লাল চৌকোণ আগুনের শোলা হয়ে গেল।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তোমার সঙ্গে জো ব্রাউনের ভালবাসা হয় নি?'

রূপবতী চোখের জল মুছে নিল। বলল, 'আমার সঙ্গে যে ছেলেটির ভালবাসা ছিল লণ্ডনেই তার ক্ষয়রোগ হয়েছিল। সে জাহাজে আমার সঙ্গে আসছিল, কিন্তু পথেই তার মৃত্যু হয়—এডেনের পরে লোহিতসাগরে সে মারা যায়।'

'লোহিত সাগর,' আমি ভাবলাম, আর গালিচার লাল চৌকোণ 'লোহিত সাগর' হয়ে গেল আর তার গভীর জলে আমি এক হলুদ রঙের কাশিগ্রস্ত চেহারা দেখতে পেলাম, তারপরই সে তরঙ্গাবর্তে ডুবে গেল।

রূপবতীর প্রেমিক স্বপ্নলোকে আছে, লাল সাগরের জলে...আর আমার গালিচার উপর রূপবতীর অশ্রু ঝরে পড়ছিল...

'হুঁ।' কবি বলল। আমি একটা বই দিয়ে তার মাথায় মারলাম

চোখের জলের মধ্য দিয়ে রূপবতী মুচকি হাসল। কখনো কখনো চোখের জল ফেলার চেয়ে অন্তর-জ্বালা সহ্য করা বেশি কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে।

রূপবতী।

কী বিচিত্র এই মেয়েটি। লণ্ডনে কবি জো ব্রাউন তার সঙ্গে প্রেম করত আর লখনউ-এ হজরতগঞ্জে এই ভবঘুরে-মেজাজের গরিব শিল্পী তার প্রেমে বাঁধা পড়ে গেল। এ কথা জেনেও ঐ বিষ ঐ পেয়ালা থেকে সে কীভাবে পান করেছিল? নৈরাশ্য, বিবশতা, প্রেমের সাড়া সর্বদা প্রেম হয় না কেন? এ কী ধরনের আগুন যা একজনকে জ্বালায় আর অপরজনের হৃদয়ে পাথরের চাঙড় হয়ে যায়। যা একের অশ্রু তা অপরের ঠোঁটে মুচকি হাসির ছায়াও নিয়ে আসতে পারে না?

গালিচায় থাপ্পড় মারতে মারতে আমি গালিচাকে প্রশ্ন করলাম।

গালিচা উত্তর দিল, 'আমি ক্রুশ। আমি দুঃখ আর বেদনাকে জানি। দুঃখ আর বেদনার ওষুধ জানি না।'

আর রূপবতী বলল, 'এ হল নিয়তি। নিয়তি তোমাকে গালিচা কেনার জন্য ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। নিয়তি তোমাকে আমার সঙ্গে মেলবার সুযোগ দিয়েছে। এখন তোমার ভাগ্য এই যে তোমায় আমায় এই প্রেম হতে পারল না। হাজার প্রয়াস করলেও এই বন্ধুত্ব প্রেমে পরিবর্তিত হতে পারবে না। এ নিয়তি নয় তো আর কী?' সে আরো বলতে লাগল, 'কবি, তোমার কবিতা শোনাও।'

কিছুদিন বাদে রূপবতী আমাকে হঠাৎ বলল, 'তোমার কবির সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছে।'

'মিছে কথা...ঐ নির্বোধের সঙ্গে...'

সে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, 'তুমি ওর চোখ দুটি দেখেছ? যেন ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে আছেন যীশু...ঐ চোখ দুটিতে রয়েছে কত দুঃখ।'

আমি বললাম, 'যদি তুমি চাও তো আমি আমার চোখ দুটি অন্ধ করে দিই?'

বোধহয় আমার কথা তার খারাপ লেগেছিল। গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'তা নিয়ে কী করব ?'

'হ্যাঁ, হৃদয়ই তো আছে।' আমি ব্যঙ্গ করে বলেছিলাম।

'হুঁ।' কবি বলেছিল।

যেদিন ওরা দুজনে বিদায় নিল সেদিন আমি তাদের এক ছোটখাট নিমন্ত্রণে ডেকেছিলাম। রূপবতী একখানি কালো ঢাকাই শাড়ি পরেছিল। চোখে দিয়েছিল গাঢ় কাজল। রেশমী চুড়ির রঙও ছিল কালো। প্রতিদিন ওকে দেখে প্রকাশের, সূর্যের, চাঁদের, চন্দ্রকিরণের, আলোর অনুভূতি হত। জানি না আজ ওকে দেখে অন্ধকারের অনুভূতি কেন হচ্ছিল। তার নিজের পূর্ণ প্রসন্নতার ক্ষণেও দুঃখ আর নিরাশার প্রতিমারূপে সে কেন দেখা দিচ্ছিল ? এ আঁধার গরিব শিল্পীর মনের আঁধার নয় তো ? আজ আমি তাকে সেই গান শোনাতে চেয়েছিলাম যে গান সে প্রথম দিন গেয়েছিল··· আমার মনে আছে, গানের পর সে নেচেওছিল। আমি তার মুখ দেখি নি, তার পা দেখছিলাম। আবছা-আবছা পা, তাতে মেহেদীর লাল রেখা বিদ্যুতের মতো চমকে উঠছিল। সে নাচছিল আর আমি সেই অন্ধকারে মেহেদী রঙের রেখার নৃত্য দেখছিলাম। যখন সেই নাচ শেষ হল তখন আমি ঐ পা দুখানি তুলে নিয়ে আমার বুকের ওপর রেখেছিলাম। কেন আজ পর্যন্ত এই বুকে ঐ পা দুখানি সুরক্ষিত আছে··· ? এই পিরামিডে মৃত মামিদের অতিরিক্ত আর কিছুর স্থান নেই কি ?

সে চলে গেল, আমি আবার গালিচায় এসে বসলাম। এক খসে-পড়া বিবর্ণ গোলাপের কুঁড়ি গালিচার উপর পড়ে রয়েছিল···আমার হৃদয়ে এখন বোধহয় রূপবতীর আর কোনো স্মৃতি অবশিষ্ট ছিল না, কেবল ঐ দুটি পায়ের স্মৃতি ছিল আর গোলাপের এই বিবর্ণ কুঁড়ি ···এ কেমন চিত্র ? শিল্পী হয়েও আমি বোধহয় এমন বিচিত্র চিত্র কখনো আঁকি নি।···তা হলে ?

আমি গালিচাকে প্রশ্ন করছিলাম।

গালিচা উত্তর দিয়েছিল, 'আমি তো ক্রুশের উপর আছি। ক্রুশ দেয় মৃত্যু, জীবনের পরম্পরার জ্ঞান সে দেয় না।'

বেশ, একেও যেতে দাও। যা হয়েছে তা হয়েছে। যদি জীবনের কবরেরই আনন্দ নিতে হয় তবে আরাম থেকে তাকে নেওয়া যাবে না কেন? যদি মধুতে বিষ মিশিয়ে পান করতে হয় তবে বিশুদ্ধ বিষ পান করা যাবে না কেন? যদি সারল্য স্থায়ী হতে না পারে তবে পাপের কোলে আশ্রয় নেওয়া যাবে না কেন? এসো, নিজের আত্মার যে সামান্য অংশ থেকে গেছে তাকে চুপ করিয়ে দাও আর বর্তমান অন্ধকারে পাপের প্রসার দেখ আর জীবনকে মুখ ভেঙচে ঠা-ঠা করে হাসো। প্রেম না হোক, লালসা হোক।

শিল্পী আর একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে নিলেন। সে ছিল সপ্তাহান্তিক প্রমোদা। তার নাম আশা। কিন্তু তার চেহারায় সম্পূর্ণ নিরাশা বর্ষিত হচ্ছিল। এইরকম ক্ষুধার্ত মেয়ে সে কখনো দেখেই নি। বেচারী কুক্কুরীর মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। বোধহয় তার প্রতি শিল্পীর দয়া হয়েছিল। সে মেয়েটির প্রতি স্নেহ প্রকাশ করছিল। পালন করার মতো স্নেহময় মনোভাব নিয়ে সে মেয়েটিকে নিয়ে সব জায়গায় ঘুরছিল। লোকে তার এই নির্বাচনকে ব্যঙ্গপূর্ণ প্রশংসা করছিল কিন্তু সে একপ্রকার আদরের সঙ্গে এই প্রশংসা মেনে নিয়েছিল। যদি কেউ বলত, 'ভাই, মেয়েটি বড় অসুন্দর। তুমি কী ভেবে ···?' সে তখনি তার সঙ্গে লড়ে যেত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করত। কাঠকয়লা দিয়ে সে আশার ছবি এঁকে নিজের স্টুডিওতে সবাইকে ঐ ছবি দেখাত। সে তার নিজের ক্ষত দেখিয়েছিল ... দেখো ... দেখো দেখো .... আমি তোমাদের কী পরোয়া করি ··· আমি আপন আত্মার নিজেই মালিক ... বিষ ••• কাঠকয়লা।

কিন্তু যে কখনো হজরতগঞ্জের ও-পারে যায় নি, আজ সে ওখান থেকে পালাবার কথা ভেবেছিল। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সে হাজারটা উলটো-পালটা স্বপ্ন দেখতে থাকে। পথের প্রতিটি পাথরে

সে কারুর আবছা-আবছা পা-দুখানির কম্পিত ছায়া দেখেছিল। কফির পেয়ালায় প্রতি শ্বাসে সে তার গরম শ্বাসের স্পর্শ অনুভব করেছিল আর বিজলী বাতির উজ্জ্বল আলোয় সে অসংখ্য কুম্‌কুমকে ভাসতে দেখেছিল। সে ঘুরে গিয়ে দেখত, এই রাজহংসী কোথা থেকে এসেছে? খাঁচার তালা ভেঙে উড়ে গেছে বুলবুল— আর সে কেন এখন পর্যন্ত হজরতগঞ্জের মরুভূমিতে কয়েদ হয়ে আছে?... কেন? কেন? কেন? সেই মেহেদী-রঙের রেখা বারবার বিদ্যুতের মতো চমকে উঠে বারবার তাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করছিল।

সে যখন শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল তখন সে তার সব বন্ধুকে, ঐ সপ্তাহান্তিক প্রমোদা-মেয়েটিকে আর সব সখীকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিল। আর নিমন্ত্রণের শেষে সবাই যখন চলে গিয়েছিল তখন প্রমোদা-মেয়েটি হয়রান আর পরিশ্রান্ত হয়ে ঐ গালিচার উপর বসেছিল আর হঠাৎই তার বুকের উপর পড়ে কাঁদতে শুরু করেছিল। মেয়েটির উষ্ণ অশ্রু তার বুকে বরফের ফল হয়ে যাচ্ছিল। প্রেমের উত্তর প্রেম কেন হয় না? এ কেমন আগুন যা একরে জ্বালিয়ে দেয় আর অপরে পাথরের চাঙড় হয়ে যায়?

মেয়েটি গালিচার উপর ঘুমিয়েছিল। প্রসারিত বাহু দুটির সমরেখায় প্রসারিত ছিল পা দুখানি। গালিচা চুপিচুপি তার হৃদয়ের মধ্যে এক কীলক প্রোথিত করে দিল। পিরামিডের জন্য এক মামি তৈরী হয়ে গেল। কিন্তু ওখানে জায়গা কোথায়। বুকের উপর এখনো ঐ পা দুটি নেচে চলেছে ... আর ঐ গোলাপের এক বিবর্ণ কুঁড়ি ...

আমি গালিচাকে শুধালাম, 'এ কেমন খেলা? আমি কাকে মুখ ভেঙচাচ্ছি? এই ক্ষত কার? এই মেয়ে কেন কাঁদছে? যদি এ সবই ভাগ্য হয় তা হলে এইসব কর্মপ্রয়াস কেন? নিষ্প্রাণ মমিকে জীবিত করে তোলার এই সংকল্প কেন?'

গালিচা উত্তর দিয়েছিল, 'আমার জানা নেই। আমি এক ক্রুশ, যে হৃদয়ে কালো কীলক ঠুকে দেয়! উজ্জ্বল আলো আমার নেই। ভাগ্যের শেষ যে দেখায় তার প্রারম্ভ আর যৌবন নেই।'

'তোমাকে জ্বালিয়ে রেখে কোথায় ফেলব?'

'ঐ নয়া শহরে।'

চারটি লোক গালিচার উপর বসে তাস খেলছিল।

দুজন অভিনেতা।

আর যে তামাশা দেখাচ্ছিল সে হল শিল্পী।

তাস খেলতে খেলতে অভিনেতা আর সওদাগর লড়াই শুরু করে দিল। ধ্বস্তাধ্বস্তির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। গালিচা উলটে-পালটে যাচ্ছিল কারণ সওদাগর এক চালে ভুলে বা জেনেশুনে আট আনা বেশি নিয়ে নিয়েছিল। আমার সামান্য কুটির উথাল পাথাল হয়ে যাচ্ছিল, কারণ যে লোক মাঝখান বাঁচিয়ে চলে সেই সবচেয়ে বেশি মারে।

আমি ফের ভাবলাম এই বদমেজাজকে দূর করবার উপায় কী? গল্পসল্প? অসম্ভব। গ্রামোফোন? বাজে। চা? ধুৎ। মদ? বাঃ-বাঃ।

সব লোক মদ খাচ্ছে। শিল্পীর চোখ দুটি লাল হয়েছে। সদা হাস্যময় প্রসন্নতাময় সুন্দর অভিনেতা, সদা চুপচাপ কম দরের সুন্দর অভিনেতাকে বলছিল, 'প্রেম? প্রেম? শালা। তোরা প্রেমের কী জানিস? তোরা তো এখনো কলেজের ছোকরা ... হেঃ ... প্রেমের নেশা কী তা আমায় জিজ্ঞেস কর ... শালা এই মদ বিলকুল ফিকে ... তুমি রানীকে দেখেছ?'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'রানী ১৯৪৪-এর এক নম্বর অভিনেত্রী ছিল না?'

'জী, হ্যাঁ—সে—সে—শালা তুই কী জানিস?... সে ছিল আমার প্রেমিকা ... বুঝলি? ... হেঃ। ওর জন্য আমি মা-বাপের কাছে গাল খেয়েছি ... কয়েকটি উপপতির সঙ্গে লড়েছি ... নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিয়েছি ... এই আংটি ... শালা, দেখছিস্ ... এই জামার বোতাম ... এই কাফ বোতাম ... এসব সোনার, বুঝলি শালা। তুই কি জানিস .... এ সবই ও আমায় দিয়েছিল ... উপহার ... কিন্তু আমি তাকে বিয়ে করব না, কখনো করব না।' সে দৃঢ়তাপূর্ণ কণ্ঠে বলেছিল।

'কেন ?'

'সে আমাকে চায় কিন্তু সে আমার চেয়ে অনেক ধনী ··· সে আমাকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু আমি মরে যাব তবু ওকে বিয়ে করব না।'

এক সওদাগর প্রশ্ন করল, 'ওর প্রতি তোমার প্রেম নেই ?'

দ্বিতীয় সওদাগর প্রশ্ন করল, 'ঘরে আসা লক্ষ্মীকে কেন ছাড়ছ ?'

অভিনেতা ঘুঁষি তুলে বলল, 'আমি যা, তাই থাকব। আমি ওকে ভালবাসি কিন্তু ওর চাকর হয়ে থাকতে পারব না। আমি তার প্রেম চাই, ধন নয়, উঃ।' গালিচার উপর জোরে হাত চাপড়ে এই কথা বলতে বলতে হাসতে লাগল।

গালিচা কেঁপে উঠল। তার রঙ বিচিত্র হয়ে গেল।

'হারামজাদা, আরো মদ দে।' অভিনেতা নিজের খালি গেলাস হাতে ধরেছিল।

আমি বললাম, 'রানী। আরে ভাই, আজই তো সংবাদপত্রে পড়লাম রানী এক আমেরিকানকে বিয়ে করে ফেলেছে।'

অভিনেতা গালিচার ওপর আস্তে করে মদের গেলাসটি গড়িয়ে দিল। তার আঙুলগুলি কাচের উপর সজোরে বসে গিয়েছিল। তার আঙুল কেটে কাচ টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

সে রোদনভরা কণ্ঠে বলেছিল, 'এ মিছে কথা, পুরোপুরি মিছে কথা।'

সে আবার চীৎকার করেছিল। তারপর একেবারে চুপ হয়ে গেছিল। দ্বিতীয় অভিনেতা তার গেলাসে মদ ঢালছিল। সে তখন পর্যন্ত চুপ করেছিল। প্রথম অভিনেতা গালিচায় শুয়ে হেঁচকি তুলছিল। সে আবার গালিচার উপর বমি করে দিয়েছিল ··· আমার মনে হল গালিচার রঙ বদলে যাচ্ছে। রক্ত লাল থেকে সাদা, আবার হলদে রঙ। যেন এ গালিচা নয়, জীবনের কফিন।

রানী! রানী! রানী!

সকালে আমি গালিচা ধুয়ে সাফ করিয়ে ঘরে রেখেছি, সঙ্গে সঙ্গেই

আমার প্রেমিকা ঘরে ঢুকেছে। এ আমার নয়া শহরের প্রেমিকা। এখানে এসে শিল্পী আবার প্রেম করেছে। প্রেম করা কত কঠিন, কিন্তু যখন একবার প্রেমের মৃত্যু হয়ে যায় তারপর প্রেম করা কত সহজ হয়ে যায়। হয় না! বদমাশ! বলছিস্ না কেন? উত্তর দে। আমার প্রেমিকার ঠোঁট ছিল স্থূল, বুদ্ধিও ছিল স্থূল, সে তো মেয়েমানুষ ছিল না, ছিল এক দোহারা-তেহারা গালিচা। আজ সে তার কেশরাশির দুই বেণী বেঁধে চামেলির ফুল দিয়ে সাজিয়েছে।

সে গালিচার উপর বসে গেল।

আমি তার মুখ চুম্বন করে বললাম, 'আজ তো তোমাকে ক্লিওপেট্রার মতো দেখাচ্ছে।'

সে প্রশ্ন করল, 'ক্লিওপেট্রা কী?'

'মিশরের সাম্রাজ্ঞী।'

'মিশর?'

'হ্যাঁ, মিশর। এই দেশে মৃত্যুর পর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয় আর মৃতের মমি তৈরী হয়।··· ভগবান করুন তোমার মৃত্যু ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর মতো হয়।'

'হায়, কী কথা বলছ? ওর কী হয়েছিল?'

'সাপের কামড়ে তার মৃত্যু হয়েছিল।'

সে মৃদু আর্তনাদ করে আমার কাছে চলে এসেছিল, 'তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ।' সে আমার বাহু ধরে এ কথা বলেছিল। ঐ হংসী, ঐ স্থূলতনু কুৎসিত হংসী, মোষের মতো জাবর কাটছিল···তার ঠোঁট আমার সামনে বাড়িয়ে দিয়েছিল, যেমন ভাবে কোন উদার জাঠ কোন অপরিচিত যাত্রীকে আখ বাড়িয়ে দেয় চুষে খাবার জন্য।

আমি আখের টিকলি চুষতে চুষতে বললাম, 'এই গালিচা একবার জিতেছে, আর মরেছে বার বার···আহ্···এই মৃত্যু বারবার কেন আসে···এবার আসুক অন্তিম মৃত্যু।'

সে গুন্ গুন্ করে বলল, 'আজ তুমি বারবার মৃত্যুর বর্ণনা কেন করছ?'

'কিছু না, তুমি বুঝবে না।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমাকে বলো তো আজ তোমার ঠোঁট থেকে, চোখ থেকে, কেশ থেকে এ কোন্ সুগন্ধ বেরুচ্ছে?'

'কিছু না,' সে হেসে বলল, 'আজ মাথায় সুগন্ধ তেল মেখেছি।'

আমি গালিচার দিকে আড়চোখে দেখলাম। তার রঙ বদলে যাচ্ছে। গালিচার মৃত্যু আমি দেখতে পারছিলাম না। আমি ঘাবড়ে গিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেলাম।

সোজা স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। ইচ্ছা ছিল প্রাণ ভরে বিয়ার পান করব। কেবল নিজের অন্ত্রাশয়কে নয়, নিজের আত্মাকেও এমন জোলাপ দেব যে শরীরমনের সারা জঞ্জাল আবর্জনা প্রবাহিত হয়ে যাবে, বেরিয়ে যাবে। শরীর হাল্কা হয়ে যাবে।

স্টেশনে বিয়ারের আগেই রূপবতীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

'আরে, তুমি কোথায়?'

'জুনাগড় পাহাড়ে গিয়েছিলাম।'

'আর কবি?'

সে কেশে বলল, 'আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি

'ছেড়ে দিয়েছ, কেন?'

'আমার ক্ষয়রোগ আছে, জুনাগড় গিয়েছিলাম না?'

তার দৃষ্টিতে ছিল সবুজ রঙের সমুদ্র। এক বিবর্ণ শুকনো চেহারা— ভ্রমরে ডুবে ডুবে খেয়ে ফেলছে। এখন সে চেহারাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন কবির জরাজীর্ণ চেহারা ঢেউয়ে ভাসছে। কবির চেহারা মাথা হেলিয়ে বলছে, 'হুঁ'।'

আমি বললাম, 'ও হারামজাদা কোথায়?'

নম্রকণ্ঠে সে বলল, 'যেতে দাও। ওকে গালি দিয়ো না···এখনো ওর প্রতি আমার প্রেম আছে।'

'কিন্তু....'

'হ্যাঁ', সে বলল. 'এই কিন্তুর পরেও আছে···এখন আমি নিজের ঘরে যাচ্ছি—বাপের বাড়িতে—নিশ্চিন্তে মরব।'

'না, না।' আমি আর্তনাদ করে বললাম, 'এখন তোমাকে যেতে দেব না। তুমি আমার কাছ থেকে জীবনকে ছিনিয়ে নিয়েছ। এখন মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত দুজনে এক সঙ্গে চলব আর যদি এই জীবনের পরে আর-কোন জীবন থাকে তবে বোধ হয়…'

সে হাসল। সেই উজ্জ্বল হাসি। সেই চন্দনলেপিত চেহারা। সেই চমক-দেওয়া কুঙ্কুম।

আমি তার বাহু ধরে বললাম, 'রূপ, ঘরে চলো। জীবনে তুমি তোমাকে-আমাকে এক সঙ্গে থাকতে দাও নি, এখন মৃত্যুর আগে কয়েকটি মুহূর্ত দাও।'

সে মুচকি হাসল। বলল, 'তুমি জানো না, প্রেম জীবনে আর মৃত্যুতে একই আচরণ করে।'

রেলগাড়ির বাঁশি বাজল।

সে বলল, 'আমার আশা ছিল না যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। খেদ রইল যে আমি এখানে থেকে যেতে পারলাম না। হ্যাঁ, তোমাকে এই বইটি দিতে পারি, আর্লের কবিতাগুচ্ছ।'

গার্ড পতাকা দেখাল।

সে তার কামরার দিকে চলল। আমি তার চেহারার দিকে তাকাতে পারলাম না। আমার চোখ ফের তার পা দুটিতে নিবদ্ধ হল। দুটি পা চলছে, চলছে, দূরে যেতে যেতে মনে হয় নিকটে আসছে। একেবারে আমার বুকের 'পরে এসে গেল আর আমি তাদের তুলে নিয়ে আমার বুকের ভিতরে লুকিয়ে ফেললাম।

আমি চোখ তুলে তাকালাম।

গাড়ি চলে যাচ্ছে।

প্রেমিকা এখন পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করছে। বলল, 'কোথায় চলে গিয়েছিলে?'

আমি চুপ করে রইলাম।

'এ কী বই?'

'আর্লের বই।'

'কী ?'

'এক কবির কবিতাগুচ্ছ।'

'আমাকে শোনাও, এ বই কী বলছে ?'

আমি বইটি খুললাম। পনেরো নম্বর পাতার প্রতি নজর পড়ল। আমি ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করলাম, 'হে ভগবান! তোমার নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবন দিয়েছ, এখন আমার ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যু দাও। তোমার কাছে আমি কিছুই চাই না, ভগবান।"

'আবার মৃত্যু ?' সে বলল, 'অমঙ্গল।' সে আমার হাত থেকে বইটি ছিনিয়ে নিয়ে সরিয়ে রাখল আর নিজের ঠোঁট আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। গালিচা টগবগ করে ফুটছে। একেবারে আগুন জ্বলছে। অগ্নিশিখার নদী, পুঁজের সমুদ্র, বিষের উৎসারিত প্রস্রবণ। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি, পাথর, তুমি মানুষের পুত্রকে যীশু বানিয়েছ। বলো, আমায় কী বানাবে ?'

গালিচা বলল, 'যা তুমি স্বয়ং হয়েছ— এক পিরামিড— এক ফোঁপরা পিরামিড, যার বুকের মধ্যে আছে মমিদের কফিন।'

আমি আমার প্রেমিকাকে বললাম, 'আমার মন চাইছে গালিচা জ্বালিয়ে ছাই করে দিই।'

সে বলল, 'হ্যাঁ, এ তো পুরনো হয়ে গেছে।'

'কিন্তু' আমি থেমে গিয়ে দুঃখিত কণ্ঠে বললাম, 'আমার কাছে তো এই একটাই গালিচা আছে আর এই একটাই জীবন আছে। না একে বদলাতে পারি, না একে…'

এ কথা বলে শিল্পী আখের টিকলি চুষতে লাগল।

চৌরাস্তার কুয়া

আমার বাচ্চাটির অসুখ। আমার অনুমান যে ও মরে যাচ্ছে। লোকে বলল, 'যদি তুমি একে চৌরাস্তার কুয়ার কাছে নিয়ে গিয়ে ঐ কুয়ার এক ঢোক জল ওর গলায় দিতে পার তা হলে তোমার বাচ্চা বেঁচে যাবে।'

আমি শুধিয়েছিলাম, 'চৌরাস্তার কুয়া কোথায়?'

তারা বলল, 'তা কোথাও-নেই গ্রামে।'

'কোথাও-নেই গ্রাম কোথায়?' আমি প্রশ্ন করলাম।

আমাদের গ্রামের সবচেয়ে বুড়ো বৈদ্য বলল, 'তুমি এখান থেকে ওখানে যাও, ওখান থেকে যেখানে যাও, যেখান থেকে সেখানে যাও, আর যখন তুমি সেখানে গিয়ে কোনোদিকে মোর ঘুরে যাও, একেবারে তোমার সামনেই পড়বে কোথাও-নেই গ্রাম। তার মাঝখানে চৌরাস্তার কুয়া।'

আমি বৈদ্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের গ্রাম থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

আমি এখান থেকে ওখানে গেলাম, ওখান থেকে যেখানে গেলাম, যেখান থেকে সেখানে গেলাম, আর সেখানে পৌঁছে যেই কোনো দিকে মোড় ঘুরেছি দেখি আমার সামনে চারটি সড়ক।

একটি লাল সড়ক।

একটি নীল সড়ক।

একটি কালো সড়ক।

একটি শাদা সড়ক।

আর এই চার সড়ককে কেটে গোলাকার রূপে সেই কোথাও-নেই গ্রামের অবস্থান। আর এই গ্রামের মাঝখানে চৌরাস্তার কুয়া।

চৌরাস্তার কুয়ার ধারে অনেক লোক— স্ত্রী পুরুষ, বাচ্চা বুড়ো— অনেক লোক জমা হয়েছিল, এক মেলা বসে গিয়েছিল, আর এইসব

লোকের মধ্যে এক লম্বা-চওড়া দশাসই শাদা চুলওয়ালা বুড়ো এদিক-ওদিক ঘুরছিল। তাকে খুব সুন্দর আর শীলবান মনে হচ্ছিল। প্রতিটি লোক ওকে সমাদর করছিল। বুড়ো সমাদর স্বীকার করে খুব কবিয়ানার ঢঙে উপর-নীচে আপন হাত দুটি ঘোরাচ্ছিল— এমনি কবিতা যা কেবল কোনো ফলবন্ত শাখায় হতে পারে।

বুড়ো আমায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এই গ্রামে অপরিচিত ব্যক্তি ?'

আমি সসম্মানে মাথা ঝুঁকালাম।

বুড়ো প্রশ্ন করল, 'তুমি কোথা থেকে আসছ ?'

'আমি এখান-সেখান গ্রাম থেকে আসছি। আমার বাচ্চাটি পীড়িত। বৈদ্যজী বলেছেন যদি আমি বাচ্চাকে চৌরাস্তার কুয়ার এক ঢোঁক জল খাওয়াতে পারি তা হলে সে বেঁচে যাবে।'

বুড়ো খুব নিরাশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'জলে কী হবে ?'

'বাবা, জলে খুব শক্তি আছে।'

'বেটা, আগে খুব শক্তি ছিল।'

'বাবা, আগুন আর জল দুই-ই খুব শক্তিদায়ী। আগুন আছে মানুষের হৃদয়-মধ্যে, আর জল আছে তার চোখে। যে কাজ আগুন সম্পূর্ণ করতে পারে না তাকে সম্পূর্ণ করে জল। বৈদ্যজী এ কথাই বলেছেন।'

বুড়ো আমার কথা শুনে মুচকে হাসল, আমার কাঁধের পরে হাত রেখে বলল, 'তোমাদের গাঁয়ের বৈদ্য খুব সমঝদার ব্যক্তি মনে হচ্ছে, কিন্তু আফসোস এই সময় এই কুয়ার এক বিন্দু জল তুমি পাবে না।'

'কেন ?'

'দেখছ না আমরা কুয়া সাফ করছি ?'

সহসা ঠিক ঐ সময় এক ডুবুরি কুয়ার বাইরে এসে কুয়ার বাইরে জাল উলটে দিল। জাল থেকে প্রচুর কাদা জমিতে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক লোক একেবারে দৌড়ে গেল আর দুহাত দিয়ে ঐ কাদার মধ্যে কিছু খুঁজতে লাগল, কিন্তু কাদার মধ্যে তারা কিছুই পেল না। ডুবুরি খালি জাল হাতে নিয়ে ফের কুয়ার মধ্যে ঝাঁপ দিল।

আমি বুড়োকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই ডুবুরি কী খুঁজছে ?'

বুড়ো উত্তর দিল, 'কিছু খুঁজছে না। এই কুয়ার দুর্গন্ধ কাদা বাইরে বের করে ফেলে দিচ্ছে। যখন সব কাদা বাইরে বার করা হয়ে যাবে তখন কুয়া সাফ হয়ে যাবে, তখন তুমি এই জল তোমার বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবে।'

আমি বাচ্চার জন্য কুয়ার কিনারায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ডুবুরি জাল নিয়ে বাইরে এল, সে জমির উপর কাদা বিছিয়ে দিল। কাদা থেকে বেরুল একটি চিরুনি।

ডুবুরি প্রশ্ন করল, 'এই চিরুনি কার ?'

এক নববিবাহিত যুবতী লজ্জিত হয়ে ডুবুরির হাত থেকে চিরুনি নিয়ে আপন পতির কাঁধের উপর হেলে দাঁড়াল। ঐ মেয়েটির কেশরাশি ছিল সোনালি আর দীর্ঘ, গায়ের রঙ ছিল গমের মতো, চোখ দুটি বড় বড় আর কটা। কখনো কখনো ঐ চোখ দুটি অশ্রুতে ভরে যেত, তখন মনে হত সকালের আকাশের অরুণিমা চমকে উঠছে।

'মনে পড়ে ?' মেয়েটি তার পতিকে আস্তে আস্তে বলল, আর তার আঙুলগুলি চিরুনির উপর ঘুরতে লাগল, যেন চিরুনির প্রতিটি দাঁত সময়ের এক-একটি মধুর মুহূর্ত, যা কখনো ফিরে আসবে না।

'মনে আছে।' তার যুবক-পতি ধীরে বলল আর স্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে গেল। এই কুয়ার ধারে সে তার লাজুক পত্নীকে প্রথম দেখছিল। তখন মেয়েটি স্নানের পূর্বে আপন সোনালি চুল আঁচড়াচ্ছিল। আর যুবকটি তখন তৃষ্ণার্ত হয়ে কুয়ার ধারে নিজের ঘোড়া থামিয়ে মেয়েটির কাছে জল চেয়েছিল।

জল।

জলে বড় শক্তি আছে।

জলে বড় প্রেম আছে।

যুবক-পতি আপন নববিবাহিতা পত্নীর কাছ থেকে চিরুনিটি নিয়ে আপন ঠোঁটে লাগিয়েছিল, তারপর নিজের জামার পকেটে রেখে

দিয়েছিল। মেয়েটি তাকে জল খাওয়াবার পূর্বে চিরুনিটি কুয়ার পাড়ে রেখেছিল, তার সোনালী চুল চিরুনির উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। মেয়েটি যখন জল খাইয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল তখন নবযুবক তার হাত ধরে ফেলেছিল আর হাত-টানাটানিতে চিরুনিটি কুয়ার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।

'মনে পড়ে?'

কার মনে না পড়বে, হাতের সেই প্রথম স্পর্শ—যখন চিরুনিটি জলে পড়ে গেল, যখন নজর হৃদয়ে পড়ে গেল, যখন কেশরাশির প্রতিটি কিরণ সূর্য হয়ে গিয়েছিল। কার মনে না পড়বে?

ডুবুরি ফের বাইরে এল, বাইরে এসে সে ফের তার জাল উলটে দিল, এবার তার মধ্যে থেকে একটি লম্বা ছুরি বেরিয়ে পড়ল।

উজ্জ্বল চুলওয়ালা বুড়ো ছুরি হাতে নিয়ে প্রশ্ন করল, 'এই ছুরি কার?'

কিছুক্ষণের জন্য ভীড়ের থেকে কেউ কিছু বলল না। সবাই ঐ ছুরিটা চেনে। ঐ ছুরির বাট হাতির দাঁতের আর খুব সুন্দর। এই ছুরিটি যে নবযুবকের ছিল সে ঐ ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল আর সবাই তার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। কারণ সকলেরই জানা ছিল ঐ ছুরি দিয়ে সে খতম করে দিয়েছিল অত্যাচারী থানাদারকে, যে গাঁয়ের বৌ-ঝিদের ইজ্জৎ হানি করত। কিন্তু নবযুবকের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি আর পুলিশের মোকদ্দমা খারিজ হয়ে গিয়েছিল। আর যে গাঁয়ের ইজ্জৎ নিয়েছিল তার নাম আর চিহ্ন দুনিয়া থেকে মুছে গিয়েছিল। জলের তরঙ্গ এই ছুরিকে লোকের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রেখেছিল যেমন করে মা তার অপরাধী ছেলেকে লুকিয়ে রাখে।

জলে বড় শক্তি আছে।

জলে আছে প্রতিশোধ।

ঐ নবযুবকের চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। সে হঠাৎ এগিয়ে এসে বুড়োর হাত থেকে ছুরিটি হাতে নিয়ে আপন কোমরবন্ধে গুঁজে

রাখল। গর্ব আর অহংকারের সঙ্গে তার মা তার হাত ধরে দাঁড়াল।

ডুবুরি ফের জাল বাইরে নিয়ে এল। এবার ছিল কালো রঙের কাদার মধ্যে অনেকগুলি হাতির দাঁতের চুড়ি।

গ্রামের সবচেয়ে কচি যুবতী বিধবা ধীরে ধীরে ফোঁপাচ্ছিল। কারণ বিয়ের দিনই তার স্বামী বিষ খেয়েছিল। এই জন্যে বিষ খেয়েছিল যে, অন্য কোনো গ্রামের মেয়ের সঙ্গে তার ভালোবাসা ছিল—সেই মেয়ে যে কোনোদিন তার হতে পারবে না! বিয়ের রাতে তারই সামনে নিজের পতির মৃতদেহ দেখে ঐ লাজুক বধূ চীৎকার করে বাইরে পালিয়েছিল আর হাতের সব চুড়ি খুলে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল।

বুড়ো চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল…

ঐ যুবতী বিধবা ধীরে ধীরে এগুল… আর ঝুঁকে পড়ে খুব সাবধানে এক এক করে চুড়িগুলি আপন আঁচলে সংগ্রহ করল, যেন ঐগুলি তার নিজের চুড়ি নয়, যেন সে তার অদেখা কামনাগুলিকে গুণে নিচ্ছে। সব চুড়ি তুলে নিয়ে সে আপন আঁচলে রেখে মাথা নিচু করে সেখান থেকে চলে গেল। সে চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত লোক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

বুড়ো বলল, 'এ হল আমাদের পিতৃপুরুষের কুয়া। এ আমাদের জীবন দেয়, মৃত্যুও দেয়। এই কুয়া থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না।'

হঠাৎ ডুবুরি ফের বাইরে উঠে এল। এখন তার চেহারা নীল হয়ে গেছে আর বুক জোরে জোরে উঠছে-নামছে। বোঝা গেল সে অনেক নীচে গভীরে অথৈ জল থেকে কিছু খুঁজে নিয়ে এসেছে…

ডুবুরি খুব সাবধানতার সঙ্গে জাল খুলল। এবার জালে কাদা কম ছিল, বালি বেশি ছিল। এই বালির মধ্যে একটি ছোট্ট বাচ্চার শব ছিল।

হঠাৎ সবলোক দু'কদম পিছু হটে গিয়ে মনোযোগের সঙ্গে ঐ বাচ্চার লাশ দেখছিল। তাদের সকলের দৃষ্টিতে ছিল বিস্ময়। উজ্জ্বলকান্তি বুড়ো ঐ মৃত বাচ্চাকে নিজের দুহাতে তুলে নিয়ে বলল,

'এই বাচ্চা কার?'

কেউ কথা বলে নি।

কেউ এগিয়ে আসে নি।

পুরুষদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, বিবাহিতারা ঘোমটা দিয়েছিল, যুবতী কুমারীদের নজর ছিল নীচের দিকে।

'এই বাচ্চা কার?' উজ্জ্বলকান্তি বৃদ্ধ কিছুটা কঠোর সুরে ফের প্রশ্ন করল।

সব চুপচাপ। শব্দহীন কুয়ার চারধার-ঘেরা বেড়া দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কোনো উত্তর দিল না। কেউ বলল না ঐ বাচ্চা তার। বুড়ো মৃত বাচ্চাটিকে ডুবুরির হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে খুব আফসোসের সঙ্গে বলল, 'ডুবুরি, এই বাচ্চাকে কুয়ার জলে ফেরত দিয়ে দাও।'

তারপর আমার দিকে খেদ আর দুঃখভরা দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বলল, 'অতিথি, আমার খুব খেদ হল যে এখন এই কুয়া সাফ করা গেল না। তুমি তোমার বাচ্চাকে এর জল খাইয়ে জীবন ফিরে দিতে পারবে না…'

ডুবুরি মৃত শিশুটিকে কুয়ায় ফেলে দিল।

সহসা আমার কোল থেকে আমার বাচ্চা লাফিয়ে উঠে কুয়ার দিকে দৌড়াল, বলল, 'থামো, থামো, আমি এই বাচ্চার সঙ্গে খেলব।'

আর আমি সামনে দৌড়ে যাবার পূর্বেই আমার বাচ্চা কুয়ার জলে ঝাঁপ দিল।

'আমার খোকা! আমার খোকা!' চীৎকার করে আমি সামনে দৌড়লাম, কিন্তু গ্রামের লোক আমাকে থামিয়ে দিল।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'দেখতে পাচ্ছ না? আমার বাচ্চা এই কুয়ার মধ্যে চলে গেছে।'

উজ্জ্বলকান্তি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলল, 'সে ঐ বাচ্চার সঙ্গে খেলা করছে।'

আমি কুয়ার ভিতর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'খোকা! খোকা! ফিরে আয়।'

কুয়ার ভিতর থেকে এক বিষভরা হাসির আওয়াজ ভেসে এল। কুয়ার মধ্যে জল নেই। আছে যেন বিষের ফেনা! সেই ফেনা যেন কুয়া থেকে উথলে পড়ে সারা সংসারকে ভাসিয়ে দেবে, ঘাট ঘাটে মাঠে ময়দানে ছড়িয়ে পড়বে।

লোকে আমাকে সেখান থেকে টেনে অন্যদিকে নিয়ে গেল। আমি মাটিতে দু হাঁটু গেড়ে বসে বুড়োর জামার প্রান্ত ধরলাম আর খুব কাতরতার সঙ্গে বললাম, 'বাবা। আমার খোকা। আমার খোকাকে ফিরিয়ে দাও। আমি নিজেই এসেছি তোমার কুয়ার পাশে! আমার বাচ্চাকে আমায় ফিরিয়ে দাও।'

'পেয়ে যাবে।' বুড়ো-বাবা শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে গেল। তার দু চোখে এক উজ্জ্বল কিরণ দেখা দিল। ধীরে-ধীরে কিন্তু খুব দৃঢ়তার সঙ্গে সে বলল, 'তোমার বাচ্চা তুমি ফিরে পাবে কিন্তু তখনই পাবে যখন কোনো কুমারী এই কুয়ার পাড়ে এসে কুয়ার ভিতর দিকে ঝুঁকে পড়ে ঐ দ্বিতীয় বাচ্চাটিকে ডাকবে আর তাকে আপন ছেলে বলে সম্বোধন করবে, সেই মুহূর্তে তুমি তোমার বাচ্চাকে ফিরে পাবে।'

আমি সেখান থেকে উঠলাম আর গ্রামের মেয়েদের কাছে গেলাম।

'আমার খোকাকে আমায় ফিরিয়ে দাও।'

বিবাহিতা মহিলারা নিজ নিজ ঘোমটা লম্বা করে টেনে দিল আর আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

'আমার খোকাকে আমায় ফিরিয়ে দাও।'

কুমারীরা মুখ ফিরিয়ে নিল, তাদের ঠোঁট ছিল বিবর্ণ আর আঁখিপল্লবে অশ্রু টলমল করছিল।

'আমার খোকা আমায় দিয়ে দাও।'

বুড়ীরা ঘৃণার সঙ্গে অট্টহাসি হাসল। তারা ঘৃণার সঙ্গে হাসতে পারে কারণ তাদের কোল খালি হয়ে গেছে।

আমি দু হাত দিয়ে আমার মুখ ঢাকলাম যাতে তারা আমার গালে গড়িয়ে-পড়া অশ্রু দেখতে না পায়।

অনেকক্ষণ পর যখন আমি আমার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিলাম তখন সেখানে কেউ ছিল না। আমি দেখলাম আমি একাই দাঁড়িয়ে আছি— ঐ গ্রামে যা কোথাও নেই, ঐ কুয়ার পাড়ে যা সব চৌরাস্তায় আছে, আর প্রতীক্ষা করছি সেই কুমারীর যে একদিন আমার বাচ্চার প্রাণরক্ষার জন্য ঐ কুয়ার ধারে আসবে।

নো আর ইয়েস

শেষ মহাযুদ্ধ 2165 খৃস্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল। তাতে সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কেবল তিন ব্যক্তি বেঁচে ছিল—

1. প্রফেসর মেহতাব।
2. চার বছরের একটি হাবশী ছেলে।
3. ছয় মাসের একটি ফরাসী মেয়ে— নাম মিস নো।

প্রফেসর মেহতাব তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড় প্রতিভা ছিলেন, এ কথা সর্বস্বীকৃত। তিনি ফোটন রকেট আবিষ্কার করেছিলেন। ঐ রকেট প্রায় আলোর মতো দ্রুতগতিতে চলে। অন্তরীক্ষে সর্বত্র-প্রাপ্তব্য ঈথারের কাঁচা উপাদান থেকে তিনি অক্সিজেন, হাইড্রোজেন আর নাইট্রোজেনের পরমাণু জন্মাতে পারতেন, আর তা থেকে খাদ্য উৎপাদন করতে পারতেন। তিনি মাধ্যাকর্ষণের শক্তির পরিমাণ অনুভব করেছিলেন এবং কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণও সৃষ্টি করতে পারতেন।

তিনি শ্বেত কিরণও আবিষ্কার করেছিলেন। ঐ শ্বেত কিরণ রৌদ্র কিরণের মতো প্রতি মুহূর্তেই সূর্য থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তা দিনে রাতে কখনই দেখা যায় না, তাকে ইন্দ্রধনুর রঙের মধ্যেও ভাগ করে দেওয়া যায় না। এক্সরে, রাডার, অণুবীক্ষণযন্ত্র, রেডিও বা ইলেক্ট্রনিক প্রক্রিয়াও ঐ শ্বেত কিরণকে ধরতে পারে না। প্রফেসর মেহতাব এক অ্যান্টি-মিটার যন্ত্রের সাহায্যে ঐ কিরণের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন ও তার বিশেষত্বের সঙ্গে দুনিয়ার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

প্রফেসর এ কথা প্রমাণ করে দিলেন যে মানুষের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি যে-ঘৃণা জন্মায় তার জন্য দায়ী এই অদৃশ্য শ্বেত কিরণ। তা ধীরে ধীরে সূর্যের অভ্যন্তরভাগ থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের শিরায় শিরায় মজুদ হতে থাকে।

কিন্তু প্রফেসর মেহতাব এই শ্বেত কিরণের ক্ষতিকারক প্রভাবের

শক্তি আবিষ্কার করবার পূর্বেই 2165 খৃস্টাব্দে শেষ লড়াইয়ে এই দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেল, উপরি উল্লিখিত তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ বেঁচে রইল না—প্রফেসর মেহতাব, মিস নো আর হাবশী ছেলেটি যার নাম ইয়েস।

প্রফেসর মেহতাব এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। মাটি থেকে উড়ে সৌরমণ্ডল পেরিয়ে আকাশ-গঙ্গার অন্যদিকে ড্রোমেদা গ্রহে চলে গিয়েছিলেন। ড্রোমেদা গ্রহকে উত্তাপ দেয় দুই সূর্য, কিন্তু এই উত্তাপ চিত্তসুখকর, কেননা তারা ছিল মধ্যবয়সী সূর্য, তা ছাড়া এ দুই সূর্য থেকে দুই ভিন্ন প্রকারের কিরণ বেরোত।

এক সূর্য থেকে পৃথিবীর সূর্যের মতো অদৃশ্য শ্বেত কিরণ বেরোত আর অপর সূর্য তাকে নিঃশেষ করে দিত। এই কারণে এই গ্রহের জলবায়ু ছিল সমশীতোষ্ণ। এখানে হৃদয়ে খুব একটা ক্রোধ জন্মাত না, মানুষে মানুষে জীবনের দুশমন হয়ে যায় এমন ঘৃণাও জন্মাত না। গরম ছিল অল্প-অল্প, শীতও অল্প-অল্প, আর মাধ্যাকর্ষণ এত কম ছিল যে ঐ দুই বাচ্চা এই গ্রহে পৌঁছে যখন তার মাটির উপরে লাফাতে থাকে তখন মাটি থেকে হাজার গজ উপরে উঠে যায়।

এ কথা বুঝুন যে এই গ্রহ যদি আমাদের পৃথিবী হ'ত তবে বাচ্চারা পৃথিবীর মাটি থেকে লাফিয়ে মাউন্ট এভারেস্টকে ছুঁতে পারত। রৌদ্রকিরণ অল্প পরিমাণে ধীরে ধীরে ছন্-ছন্ করে আসে। মিস নো ঐ কিরণে পশম দিয়ে সুন্দর সোয়েটার বুনে নেয় আর মাস্টার ইয়েস যখন কোনো কথায় ঠা-ঠা করে হাসতে থাকে তো সে শব্দ হাওয়ায় আইসক্রীম হয়ে গিয়ে উড়তে থাকে।

সারাদিন এই গ্রহে দুই বাচ্চা হেসে হেসে নিজেদের অট্টহাসির আইসক্রীম খেতে থাকে। এখানে পাহাড় মাউন্ট এভারেস্টের চেয়েও উঁচু। কিন্তু তা ছিল হাল্কা স্পঞ্জ-উপাদানে তৈরি, আর এতই হালকা যে বুড়ো আঙুল দিয়ে ঠেলা দিলে পুরো পাহাড় মাটিতে চুপসে পড়ে যেত আবার আস্তে-আস্তে অন্য কোনো দিক দিয়ে ফুলে

উঠত। মাস্টার ইয়েস আর মিস নো-র পক্ষে এ ছিল বড়ই চিত্তগ্রাহী খেলা। দুজনে প্রত্যহ ঐ গ্রহের পাহাড়ে খেলা করত আর তাদের অনুসারে জলবায়ুতে পরিবর্তন হতে থাকত।

প্রফেসর মেহতাব অনেক ভেবে-চিন্তে এই গ্রহ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর জানা ছিল যে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের হাড়ের মধ্যে এই যে ঘৃণা ঢুকে আছে, একদিন তার ফল দেখা দেবে আর মানুষের দুর্ভাগ্য জন্মধারাকে খতম করে দেবে। হাতে সময় থাকায় এই শ্বেত কিরণের কোনো উচিত প্রতিষেধক তিনি জানতে পারেন নি, সে কারণে তিনি ধীরে ধীরে নিজের বৃহৎ ফোটন-রকেটের সাহায্যে কয়েকবার ঐ সৌরমণ্ডলের বাইরেও উড়ে বেড়িয়েছিলেন আর এমন গ্রহের খোঁজে বেরিয়েছিলেন, যেখানে গিয়ে মানুষের জন্মধারা ঘৃণাজনিত ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়ে বেঁচে যেতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এই গ্রহটি পেয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী দশ বছর ধরে মানুষের জ্ঞান ও কলা-সম্পর্কিত সারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহুমূল্য অভিজ্ঞান আর অন্যান্য আবশ্যকীয় আসবাবপত্র গোপনে এই পৃথিবী থেকে ঐ গ্রহে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন ; নিজের বিজ্ঞানী-অনুভবের সাহায্যে এই বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল। ড্রোমেদা গ্রহ থেকে আমাদের এই পৃথিবীতে তিনি নেমে এসেছিলেন এই সুসংবাদ দিতে যে তিনি এমন এক গ্রহ আবিষ্কার করেছেন যেখানে বসবাস করলে কেবল মানুষ নয় তার সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতি সুরক্ষিত হবে।

কিন্তু আফসোস এই যে যখন ড্রোমেদা গ্রহ থেকে প্রফেসর আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছলেন তখন শেষ মহাযুদ্ধের অন্তিম পর্ব চলছে। মনুষ্যজাতি খতম হয়ে গেল, তার সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেল। প্রফেসরের সুসংবাদ কাজে পরিণত করতে কেউ বেঁচে রইল না। প্রফেসর মেহতাব খুব কষ্ট করে পৃথিবীতে দুটি আলাদা টুক্‌রিতে এই দুটি বাচ্চাকে কোনোমতে জীবিত অবস্থায় পেলেন। এ দুজনকে নিয়ে নিজের ফোটন-রকেটে চড়ে তিনি নতুন গ্রহের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

ড্রোমেদা গ্রহে পৌঁছে তিনি ঐ দুই বাচ্চার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদীক্ষায় দিনরাত লেগে রইলেন, কেননা ঐ দুই বাচ্চা মনুষ্য-জাতির অগ্রগতির চালক— দুজনের মধ্যে যদি একজন মরে যায়, অথবা যদি কোনো একজনের শিক্ষাদীক্ষায় ত্রুটি হয়ে যায়, তবে যে-সব সমস্যা একবিংশ শতাব্দীর মানুষকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দিয়েছে সে-সব সমস্যাই আবার দেখা দেবে।

এই কারণে প্রফেসর মেহতাব এই দুই বাচ্চার শিক্ষা-দীক্ষা, লালন-পালন, দেখাশোনায় কিছু বাকি রাখলেন না। নিজের মৃত্যুর পূর্বে মানবজাতির এই দুই প্রতিনিধিকে তিনি মানব-জ্ঞান, সভ্যতা আর সংস্কৃতির পূরা সম্পদ দিতে চেয়েছিলেন— যে সম্পদ আজ পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র— জীবনের কোনো বিষয়ই যেন বাদ না পড়ে যায়। স্বর-ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে শুরু করে শেক্সপীয়ার, কালিদাস, দান্তে, তুলসীদাস, গালিব পর্যন্ত—বিজ্ঞানে আপেল-পড়া থেকে শুরু করে তারকামণ্ডলের গতি পর্যন্ত, অর্থাৎ নিউটন থেকে আইনস্টাইন আর প্রফেসার মেহতাব পর্যন্ত, জ্ঞানের কত মহান বহুমূল্য সম্পদ— কয়েক বছরের মধ্যেই এই দুই কচি মাথায় সব-কিছু দিয়ে দেবার ছিল।

তাঁর হাতে সময় ছিল কম আর তিনি দিনে দিনে বুড়ো হয়ে যাচ্ছিলেন। ছমাসের ফরাসী বাচ্চা মেয়ে এখন ষোলো বছরের দুষ্টুমিভরা চঞ্চল সুন্দরীতে পরিণত হয়েছে। সেই কোঁকড়ানো চুল, কটাক্ষভরা আঁখি আর লাজুক মুচকি-হাসিভরা হাবশী ছেলেটি আজ ছ'ফুট উঁচু, চওড়া ছাতি নবযুবকে পরিণত হয়েছে। আজ সে একুশ বছরে পা দিয়েছে।

দুজনের শিক্ষা-দীক্ষা একসঙ্গে হচ্ছিল, দুজনের উপর প্রফেসরের নজর ছিল সমান সমান, কম নয়, বেশিও নয়। তিনি দুজনকে একই রকম স্নেহ করতেন। ইলেকট্রনিক যন্ত্র দ্বারা তিনি রোজ দুজনকে সমান মানব-জ্ঞানের কোষ প্রদান করতেন। দুজনেই ছিল হুঁশিয়ার

আর বুদ্ধিমান। গত পনেরো বছরের শিক্ষায় দুজনের মস্তিষ্কের অগ্রগতি সেই স্তর পর্যন্ত হয়েছিল যে স্তরে মানব-বুদ্ধি পঞ্চদশ শতাব্দীতে পৌঁচেছিল।

প্রফেসর খুব খুশি হয়েছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই এই দুজনে বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানকে অতিক্রম করে যাবে, আর তাদের অসম্পূর্ণ শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে ; যে কোষ হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ আপন অনুসন্ধান দ্বারা একত্র করেছে, তা বেকার হয়ে যাবে না ; মানুষের বিকাশ রুদ্ধ হবে না, মানুষ তার নতুন বাসস্থানে অগ্রগতির পথে চলবে।

কিন্তু মনুষ্যপ্রবাহ চলবে কিসের থেকে ? ···আসবে কোথা থেকে ?

এখন তো এই গ্রহে তিনটি মানুষ আছে— জ্ঞান আর বিদ্যার ডোরে একে অপরের সঙ্গে বাঁধা আছে, তাদের মধ্যে সেই মিলমিশ কোথায়, সেই ভালোবাসা কোথায়, যা এক ঘর-সংসারে হয়। সে ঘর তো প্রফেসর নীচের পৃথিবীতে হারিয়ে এসেছেন— সেই ঘরের সুখ এ দুই নবযৌবনের কাছে অজ্ঞাত ছিল।

আজব কথা এই, মিস্ নো আর মাস্টার ইয়েস, দুজনের লালন-পালন একসঙ্গে হয়েছিল, দুজনে একসঙ্গে পালিত হয়েছিল, দুজনে একসঙ্গে একে অপরের সঙ্গে থাকতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ এই দুজন ছাড়া তাদের আর কেউ সঙ্গী ছিল না ; প্রফেসর ছিলেন, কিন্তু তাঁর ভূমিকা ছিল পিতার, গুরুর, দয়ালু বয়োবৃদ্ধের। উচিত ছিল যে এই দুজনে একে অপরের সঙ্গে প্রেম করে মানবজাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রফেসর তাদের দুজনকে কয়েকবারই বুঝিয়েছিলেন আর তারা এত বাচ্চা ছিল না যে এ কথা বোঝে নি। তারা এ কথা খুবই জানত যে যদি তারা শীঘ্র একে অপরকে বিবাহ না করে তবে এর পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে। এই গ্রহমণ্ডলে সুবোধ শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তাশীল জীবন চিরকালের মতো শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কেন কে জানে তারা দুজনে একে অপরকে চাইত না, একে অপরকে ভালোবাসত না, একে অপরের সঙ্গে থাকত, একে অপরকে পছন্দও করত, কিন্তু

একে অপরকে প্রেম করত না।

মাস্টার ইয়েসের আপত্তি ছিল, নো কেন খুব গৌরবর্ণা। সে বলত, 'এত গৌরী মেয়ে আমার চাই না।'

ইয়েসের কালো রঙ সম্পর্কে নো-র আপত্তি ছিল না, কিন্তু তার কোঁকড়ানো চুল নো-র খুবই অপছন্দ ছিল, 'সোজা চুলওয়ালা ছেলে আমার চাই।'

'কৃষ্ণনয়না যুবতী আমার চাই। কোনোরকম শ্যামলী মেয়ে হলেও চলবে, যে তর্ক করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেরে যাবে।'

'বাঃ। আমি কেন হেরে যাব? হুঁ, হুঁ।' নো চট্ করে রেগে গিয়ে বলে, 'তোমার কাছে হেরে যাব?'

'নো কারণে-অকারণে কবিতা পোড়ো না।'

ইয়েসের বেশি ভালো লাগত বিজ্ঞান, গণিত, অ্যালজেবরা। নো-র পছন্দ ছিল কবিতা, সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র আর গল্পসল্প। সে নানা ভাষা জানত আর রকেট চালাতেও পারত।

'কী ভাবছ? আমি তোমার মতো পণ্ডিত, নীরস. ডাহা আহাম্মুককে বিয়ে করব?'

'ইয়েস।' ইয়েস বলল।

'নো।', নো বলল, 'আমি এমন ছেলে চাই যে জল-বুদ্‌বুদের মতো নরম, সূর্যের মতো সোনালী, আর রকেটের মতো দ্রুতগতি, এই বোকাটার মতো নয় যে সব সময় উল্টা-সিধা ফরমুলা ভাবছে।'

'কিন্তু এমন ছেলে আসবে কোথা থেকে?' প্রফেসর হয়রান হয়ে নো-কে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরাই তো রয়ে গেছ। আমি চাই তোমরা দুজনে শীঘ্র বিবাহ করে নাও; আর ধরে নাও আগামী বিশ বছরে তোমাদের ষোলোটা বাচ্চা হয়েছে···' প্রফেসর হিসাব কষতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'আমি ওকে ভালোবাসি না।' নো কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে, 'যখন ইয়েস নিজের হাত দিয়ে আমার হাত ছোঁয়, তখন সে হাত বিলকুল ঠাণ্ডা মনে হয়। আমার মনে হয় কোনো বরফের টুকরো আমার

হাত ছুঁয়েছে। আমি চাই আগুনের মতো দীপ্তিময় ছেলে।'

'আর এই মেয়ে দেখতে খারাপ।' মুখ বেজার করে ইয়েস বলে, 'এর নীল চোখ, ঘাড়ে অসংখ্য ছোট ছোট তিল আর লাল লাল ঠোঁট— যেন ছাল-ছাড়ানো রক্তাক্ত মাংস। ইশ্-শ্, আমি এই মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারি না, কক্ষনো করতে পারি না।'

প্রফেসর হতাশ হয়ে মাথার চুল টানতে লাগলেন। তাঁর সারা জীবনের পরিশ্রম ব্যর্থ হতে চলেছে। তিনি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জিনিয়াস। আর এখন তিনি সৃষ্টির শেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি সব-কিছু জানেন—সব জ্ঞান, সব বিজ্ঞান আর কলাবিদ্যা।

কিন্তু ভালোবাসার ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না।

যখন তিনি তাঁর জীবনের দিকে পিছন ফিরে তাকালেন তখন তাঁর ছেলেবেলার কথা মনে এল। তিনি বস্তির রাস্তায় পালিত হয়েছিলেন। এক ভিখারিণী তাঁকে পালন করেছিল। কে তাঁর মা ছিল, কে তাঁর বাবা ছিল, কিছুই তিনি জানেন না। তাদের প্রয়োজনও তিনি কোনোদিন বোঝেন নি। খুব ছেলেবেলাতেই তাঁর-আক্কেল বুদ্ধি হয়েছিল। সে দিনগুলি কী অন্ধকারময় ছিল। গলিপথের ধুলায় লিপ্ত হয়ে, দুর্গন্ধ ভিজে সিঁড়ির পিছনে শুয়ে থেকে, পাদরীদের দয়ায় তিনি পালিত হয়েছিলেন— সাহায্য-ভাণ্ডারের চাঁদায় তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন। সেই-সব বছরগুলি তাঁর কাছে কী উজ্জ্বল আর চমৎকার ছিল। হীরার মতো পলকাটা কঠিন খ্যাতি পরে তিনি পেলেন, সম্পদ পেলেন, শক্তি পেলেন। কিন্তু এ-সবের মধ্যে তিনি ভালোবাসা পান নি। যে কাজ তিনি করেছেন আর নীচের সংসারে যে কাজের দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন, তা এতই বৃহৎ ছিল যে তিনি কখনো ভালোবাসার আবশ্যকতা অনুভবই করেন নি। তিনি ঐ কোমল বাসনার সঙ্গে পরিচিত হন নি। ভালোবাসার অনুভূতি সম্পর্কে তিনি সব-কিছু পড়ে ফেলেছেন, এ দুই নবযুবক-যুবতীকে সে সম্পর্কে পাঠও দিয়েছেন। কিন্তু পড়া এক কথা, উপলব্ধি করা অন্য। তিনি কখনই ভালোবাসাকে বোঝেন নি।

তাকে তিনি দেশলাইয়ের কাঠির মতো ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ঐ আগুনে নিজের আঙুল পোড়ান নি। এই কারণে তিনি ভালোবাসার প্রসঙ্গ বুঝতে পারেন নি।

তিনি ঠিক করতে পারলেন না কী করবেন। তখন তিনি পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে এক চক্কর ঘুরে আসবেন বলে ঠিক করলেন। এই পৃথিবীতে তারা দুজনে (যুবক-যুবতী) কোথাও না কোথাও, মরুভূমিতে বা বিনষ্ট অরণ্যে একত্রে অথবা আলাদা-আলাদা মিলিত হতে পারে যেখানে এক উত্তম সভ্যতার আবাস ছিল, এবং তার ফলে একে অপরকে বিবাহ করতে রাজি হয়ে গিয়ে তার সঙ্গে এই গ্রহে (পৃথিবী) এসে মানবজাতির অগ্রগতির জন্য বংশবৃদ্ধি করে— বোধ হয় তাঁর এতটা আশা ছিল না। তবু একবার শেষ চেষ্টা করতে ক্ষতি কী ?

তিনি নিজের মনের এসব ভাবনা আর মতলব এই দুই নব যুবক-যুবতীকে জানান নি, তাদের কেবল বলেছিলেন পৃথিবীতে সভ্যতা ও নাগরিকতার শেষ চিহ্ন দেখবার জন্য নিজের ফোটন রকেট নিয়ে যাচ্ছেন। তারা যদি যেতে চায় তো তাঁর সঙ্গে যেতে পারে।

ইয়েস আর নো শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে নিয়েছিল। দুজনে আপন ঘরবাড়ি দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। যেখান থেকে তারা এসেছিল, যেখানকার ইতিহাস আর সভ্যতা সম্পর্কে প্রফেসারের কাছে শুনে রেখেছিল, সেই স্থান কেমন তা দেখতে চেয়েছিল। তারা অবশ্যই নিজেদের প্রাক্তন আবাস, পূর্বপুরুষদের পৃথিবী দেখতে যাবে কেবল এক ঐতিহাসিক আর ভৌগোলিক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে।

পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে ছিল এক বিবর্ণ কুয়াশা। যখন ফোটন-রকেট পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অবতরণ করে ধীরে ধীরে উড়ছিল তখন সকালবেলার এক দুর্গন্ধ বিবর্ণ লালিমা চারদিকে ছেয়ে ছিল। সূর্যের রঙ ছিল কবুতরের রক্তের মতো গাঢ় লাল। সব দিকে জনবসতির ধ্বংসস্তূপ। গাছগুলি জ্বলে গেছে, শস্যক্ষেত্রে ধুলো উড়ছে। আর হাওয়াতে বারুদের গন্ধ। কোথাও মানুষের জীবনের কোনো চিহ্ন

অবশিষ্ট ছিল না।

প্রফেসর মেহতাব তাঁর ফোটন-রকেটকে মাটির কাছাকাছি কয়েকবার ঘোরালেন, ইলেকট্রনিক আর রাডার-দূরবীণ দিয়ে মাটির কোণে কোণে পর্যবেক্ষণ করলেন—কোথাও জীবনের লক্ষণ নেই, চড়া উত্তপ্ত হাওয়া ক্ষিপ্ত নেকড়ের মতো রুক্ষ-শুষ্ক মহাদ্বীপের উপর বহে চলেছে, নদীতে জল আছে, কিন্তু জল পানের জন্য কেউ নেই, বিশাল উজ্জ্বল গিরিশিখর তুষারাবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তা দেখবার কেউ নেই, কোথাও কোথাও পাহাড়ী পথে ঘাসপাতা জন্মেছে, কিন্তু তার উপর দিয়ে হেঁটে যাবার কেউ নেই।

কিছুক্ষণ পর পর রকেটের অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক সিস্টেমে প্রফেসর ঘোষণা করেছিলেন— 'কোথাও যদি কোনো মানুষ থাকো তো সাড়া দাও—কোথাও যদি কোনো মানুষ থাকো তো সাড়া দাও।' রকেটের ইলেকট্রনিক অ্যান্‌টেনা মাকড়সার জালের মতো টানা-বুনন শব্দধারক যন্ত্র ছড়িয়ে দিয়ে কোনো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর মানবকণ্ঠের আওয়াজ শোনবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল।

কোনো ক্ষীণ অন্তিম আওয়াজ, কোনো বাচ্চার উল্টা-পাল্টা কথা, মানবকণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দের কোনো ক্ষুদ্র তরঙ্গ— কিছুই ছিল না। আর যদি তা থাকত তবে অ্যান্‌টেনা সঙ্গে সঙ্গে তা ধরে ফেলত, কিন্তু জবাবে কোনো আওয়াজ এল না।

রকেট এক নিঃশব্দ বায়ুমণ্ডলে ঘুরছিল। হায়, হরদম আলাপরত, বৃথা তর্করত, কখনো চুপ-না-করে-থাকা মানুষ কী নির্বাক হয়ে গিয়েছিল! যে মানুষ ভাষণ দিত, যে মানুষ গান গাইত, যে মানুষ ধর্মবিশ্বাসের নামে যুদ্ধের ডাক দিত, যে মানুষ অধিকার আর ত্যাগের সাক্ষ্যে প্রাণোৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল— তারা সবাই মারা গেছে। আর তাদের সঙ্গেই মরে গেছে তাদের সাধুতা, তাদের ধর্মবিশ্বাস আর ধর্ম, অধিকার আর ন্যায়ের ধারণা আর মতবাদ— সব ধ্বংস হয়ে গেছে।

নদীতে কেঁদে যাচ্ছে জলপ্রবাহ, গাছের বন্ধ্যা প্রশাখা মাথা ঝুঁকিয়ে

রয়েছে। আলোকের লালিমা সাজসজ্জা করে দিগন্তরেখায় পৃথিবীতে নেমে এসেছে, কিন্তু তার প্রার্থী কোনো মানুষকে না পেয়ে নিরাশ হয়ে সূর্যের কোলে ফিরে গেছে।

খুব ধীরে ধীরে ফোটন-রকেট পৃথিবীর কাছে, মাটির খুব কাছাকাছি উড়ছিল। প্রফেসর হঠাৎ খুব উন্মনা হয়ে গেলেন। তিনি ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন—যেন কোনো করুণ কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদ শোনাচ্ছেন :

'এখানে ছিল নিউইয়র্কের গগনচুম্বী প্রাসাদসমূহ ; এখানে ছিল প্যারিস, কোমলানন সুন্দরীদের শহর ; এই ছিল মস্কো, চেখফ দস্তয়েভস্কি আর টলস্টয়ের প্রেমিকা ; এই ছিল পিকিং, নীল ফুলের মতো কোমল ঘরবাড়িওলা শহর ; এখানে ছিল টোকিও— মীশাও আর চেরী ফুলের শহর ; এই ছিল তেহ্‌রান, সুন্দর গোলাপের হিন্দোলা ; এই ছিল লাহোর, কবিতা আর সাহিত্যের দঙ্গলের কেন্দ্র ; এই ছিল দিল্লী, হিন্দুস্তানের রাজধানী, সাত সভ্যতার রাজধানী আর সাত সভ্যতার জন্মক্ষেত্র ; কিন্তু এখন সবই ধ্বংসস্তূপ— নিস্তব্ধ, জনবসতিশূন্য, শব্দহীন জঙ্গল, ভাঙাচোরা বাড়ি, কোথাও কোনো ইমারত অবশিষ্ট নেই, কোনো বাড়িই আস্ত আর ঠিকঠাক নেই, সব-কিছুই ধ্বংসস্তূপ।'

প্রফেসরের কণ্ঠস্বর থেমে গেল, স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি উন্মনা স্মৃতিতে হারিয়ে গেলেন। হঠাৎ প্রফেসর থমকে গিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে নীচের দিকে দেখতে লাগলেন।

'অ্যাঁ!' তিনি সবিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলেন।

তাঁর চীৎকার শুনে ইয়েস আর নো তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল আর তাদের নজরও নীচের দিকে ঘুরতে লাগল— প্রফেসরের নজরের সঙ্গে নীচের দিকে চলে গেল।

সত্যি সত্যি নীচে জমিতে এক ইমারত আপন আসল রূপে অটুট দাঁড়িয়ে আছে। তারা দুজনে চমকে গেল, নিজেদের চোখ রগড়ে ফের দেখল। সত্যি সত্যি এক ইমারত খাড়া রয়েছে। তা দৃষ্টির

ধোঁকা নয়। সারা পৃথিবীতে এই একই ইমারত খাড়া দাঁড়িয়ে আছে।

প্রফেসর তাঁর রকেটকে ধীরে ধীরে ঐ ইমারতের সামনে নামিয়ে আনলেন। তারপর তিনজনে রকেট থেকে বেরিয়ে ইমারতের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঐ নিঃসঙ্গ সগর্ব ইমারত সারা পৃথিবীতে মানুষের হাতের তৈরি শেষ ইমারত— আপন আসলরূপে যেমন-কে-তেমন দাঁড়িয়ে আছে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু যেখানে ইমারত খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে অন্ধকার ছিল না— এমনি অনুভব হচ্ছিল—যেন অন্ধকার এই ইমারতকে ছেয়ে ফেলতে ভয় পাচ্ছিল।

নদীতীরে এক সজল সুন্দর স্বপ্ন কোনো-এক সুন্দরীর মতো আড়ামোড়া ভাঙছিল ; আপন মর্মর বাহু তুলে প্রেমের দরবারে নমাজ পড়ছিল।

'তাজমহল।' নো চিনতে পেরে সজোরে চীৎকার করে উঠল আর দৌড়ে দরজা পেরিয়ে ভিতরে চলে গেল। প্রফেসর তাজমহল সম্পর্কে তাদের দুজনের কাছে অনেক কিছু বলেছিলেন আর তার ছবিও দেখিয়েছিলেন। এখন সেই তাজমহল তাদের সামনে।

সব-কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু তাজমহল বেঁচে গেছে— এ এক আশ্চর্য কথা। এখন বিস্ময় আর খুশির অনুভূতিতে ভরা হৃদয় নিয়ে তাঁরা তিনজনে তাজের সামনে দাঁড়ালেন। হঠাৎ এক মর্মর-মিনারের উপর চতুর্থীর চাঁদ এসে থেমে গেল। মনে হল যেন কোনো কোমল মদমত্তা সুন্দরীর আঙুলে রুপোর অঙ্গুরী পরিয়ে দেওয়া হল।

'আঃ!' নো-র হৃদয় থেকে এক চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরুল। সে ইয়েস-এর হাত ধরল আর ধীরে ধীরে তার হাতে হাত বুলিয়ে বলতে লাগল, 'তোমার হাত আগুনের মতো জ্বলছে।'

'ওঃ। তুমি কী সুন্দর।' ইয়েস নো-কে বলল, 'আমার জানা ছিল না যে তুমি এত সুন্দর।' সে আশ্চর্য হয়ে নো-র দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, যেন সে এই প্রথমবার তাকে দেখছে।

নো প্রফেসরকে বলল, 'আমি ইয়েসকে বিয়ে করব আর আমরা

এই তাজমহলের পায়ের কাছে থাকব, এখানেই আমাদের সন্তানের জন্ম হবে।'

'কী বলছ তুমি ?' প্রফেসর বিমূঢ় হয়ে বললেন, 'এ হল ঘৃণাভরা যুদ্ধের জমি, এর ধুলো রক্তে লিপ্ত হয়ে আছে। ভাইয়ের রক্ত-তৃষ্ণার্ত জুলুমকারী জমি, আবার কি ওই খুনোখুনির পুনরাবৃত্তি হবে ?'

'যে পর্যন্ত তাজমহল দাঁড়িয়ে থাকবে সে পর্যন্ত মানুষের আশা বেঁচে থাকবে।' নো এ কথা বলে গভীর প্রেমের সঙ্গে তাজমহলকে দেখতে লাগল।

'আমি তোমাদের জন্যে আমার ফোটন-রকেটের সাহায্যে এখান থেকে তাজমহলকে তুলে ড্রোমেদা গ্রহে নিয়ে যেতে পারি।'

'এর চেয়ে বেশি অন্যায় আর কী হতে পারে প্রফেসর ?' ইয়েস ঘাবড়ে গিয়ে বলল।

'তাজমহলকে দেখ। মনে হচ্ছে, মানুষের হাতে তা তৈরি হয় নি, এই মাটি থেকে তা উৎপন্ন হয়েছে। প্রফেসর, তাজমহল হল এই ধরিত্রীর স্বপ্ন! আর স্বপ্ন কেউ চুরি করতে পারে না।'

'কিন্তু এই সরজমিনে ঘৃণার কিরণ বর্ষিত হচ্ছে আর তা মানুষের হাড়ের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।' প্রফেসর চীৎকার করে বললেন।

ইয়েস প্রশ্ন করল, 'তবে এই তাজমহল কী করে তৈরি হয়েছে ?'

'ঘৃণার সরজমিন থেকে প্রেমের এই আশ্চর্য প্রতিমা কী করে উৎপন্ন হল ?' নো প্রফেসরকে প্রশ্ন করল আর শক্ত করে ইয়েস্-এর হাত ধরে বলল,'এ কথা বোলো না প্রফেসর, এ কথা বোলো না। সুদিন আসবে। কোনো-একদিন তো সুগন্ধ প্রবাহিত হবে। কোনো-একদিন তো প্রেম জেগে উঠবে। আর গ্রামে গ্রামে গলিতে গলিতে এই দুনিয়ায় সেই প্রেম রাজত্ব করবে।'

আবার এক দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে নো ইয়েস্-এর বুকের 'পরে তার মাথা রাখল আর চোখ বন্ধ করে খুব শান্তির সঙ্গে বলল, 'আমি আমার সন্তানকে দেখতে পাচ্ছি।'

তাজের প্রেমবার্তা সে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে লাগল।

রাজেন্দ্র সিং বেদী

মিথুন

বাজার হয়ে গিয়েছিল মন্দা অথবা কারবার ছোট। মনে হচ্ছিল যে পশ্চিম দিকে যেখানে সড়ক কিছুটা উপরে উঠে আকাশকে ছুঁয়েছে আর শেষ পর্যন্ত একেবারে নীচে নেমে গেছে, ওখানেই দুনিয়ার শেষ প্রান্ত, সেখান থেকে এক লাফ দিতে হবে, এই জীবনকে বাঁচাবার জন্যই প্রাণটা দিতে হবে।

সারাদিন মাথা চাপড়ানোর পর মগন টকলা (রকমারি চীজ বিক্রি-অলা) মাত্র দুটি জিনিস হাতে পেল। এক, ফ্লোরেনটিন আর দুই, জেমিনী রায়। ফ্লোরেনটিনের মূর্তি হয়তো কোনো মাথা-মোটা ফিল্ম প্রডিউসর ভাড়া করে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু জেমিনী রায়? কোনো আফসোস নেই, আজ সে ওটিকে লুকিয়ে রেখে দেবে তো কাল তার নাতি-পুতিরা তা থেকে কোটি টাকা উপায় করবে— যেমন পশ্চিমী দুনিয়ায় আজও কারুর কাছ থেকে লিওনার্ডের স্কেচ বেরুলে আর্টের বাজারে তার নীলাম-মূল্য লাখ টাকা পর্যন্ত পৌঁছয়। এই লাখ আর কোটি টাকার চিন্তায় মগনলালের দুচোখে বিজলী চমকাচ্ছিল। সে এ কথা ভুলে গিয়েছিল যে তার বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হয়ে গেছে, তাছাড়া তার মাথায় নেই একগাছি চুল আর তার বিয়ে হয় নি। সে-কারণে নাতি-পুতির কথাই ওঠে না। মগন করেই বা কী? সে এক সাধারণ হিন্দু। সে এই তত্ত্বের (ফিলজফির) চিন্তাকারী, তা ছাড়া তার মন থেকে বেনে-ভাব যায় নি। কথায় সে 'পয়সা— এতো মায়া' —একথা বলে তা দূরে ঠেলে দিত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পয়সার প্রতি তার ছিল প্রচণ্ড আসক্তি। দুনিয়ায় যদি কেউ পয়সার পূজা করে তো সে হিন্দু। আজ তার সামনে দেওয়ালির দিনে আলোকিত পূজাপাত্র থেকে দুধে-জলে স্নাত, সিন্দুর-চর্চিত টাকা পাওয়া যাবে। দশহরার দিনে তার গাড়ি গাঁদাফুলের মালায় ভরে যাবে আর সব স্ত্রী-পুরুষ মিলে লক্ষ্মী-মন্দিরে পূজা দিতে যাবে।

পয়সার জন্যে সে ইউসুফের মতো ভাই আর পদ্মিনীর মতো পত্নীকেও বিক্রি করে দিতে পারে।

আর তার সামনে ছিল সিরাজা— ইবজ ব্যাটারির এজেন্ট। তার দোকান ছিল অশ্বত্থ গাছের ঘেরের পিছনে। গরিব ল্যাংপেতে হিন্দু সকালবেলায় অশ্বত্থের গোড়ায় জল-মেশানো দুধ ঢালত। দোকান আর সড়কের মাঝখানটা কাদা-কাদা হয়ে থাকত। দেশবিভাগের পরে হিন্দুস্থানে থেকে-যাওয়া সিরাজাকে গরিব হিন্দুদের এই প্রথাকে খাতির করে চলতে হ'ত। হ্যাঁ, না করলে তো সে হয়ে যেত সেইসব বর্ণসংকর কুকুর, যেগুলি সারাদিন ঠ্যাঙ তুলে তুলে ঐ গাছের গায়ে পেচ্ছাব করতে থাকে। ঐ গাছ সম্পর্কেই ভগবান বলেছেন— 'আর গাছের মধ্যে আমি হলাম অশ্বত্থ।' ঐ কুকুর নিশ্চয়ই গতজন্মে ছিল মুসলমান— সাতচল্লিশ সনের দাঙ্গায় যে হিন্দুদের হাতে মারা গেছিল।

দেখা যেত সিরাজা হামেশা অশ্বত্থের ফল খাচ্ছে। তার কারণ মন্দা বাজার নয়, ক্ষুধাও নয়। সিরাজা সব সময় সেই জিনিস খেত যা তার বীর্যকে গাঢ় করে। হ্যাঁ, তার কাজই হল খাওয়া-দাওয়া আর ভোগ করা। মনের দিক থেকে সে ছিল ফালতু লড়ুয়ে যাযাবর— যারা হিন্দুস্থানে থেকে পাকিস্তানের কথা বলে। আবার পাকিস্তানে থাকে তো বলে—'হে মোর প্রভু, আমায় মদিনায় ডেকে নাও'। তার কোনো-কিছুতেই আসক্তি নেই। মগন টকলা এ নিয়ে কয়েকবার ভেবেওছে— ওর (সিরাজার) আল্লা দুনিয়ায় খুব আরাম করেন। আর তার (মগনের) আছে এক ভগবান যিনি নীচের দুনিয়ার বদলে উপরের ত্রিকূট পর্বতের আশপাশে দরবার লাগান। বোধ হয় সিরাজা না জেনে-শুনেই এক তান্ত্রিক হয়ে বসে আছে, যে বীর্যরক্ষার জন্য কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগায় আর ঊর্ধ্বগামী পথ তৈরি করে। সে গর্বের সঙ্গে নারীসমাজের মাঝে থাকে, কিন্তু কোনো-ভাবেই জীবনের পরম তত্ত্বকে (অমৃতরূপ বীর্যকে) স্খলিত হতে দেয় না। ইচ্ছামত উপায়ে মোক্ষপ্রাপ্তিকারী, নারীকে কেবল এক

মাধ্যমরূপে ব্যবহারকারী এই ব্যক্তি কখনো ভেবে দেখেছে কি এর ফলে ঐ বেচারী নারীদের হাল কী হতে পারে? তাদের অতৃপ্ত রুদ্ধমান অস্থির অবস্থায় রেখে কেউ কীভাবে মোক্ষে পৌঁছতে পারে? আর বীর্য পতিত না হওয়াতে যে মোক্ষ, তাতে পুরুষের বা নারীর কোন্ মুক্তি ঘটবে? স্বাতী নক্ষত্রের জল তো মোতি নয়। ঝিনুকও মোতি নয়। ঝরে-পড়া জল যখন ঝিনুকের মধ্যে মুখবন্ধ অবস্থায় থাকে, তখনি মোতির জন্ম হতে পারে।

রাত এল দ্রুতগতিতে। বাইরের দুনিয়া আঁধার। তার সঙ্গে গুঁড়ি মেরে এলো আরো-কিছু। রেশমওয়ালা বিলায়তীরাম, কাশ্মীরী বড়শাহ্, এখানকার উড়পীর চক্রপাণির দোকান পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। হতে পারে, মাসের দ্বিতীয় শনিবার হবার ফলে তার (চক্রপাণির) সব ইডলী দোসা, সাম্ভর, রওয়া কেসরী বিক্রি হয়ে গেছে। কেবল খোলা ছিল সিরাজার দোকান। কে জানে সে কোন্ মতলবে ছিল। বোধহয় এর জন্যে যে ব্যাটারির প্রয়োজন তা তো রাতেই হয়। কিন্তু ঝুটমুট সে সকালেই দোকান খুলে ফেলত— সকাল তো রাতেরই অংশ— তার শেষ অংশ, তা না হলে সকাল কোথায়-বা কার হয়। তা তো কমিউনিস্টদের জন্যই আছে। বোধহয় সিরাজা ট্যুরিস্ট এজেণ্ট মাইকেলের অপেক্ষায় ছিল; তারা দুজনে মিলে আগামী কোনোদিনে আগ্রা বা খাজুরাহোর ভ্রমণ-সূচী তৈরি করে নেবে, আর কিছু পয়সা উপায় করে নেবে। না, সিরাজা পয়সার পিছনে দৌড়ত না। সে দৌড়ত পশ্চিমী মেয়েদের পিছনে। অনেক বিয়ে আর তালাকের কারণে তারা ছিল অতৃপ্ত, আর এখানে এসে মমতাজের প্রেম নিয়ে এখানে-ওখানে কোনো শাহজাহান-চেহারাওয়ালা মরদের উপর ভাগ্য পরীক্ষা করত আর খাজুরাহোর মিথুনমূর্তিকে জীবন্ত করে তুলত।

তখনি সিরাজার আওয়াজ মগনলালকে চমকে দিল—'হ্যালো সুইটি পাই।'

সিরাজা প্রায় অশিক্ষিত ছিল। কিন্তু ট্যুরিস্টের সঙ্গে থেকে থেকে সে এইসব ইংরেজি শব্দ শিখে ফেলেছিল। তার আওয়াজে

মগন বুঝে নিল যে কীর্তি এসে গেছে।

সত্যিসত্যিই কীর্তি এসেছিল। বেঁটে, আঁটসাট বাঁধুনি, গভীর ভাঁজযুক্ত দেহ, বিষণ্ণ চেহারার যুবতী। তার রঙ ছিল পাকা। সে জাম রঙের শাড়ী পরত। যখন সে এল তখন মনে হল আঁধারের কোনো টুকরো সাকার হয়ে সামনে এসেছে। সে হামেশা রাতেই আসত। সে নিজেই নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইত। সিরাজা তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল। কীর্তি প্রায়ই তার দিকে না তাকিয়ে কথা না বলে চলে যেত। তা সত্ত্বেও সে সিটি বাজাত।

কিন্তু কীর্তি কথাই বা বলত কোথায়। এর সঙ্গে, ওর সঙ্গে, তার সঙ্গে— কারুর সঙ্গেই না। কথা বলার জন্যে সে এমনি সওয়াল গড়েপিটে নিত যার জবাব হত 'হ্যাঁ' বা 'না'। কেবল উপর থেকে নীচে অথবা ডাইনে থেকে বাঁয়ে মাথা হেলিয়ে কথা সেরে নিত। তাকে সিরাজার বিরক্ত করা মগনলালের পুরোপুরি অপছন্দ ছিল। সিরাজা কয়েকবার মগনকে বলেছিল—

'ইয়ার, তুমি প্রেমের গোলকধাঁধায় পড়ে যাও নি তো? যুবতী মেয়েটাকে টেনে নাও। যদি বেশি এদিক-ওদিক করো তো কবুতরের মতো মেয়েটি উড়ে যাবে।'

কিন্তু মগন তাকে ধমকে দিয়েছে।

আসলে মগন টকলার ধান্দা ছিল বড়ো ঝামেলার। কীর্তি কাঠের কাজ বা মূর্তি তৈরি করে বিক্রির জন্য তার কাছে নিয়ে এলে মগন-লাল তাতে অনেক খুঁত বার করত। কখনো বলত এই ধরনের জিনিসের চাহিদা আজকাল নেই, আবার কখনো বলত শিল্পকলার কষ্টিপাথরে বিচারে এ কাজ নিখুঁত হয় নি। কীর্তি মুখ আরো নামিয়ে নিত। যদিও এইসব কথায় মগনলালের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যাতে একশো টাকার জিনিস পাঁচ-দশ টাকায় কীর্তি দিয়ে যায় আর তা রেখে দিয়ে সে একশো টাকায় বেচে।

কোনো আর্টস্কুলে কীর্তি এই কাজ শেখে নি। তার বাপ নারায়ণ ছিল শিল্পী। ভাউ দাজী আর জেমস বর্গেস প্রভৃতির সঙ্গে সে

নেপাল আর হিন্দুস্থানের কোথায় কোথায় শিল্প-উত্তরাধিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। আসলে তা লণ্ডনের জাদুঘর, নিউ ইয়র্ক আর শিকাগোর অ্যান্টিক-দোকানগুলিকে অলংকৃত করত। প্রতি বছর আমাদের মন্দির আর মূর্তিঘরের শত শত মূর্তি গায়েব হয়ে যায় আর হাজার হাজার মাইল দূরে কিউরিও প্রভৃতির দোকানের আশ্রয় পায়। বিরতিহীন সফরে বিরক্ত হয়ে নারায়ণ ফিরে এসে ঘরে বসেই শিল্পকর্মে নির্মাণ শুরু করে দিল। কীর্তি গভীর মনোযোগে তার কাজ দেখত আর কাজের মাঝে হাতে খোদাই-যন্ত্র এগিয়ে দিয়ে 'রাফ ওয়ার্কে' বাপকে সাহায্য করত। ঘরে বসে গিয়ে নারায়ণ ভুলে গিয়েছিল যে লুপ্ত প্রাচীন শৈলীর শিল্পকর্ম বেশী দামের হয় আর তার দুগুণ-চৌগুণ নয়, শতগুণ দাম পাওয়া যায়। হয়তো সে জানত কিন্তু নারায়ণ ছিল সেই দলের মানুষ যারা পয়সার আশু প্রয়োজনই বুঝতে পারে, তাকে জীবনের প্রসারিত পটে দেখে না। সে শিল্পকর্ম তৈরি করে কষ্টেসৃষ্টে রুটির পয়সা উপার্জন করত। শেষে একদিন রুটির পয়সা করতে করতে তার মৃত্যু হল। সে জগদম্বার মূর্তি বানাচ্ছিল। সে সময় তার আপন খোদাইযন্ত্র হাতে আঘাত করল, ফলে তার ধনুষ্টংকার হয়ে গেল। কাছের সামরিক হাসপাতালে সে মারা গেল। লোকে বলল যে সে কুকুরের মতো মরেছে। এইরকম মৃত্যু তার হবে না-ই বা কেন ? সে যখন দেবী-মূর্তি বানাচ্ছিল তখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস দেবীর স্তনযুগল, নিতম্ব আর জঙ্ঘার উপর নিচে আটকে থাকত। ছোটো মূর্তিতে স্তনযুগল শূন্যে ঘূর্ণ্যমান লাট্টুর মতো দেখায়, কিন্তু বড়ো মূর্তিতে পা আর স্তনযুগল এক রকম ছোটো ঘড়ার মতো দেখায়। আসল কথা, দুধের বড়ো বড়ো বাটি যেন বুকের পরে রাখা হয়েছে, আর হস্তিনীর মাথার মতো নিতম্ব, যার নীচে একটি শুঁড়ের বদলে দুটি শুঁড় বেরিয়েছে। সে দুর্গামূর্তি বানাচ্ছিল। দুর্গা বড়ো জাঁকজমকভরা দেবী। এইরকম দেবীর মূর্তি বানাতে গিয়ে নারায়ণ কুকুরের মতো মরবে না তো কি আমার-আপনার মতো মরবে ?

'কী এনেছ?' মগন টকলা কীর্তিকে জিজ্ঞেস করল। কীর্তি আপন শাড়ির আঁচল থেকে 'কাঠের কাজ' বার করল আর মগনের সামনে টেবিলের 'রোল টপে'র উপর ধীরে ধীরে রাখল। কেননা উপরের ল্যাম্পের আলো ওখানেই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ওটি দেখার পূর্বে মগন কীর্তির সামনে এক পুরনো কাজ-করা চেয়ার ঠেলে দিল, কিন্তু সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমার মা কেমন আছে?'

কীর্তি কোনো জবাব দিল না। সে একবার পিছন ফিরে দেখল যেখানে সড়ক নীচের দিকে নেমে গেছে, আর যখন মগনের দিকে ফিরে দাঁড়াল তখন তার চোখদুটি ছিল আনত।

কীর্তির মা সামরিক হাসপাতালে পড়ে ছিল, সেখানেই তার বাপ নারায়ণ মারা গিয়েছিল। বুড়ির 'কিডনী'র রোগ ছিল। তার পেটে ছেঁদা করে এক নল লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর তার উপর একটা বোতল বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যাতে করে মলমূত্র নিচে যাবার বদলে উপরে বোতলে চলে যায়। বোতল কোনো কারণে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন অন্য বোতলের জন্য পয়সা চাই। যদি সে মগনকে এ কথা বলে দিত তো সে অন্যভাবে কথা বলত, কিন্তু ঐ 'উড-ওয়ার্ক' (কাঠের কাজ) দেখে সে চমকিত হয়ে গেল।

'আবার ঐ জিনিস?' সে বলল—'আমি তোমাকে কয়েকবার বলেছি আজকাল এইসব জিনিস কেউ পছন্দ করে না···এই শায়িত বিষ্ণু, শেষনাগ উপরে, তাঁর পদসেবারত লক্ষ্মী... ।'

কীর্তি বড়ো বড়ো চোখে মগনের দিকে তাকাল—ঐ দৃষ্টিতে ছিল প্রশ্ন — 'তবে কী বানাব?'

'ঐসব যা আজকাল হচ্ছে।'

'আজকাল কী হচ্ছে?' কীর্তি শেষ পর্যন্ত মুখ খুলল। তার কণ্ঠস্বর প্রায় শোনাই যায় না, যেমন ক্যানারি পাখি ঠোঁট বেকিয়ে ডাকে কিন্তু তার আওয়াজ শোনাই যায় না।

মগন কথা বলার রাস্তা খুঁজে পেয়ে বলল, 'আর কিছু না হয়

তো গান্ধী বানাও···নেহরু বানাও···' ফের তার যেন কোনো ত্রুটি হয়ে গেছে এ ভাব কাটিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কোনো ন্যুড (নগ্নমূর্তি) ।'

'ন্যুড ?'

হাঁ,···আজকাল লোকে ন্যুড পছন্দ করে ।'

কীর্তি চুপ করে গেল। কুমারী বলে সে সংকুচিত হতে পারত, লজ্জা পেতে পারত, কিন্তু এইসব লজ্জা-সংকোচ তার মতো মেয়ের কাছে ছিল বিলাসিতা। তার চিন্তা ছিল মাত্র এই যে মগন ঐ উড-ওয়ার্ক কিনবে কিনা, পয়সা দেবে কি দেবে না ? কিছুটা ভেবেচিন্তে সে বলল—

'আমি ঐ মূর্তি বানাই না···'

'তফাত কী আছে ?' মগন টকলা বলল—'দেবীও তো নারী... তুমি ঐ মূর্তি বানাও, কিন্তু ভগবানের দোহাই কোনো দেবমালা ওর সঙ্গে জুড়ে দিয়ো না···এইসব কারণেই তোমার পিতা ঐ মৃত্যু বরণ করেছিল...স্বর্গবাসী হয়েছে···'

কীর্তি নিজের জীবনের প্রতি ফিরে তাকাল। তখন সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। কোনো এক বিপদাশঙ্কায় তার সারা শরীর কাঁপছিল। সেই বিপদের কথা সে ছাড়া দ্বিতীয় কেউ জানত না। সে ঐ চেয়ারে বসে নি। সেটাকে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। সেদিক থেকে তার শরীরের সুন্দর রেখাগুলি এক আকর্ষক ছবির মতো দেখাচ্ছিল। এ কেমন শিল্প যা উপরের নয়, নিচের নারায়ণ বানিয়েছিলেন। মগনলালের হৃদয়ে পছন্দ আর অপছন্দের দ্বন্দ্ব চলছিল সে জানত না যে সামনে-দাঁড়ানো মেয়েটির হৃদয়ে বশ আর বিবশের মধ্যে আপসে লড়াই চলছিল। তার মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছিল। থুতু গিলে নেবার চেষ্টা করে কীর্তি বলল,

'আমি ?··· আমার কাছে তো মডেল নেই...'

'মডেল ?' মগন তার কাছে এগিয়ে এসে বলল।

'শত শত পাওয়া যায়... আজ কোনো যুবতী সুন্দরী মেয়েকে

পয়সার ঝলক দেখাও তো সে একদম···'

কীর্তি কিছু বলে নি কিন্তু মগন শুনল—'পয়সা...' মগন নিজেই বলল—

'লোকে পয়সা খরচ করলে তবে তো পয়সা উপায় করবে...'

এই কথা কীর্তিকে আরো বিষণ্ণ করে তুলল। তার আত্মা জীবনের শক্ত চোয়ালের মধ্যে ধড়ফড় করছিল। তার চোখদুটি অশ্রুতে ভিজে গেল। মেয়েদের এমনি দশা হয় যা দেখে পুরুষের অন্তরে পিতা আর স্বামীকে জাগিয়ে দেয়। সারকথা এই যে মগন হাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বুকে নিতে চেয়েছিল—

'আমার প্রাণের পুতুল, তুমি চিন্তা কোরো না··· আমি তো আছি।'

কিন্তু কীর্তি তাকে ধাক্কা দিল। মগন বিব্রত হয়ে গেল। সে এমন ভাব দেখাল যে কিছুই ঘটে নি। তুরুপের তাস তারই হাতে আছে। টেবিলের 'রোলটপ' থেকে সে ঐ 'উড-ওয়ার্ক'টি তুলে নিল আর কীর্তির দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরে বলল—

'আমার এ জিনিসের দরকার নেই।'

তখনি কীর্তিও কিছু ভেবে নিয়েছিল। সে প্রথমে নীচের দিকে দেখল তারপর সহসা মাথা তুলে বলল—

'আসছে বার ন্যুডই নিয়ে আসব। এখন তুমি এটাই নিয়ে নাও'....

'শর্ত রইল।' মগন মুচকি হেসে বলল।

কীর্তি মাথা ঝুঁকিয়ে দিল। মগন টকলা ভেবেছিল যে কীর্তি হেসে উঠবে, কিন্তু সে আরো কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেল। মগন 'রোলটপ' তুলে আর টেবিলের ভিতর থেকে একটা দশ টাকার চুরমুরে নোট বার করে কীর্তির দিকে বাড়িয়ে ধরল— 'নাও...'

'দশ টাকা···?' কীর্তি বলল।

'হাঁ, তুমি বলেছ তাই, আমার কাছে এ মূর্তি বেকার। আমি আর দিতে পারব না...'

'এতে তো...' কীর্তি তার বাক্য শেষ করতে পারল না। তার ভিতরে কথা বলার শক্তি, শব্দ সব রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার অভিপ্রায় ছিল স্পষ্ট। মগন বুঝে নিল।

'এতে তো ওষুধের বোতলও আসবে না...ওষুধের খরচ পুরো হবে না...রুটিও চলবে না...' এই ধরনের কথাই সব অসহায় আর গরিব বলে। তাদের সব কথাই বৃথা। সে (মগন) কীর্তির দিকে তাকিয়ে বলল—

'আমাকে খুশি করে দাও, আমি তোমায় ভাল পয়সা দেব'...

আর এই কথা বলতে গিয়ে সে দু আঙুল দিয়ে বৃত্ত বানাল। সে চোখ মারল যেমন করে ডোমেরা সজ্জিতা বেশ্যাদের তারিফ ক'রে চোখ মারে।

কীর্তি বাইরে চলে এল। সে দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরল। ফেরবার সময়ে সর্বদাই কীর্তি উল্টাদিকের পথে যায় যদিও এতে তাকে দেড়মাইল পথ ঘুরে যেতে হয়। সে চাইত না যে সিরাজার সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়, কিন্তু আজ সেদিক দিয়েই সে গেল যেন তাতে তার বিপদাশঙ্কার সমাধানের অভিপ্রায় বলবতী হয়। মাইকেল চলে এসেছিল আর সিরাজার সঙ্গে মিলে কিছু খাচ্ছিল। এই সময় কীর্তি মুখ উপরে তুলে নাক ফুলিয়ে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। সিরাজা কী একটা কথা বলল যা মগন শুনতে পেল না। কীর্তির মনে ঐ বিদ্রোহের চিন্তা ছিল। সে ছিল দুঃখ-পীড়িতদেরই একজন যাকে দুশমনের সঙ্গ নিয়েও চলতে হয়— এ কথাই সে ভেবেছিল। বোধহয় দুশমন থেকে কোনো উপকার আসতে পারে—অথবা হয়তো-বা নারীপ্রকৃতির এটাই বিশেষত্ব যে নিজের পিছনে এমন একটা পুরুষকে লাগিয়ে রাখে যার সঙ্গে তার কোনো লেন-দেন নেই, কেবল এ কারণেই যে ঐ পুরুষ তাকে দেখে একবার 'সিটি' বাজাবে আর সে নিজের বুকে হাত রেখে ঠাণ্ডা দীর্ঘশ্বাস ছাড়বে।

সিরাজা নিশ্চয় কোনো 'আফ্রোডিজিয়াক' খাচ্ছিল। হতে পারে মাইকেল তার জন্য তা নিয়ে এসেছিল। বোধহয় তারা দুজনে মিলে

মগন টকলার কাছে এসে তার সঙ্গে ছদ্মব্যঙ্গে কথার ঘাত-প্রতিঘাত চালাত, কিন্তু মগন দোকান বন্ধ করে নিল। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে কীর্তির সেই উড়-ওয়ার্কটিকে দেখল। সেটি ছিল উঁচু দরের শিল্পকর্ম। শেষনাগের নিম্নাংশ ছিল খুব সুন্দর, কিন্তু তার উপরাংশে চিত্রিত দেহচর্মে কীর্তি উল্কির ছাপ ও রঙে ভরে দিয়েছিল। বিষ্ণু মূর্তিটি ছিল এমনভাবে তৈরি যা কোনো আস্থাবান রমণী পুরুষের মধ্যে দেখতে চায়। হ্যাঁ, লক্ষ্মী হেলে পড়েছিল আর তার শরীরের রেখাগুলি স্পষ্ট ছিল না। বোধহয় কীর্তি লক্ষ্মীর আর-কোনো রূপকে জানত না যদিও তাকে রুচিগ্রাহ্য রূপে বানানো কতই সোজা ছিল। যখন রমণী পা টেপবার জন্য ঝুঁকে পড়ে তখন তার হাতের বাজু দেখা যায়, শরীর থেকে তা যেন আলাদা হয়ে আসে আর রমণীকে তার বিশেষত্ব নিয়ে স্পষ্ট রূপে দেখা যায়। আবার পাশের দিকে উপবিষ্টা উপরাসীন রমণী নিম্নাসীনার চেয়ে কত তফাত বলে মনে হয়। আর পুরুষের দৃষ্টিতে নারীশরীরের কতই-না উচুঁনীচু অনুধাবন করা যায়। আবার এ কথা বলা যায় কীর্তি নিজে রমণী বলেই রমণীর তুলনায় সে পুরুষের প্রতি বেশী আগ্রহী ছিল, সে-কারণেই লক্ষ্মীমূর্তি নির্মাণে এই ত্রুটি ছিল। রমণী আপন সৌন্দর্যের ব্যাপারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আত্মরতিতে ডুবে থাকে আর যখন তার এই আত্মরতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন কোনো পুরুষের সহায়তায় তা থেকে মুক্তি পায়।

কীর্তির ঐ 'উড-ওয়ার্ক' মগন এক হাতে ধরে অন্য হাতে ছুরি নিয়ে তার উপর 'সিদ্ধম নমঃ' অক্ষর খোদাই করল আর পিছনের ঘরে চলে গেল। সেখানে জমি ছিল কাঁচা মাটির। তা খুঁড়ে সে তার মধ্যে 'উড-ওয়ার্ক'টিকে রাখল। আর-একটি মূর্তি বার করল, সেটাও কীর্তির বানানো। ফের গর্তের মধ্যে মাটি দিয়ে তার মধ্যে খয়েরের জল ছিটিয়ে দিল। পুরানো মূর্তির ধুলো ঝেড়ে সে দেখল তাতে বড়ো বড়ো ফাটা-দাগ হয়ে গেছে আর তা কয়েক শতাব্দীর পুরানো বলে মনে হচ্ছে। পরের দিন যখন সেটিকে নিয়ে সে ট্যুরিস্টদের কাছে

গেল তখন তারা খুব খুশি হল। মগন তাদের জানাল যে এই মূর্তির উল্লেখ কালিদাসের রঘুবংশে আছে। রঘু কোঙ্কণ দেশে ত্রিকূট নামে এক শহর স্থাপন করেছিলেন, সেখান থেকে ঐ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। কিছু মূর্তি মহীশূরের চামরাজা ওয়াড়িয়ারের কাছে আছে আর কিছু তার কাছে। এইভাবে মগন টকলা ঐ মূর্তিটিকে সাড়ে পাঁচশো টাকায় বেচে দিল। এটার জন্যে সে কীর্তিকে দিয়েছিল মাত্র পাঁচটি টাকা।

এই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে কীর্তি 'ন্যুড' নিয়ে এল। সে আগের মতোই চিন্তিত ছিল। ওর মা ছিল অসুস্থ আর সে নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ওর প্রায় নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছিল। সে খকখক করে কাশছিল আর বারবার নিজের গলা ধরছিল। তুলোর পট্টি গলায় রেখে তা এক ফাটা-ছেঁড়া কাপড় দিয়ে সে বেঁধেছিল।

কীর্তি অন্যান্য দিনের মতোই মগন টকলার সামনে মূর্তিটি রেখে দিল। এই মূর্তি সে কাঠ দিয়ে নয়, পাথর দিয়ে বানিয়েছিল। আশা আর আশঙ্কার সঙ্গে কীর্তি মগন টকলার দিকে তাকিয়ে ছিল। মগন যদি অপছন্দ করে তো বড়ো মিথ্যা কথা হবে। এ কারণে সে কেবল তা পছন্দই করে নি, পরন্তু প্রাণভরে তারিফ করেছিল। নিন্দা করেছিল এই মাত্র যে মূর্তিটি খুব ছোটো হয়েছে। তার আফসোস এই যে তা যদি প্রমাণ মানুষের উচ্চতাবিশিষ্ট হ'ত তবে কেবল কীর্তির নয়, মগনেরও অনেক উপকার হত।

সে (মগন) যক্ষীমূর্তি হাতে নিয়ে সযত্নে দেখছিল। কীর্তি সত্যিসত্যি 'ন্যুড' বানাতে পারে নি। মূর্তির মুখের উপর ছিল ভিজে কাপড়। আশ্চর্য এই যে ঐ কাপড় থেকে এখনো পর্যন্ত জলবিন্দু ঝরে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে। তা কোথাও মুখের সঙ্গে লেগে ছিল কোথাও-বা আলাদা ছিল। উপর থেকে মুখ ঢাকার চেষ্টায় ঐ রমণীর দেহ আরো প্রকাশ হয়ে পড়ছিল।

মূর্তি থেকে নজর তুলে নিয়ে মগন টকলা কীর্তির প্রতি দেখল আর হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল—'বাহ্'। কীর্তি লজ্জিত হয়ে

নিজের জামদানী শাড়ীটিকে সামনে টানল আর পিছন দিকে ঢাকতে লাগল। কিন্তু মগন ঠিক বুঝে নিয়েছিল যে আয়নার সামনে নগ্ন হয়ে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে ঐ মূর্তি সে বানিয়েছে। কতবার তাকে কাপড় ভিজিয়ে নিজের মুখের উপর রাখতে হয়েছে যার ফলে তার ঠাণ্ডা লেগে গেছে আর সে এখন পর্যন্ত কাশছে। এ কেবল পয়সার কথা নয়। নারীর মধ্যে আত্মপ্রদর্শন আর আত্মসমর্পণের ভাবও তো আছে। মগন সব-কিছু বুঝে ফেলেছিল। কিন্তু জেনে বুঝে না-জানার ভান করে তাকে শুধিয়েছিল—

'মা কেমন আছে ?'

এ কথায় কীর্তি খুব চটে গিয়েছিল। তার কাশির ধমক এসেছিল আর নিজেকে সামলাতে বেশ-কিছু সময় লেগেছিল। মগন ঘাবড়ে গিয়েছিল, আর লজ্জিতও হয়েছিল। তারপর মাথা হেলিয়ে যে প্রশ্ন সে করেছিল তাও জরুরি ছিল না—

'তা হলে তুমি মডেল পেয়েছিলে ?'

কীর্তি প্রথমে দৃষ্টি নত করেছিল, তারপর দোকানের বাইরে তাকিয়ে সেই দিকে দেখেছিল যেদিকে সড়ক আকাশ ছুঁতে গিয়ে হঠাৎ নীচে নেমে গিয়েছে। মগন চেয়েছিল কীর্তির দুর্বলতা ধরে ফেলে আর প্রাপ্য তারিফ তাকে দেয়, আর বোধহয় দিতে চেয়েছিলও। কিন্তু মগন ভাবল এতে মূর্তির দাম বেড়ে যাবে। সে মনে মনে স্থির করেছিল এবার সে কীর্তিকে একশো টাকা দেবে। ওষুধের বোতল আর বাকি জিনিসপত্রের দাম একশো টাকা না হলেও সে একশো টাকাই দেবে। ভিতরে ভিতরে সে ভয় পাচ্ছিল কীর্তি আরো বেশি টাকা না চায়।

'কী দাম দেব এর জন্য ?' সে হাল্কাভাবে প্রশ্ন করল।

কীর্তি চকিত নজরে তার দিকে দেখল আর বলল, 'এবার আমি পঞ্চাশ টাকা নেব।'

'পঞ্চাশ ?'

'হাঁ, এক পাই কম না…'

মগন হতাশভাবে 'রোল টপ' তুলল আর চল্লিশ টাকা বার করে কীর্তির সামনে রাখল আর বলল—

'যা তুমি বলো, কিন্তু এখন আমার কাছে চল্লিশ টাকাই আছে... দশ টাকা পরে নিয়ে যেয়ো...'

কীর্তি টাকা হাতে নিল আর বলল—

'আচ্ছা।'

সে চলে যাচ্ছিল। মগন তাকে থামাল—'শোনো।'

কীর্তি চলার মাঝে থেমে গিয়ে তার দিকে—'আমায় সাহায্য করো' এই ঢঙে—তাকিয়ে দেখল। কীর্তির চেহারায় বিষণ্ণতা ছিল, কিন্তু তা ছড়িয়ে যাবার বদলে থেমে গিয়েছিল যখন মগন টকলা শুধাল—'এই টাকায় তোমার কাজ হয়ে যাবে তো?'

কীর্তি মাথা হেলিয়ে দিয়েছিল আর হাত ছড়িয়ে দিয়েছিল, যার অর্থ 'আর কী করা যায়?'—সে ফের বলেছিল—'মা'র অপারেশন এসে গেল, একশো' টাকা চাই।'

সে ফের বলল—'আমি তো বলেছি'—একটু থেমে বলল—'মা যত শীঘ্র মরে যায় ততই ভালো।'—আর সেখানে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল।

শেষে সে (কীর্তি) নিজেই বলে উঠল—'এইভাবে ছুটে বেড়ানোর চেয়ে মরণও ভালো।'

যতক্ষণ মগন চোখ খুলে দেখে না ততক্ষণ কীর্তিকে আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ের বদলে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছরের ভরন্ত রমণী বলে মনে হয়, সে যেন জীবনের প্রত্যেক আঘাত নিজের উপরে নিয়ে তাকে ব্যর্থ করে ফেলে দেয়।

'একটা কথা বলি।' টকলা কাছে এসে বলল, 'তুমি মিথুন বানাও...অপারেশনের সব খরচ আমি দেব।'

'মিথুন?' কীর্তি বলল আর কেঁপে উঠল।

'হাঁ।' মগন বলল, 'ওর খুব চাহিদা আছে। ট্যুরিস্টরা ওর জন্যে পাগল হয়ে যায়।'

'কিন্তু...'

'বুঝতে পারছি।' মগন মাথা হেলিয়ে বলল।

'তুমি না জানো তো একবার খাজুরাহো চলে যাও আর দেখে নাও। আমি তার জন্য তোমাকে রাহা-খরচ দিতে রাজি আছি···'

'তুমি!' কীর্তি ঘৃণার সঙ্গে তার দিকে দেখল আর কিছুক্ষণ পরে বলল, 'তুমি তো বলছ তোমার কাছে আর পয়সা নেই···'

মগন ঝটপট মিথ্যা তৈরি করে নিল—

'আমার কাছে সত্যি পয়সা নেই', সে বলল—'আমি দোকানের ভাড়া দেবার জন্য কিছু টাকা আলাদা করে রেখেছিলাম।'

সে ফের টাকা দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু কীর্তি আপন অহংকারে তা না নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। মগন টকলা ঘুরে দাঁড়িয়ে যক্ষী-মূর্তিটি দেখল। ছোটো হাতুড়ি দিয়ে তার নাক ভেঙে দিল। আবার ঠ্যাং ভেঙে দিল আর মূর্তির শিরের আভরণের উপর লঘুভাবে আঘাত করল যাতে কিছু অংশ ভেঙে পড়ে গেল। তারপর ভিতরের ঘরে গিয়ে সে মূর্তিটিকে দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে লবণের অ্যাসিড-জলে ডুবিয়ে দিল। তার ফলে ধোঁয়া উড়ল। মগন দড়ি ধরে টেনে যক্ষীকে বার করে নিয়ে জলে ডুবিয়ে দিল। তারপর যখন জল থেকে তাকে তুলে নিল তখন যক্ষীর সাজ-আভরণ মলিন হয়ে গেছে আর মাঝে মাঝে কোথাও হঠাৎ গর্ত হয়ে গেছে। এখন এই মূর্তি হাজার টাকায় বিক্রির জন্য তৈরি হয়ে গেল।

এবার কীর্তি যে মূর্তি নিয়ে এল তা মিথুন-মূর্তি। তা ছিল প্রমাণ মানুষের উচ্চতাবিশিষ্ট। মূর্তি একটি বস্তায় বাঁধা অবস্থায় ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে সে নিয়ে এসেছিল। কয়েকজন মজুর তা তুলে নিয়ে মগন টকলার দোকানে রেখে মজুরি নিয়ে চলে গিয়েছিল।

কীর্তি আর নিজেকে একা পেয়ে ভরা শ্বাসে মগন টকলা বস্তার দড়িদড়া কেটে ফেলেছিল আর কিছু ঔৎসুক্যের সঙ্গে মূর্তির আবরণ খুলেছিল। এখন মূর্তি তার সামনে। "পারফেক্ট"—মগন মূর্তিকে দেখল আর তার গলা শুকিয়ে গেল। তার খেয়াল ছিল যে কীর্তি

নিজের সামনে ঐ শিল্পমূর্তিকে দেখতে দেবে না। কিন্তু কীর্তি সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার সামনে, কোনোরকম আবেগ ছাড়াই শিল্পের নারীমূর্তি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল, আর পুরুষমূর্তি আত্মবিস্মৃত হয়ে তার দুই কাঁধ ধরে দাঁড়িয়েছিল— মগন টকলা এই যুগলমূর্তিকে যত্নের সঙ্গে দেখেছিল—সে বোধহয় নিভৃত অবসরে তাকে দেখতে চাইছিল।

'অপারেশনের জন্যে কত টাকা চাই?'

'অপারেশনের জন্য নয়— নিজের জন্য।'

'নিজের জন্যে?…মা…'

'কয়েক সপ্তাহ হল মারা গেছেন।'

মগন তার নিজের চেহারায় দুঃখ আর আফসোসের ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বোধহয় কীর্তি তা চায় নি। তার দুই ঠোঁট চেপে বসেছিল। ঐরকমই বিষণ্ণভাবে সে বলেছিল—'আমি এর জন্যে হাজার টাকা নেব…'

মগন চকিত হয়ে গিয়েছিল। তার কথায় ছিল তোতলামি—'এর জন্যে কেউ হাজার টাকা দিতে পারে?'

'হাঁ।' কীর্তি জবাব দিয়েছিল—'আমি কথা বলে এসেছি… বোধহয় আমি আরো বেশি পেতে পারি… কিন্তু আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম।'

'আমি তো…আমি তো পাঁচশো টাকা দিতে পারি।'

'না।' কীর্তি মজুরের সন্ধানে বাইরের দিকে দেখতে লাগল। মগন টকলা তাকে থামাল— 'আর শ' দুশো নিয়ে নাও।'

'হাজারের চেয়ে কম নেব না।'

মগন হয়রান হয়ে কীর্তির দিতে তাকিয়ে দেখল। আজ কীর্তির মেজাজ ছিল অন্যরকম। ও কি খাজুরাহো গিয়েছিল? ট্যুরিস্টদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? যে-কোনো মূল্যে কলাকারকে তার মার্কেট থেকে দূরে সরিয়ে রাখা দরকার। কিন্তু…কিন্তু…সে 'রোল টপ' তুলে আটশো টাকার নোট গুনে কীর্তির সামনে রেখেছিল। কীর্তি

তাড়াতাড়ি তা গুণে দেখে তার মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলেছিল।

'আমি বলেছি— হাজার টাকার কম নেব না।'

'আচ্ছা, ন শো টাকা নাও…'

'না।'

'সাড়ে ন শো…ন শো পঁচাত্তর…' কীর্তির দৃষ্টিতে অহংকারের ভাব দেখে সে শ' টাকার দশখানা নোট তার হাতে দিয়ে নেশাগ্রস্তের মতো মিথুন-মূর্তির দিক এগিয়ে গিয়েছিল। কীর্তি দাঁড়িয়েছিল। সে তার আপন শিল্পকর্মের তারিফ শোনার জন্য থেমে গিয়েছিল। মগন মিথুন-মূর্তির মধ্যে রমণী-মূর্তির প্রতি দেখল। সে মূর্তি ছিল কীর্তি নিজেই। তার চোখে জল কেন? তা কি আত্মতোষের গভীর অনুভূতির ফল অথবা কোনো জীবন-পীড়নের ফল? তা কি দুঃখ আর সুখ, বেদনা আর বেদনা-উপশমের সম্পর্ক-জাত, যা থেকে পুরো সৃষ্টি উপজিত? মগন আবার পুরুষ-মূর্তির দিকে দেখল— যে মূর্তি উপর থেকে সুন্দর ছিল কিন্তু ভিতরে ছিল পুরো অসুন্দর। কীর্তি কেন পুরুষ-মানুষের কঠোরতার উপর জোর দিয়েছিল…এই মূর্তি হল মিথুন-মূর্তি, কিন্তু এ তো সে মিথুন নয় যা পুরুষ আর প্রকৃতির মিলনে হয়…ঠিক আছে …বিপরীত মূর্তিতে বেশি টাকা পাওয়া যাবে…

মগন টকলা উপরের দীপদান টেনে পুনিয়ে এসে রুষ-তির মূপ্রতি দেখল আর বলে উঠল—

'এই…আমি এই মূর্তিকে কোথায় যেন দেখেছি?'

কীর্তি কোনো জবাব দিল না।

'তুমি।' মগন যেন ঠিকানা পেয়ে বলে উঠল—

'তুমি সিরাজার সঙ্গেই বাইরে গিয়েছিলে।'

কীর্তি এগিয়ে এসে মগন টকলার মুখের উপর সজোরে এক থাপ্পড় মেরে নোটগুলি হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

তোমার দুঃখ আমাকে দাও

মদন যেমন ভেবেছিল বিয়ের রাত ঠিক তেমনটি হয় নি।

চকলী বউদি মদনকে ফুসলিয়ে মাঝখানের ঘরে ঠেলে দিয়েছিল। ইন্দু সামনের শালুতে নিজেকে জড়িয়ে আঁধারেরই অংশ হয়ে গিয়েছিল। বাইরে চকলী বউদি, দরিয়াবাদী পিসি আর সব মহিলাদের হাসি রাতের শান্ত জলে মিছরির মতো ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছিল। মহিলারা এ কথাই বুঝেছিলেন যে এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও মদন কিচ্ছু জানে না, কারণ যখন তাকে মাঝরাতের ঘুম থেকে জাগানো হল তখন সে হড়বড় করে বলেছিল— 'আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

এই মহিলাদের দিন চলে গেছে। বিয়ের পহেলা রাতে তারা তাদের স্বামীদের যে-সব কথা বলেছিল আর শুনেছিল তার প্রতিধ্বনি আজ তাদের শ্রুতিতে নেই। তারা কেবল সংসার করল আর এখন নিজের আর-এক বোনকে সংসারী করার সিদ্ধান্ত করেছে। ধরিত্রীর এই মেয়েরা এ কথাই বুঝেছিল যে পুরুষরা হল মেঘ-খণ্ড— তাদের প্রতিটি বর্ষণের জন্য মুখ তুলে তাকিয়ে থাকতে হয়। যদি না বর্ষে তো প্রার্থনা করতে হয়, পূজা দিতে হয়, জাদুমন্ত্র পড়তে হয়। যদিও কালকাজীর এই নয়া বসতিতে মদন ঘরের সামনে খোলা জায়গায় শুয়েছিল তথাপি তারই জন্য অপেক্ষায় ছিল। এক অশুভ লক্ষণের মতো পড়শী সিবতের মোষটা তার খাটের কাছে বাঁধা ছিল। মোষটা বারবার ফুঁ-ফুঁ করে মদনকে শুঁকছিল আর সে হাত তুলে তাকে দূরে রাখার চেষ্টা করছিল— এই অবস্থায় ঘুমোনোর সুযোগ কোথায়?

সাগরের তরঙ্গে দোলা আর মেয়েদের রক্তে ঢেউ-তোলায় পারঙ্গম চাঁদ এক জানালার পথে অন্দরে চলে এসেছিল আর দেখছিল, দরজার অন্য দিকে দাঁড়িয়ে মদন পরবর্তী পদক্ষেপ কোন্ দিকে ফেলে। মদনের নিজের ভিতরে মেঘ গর্জন করছিল। বিজলী-বাতির থামে

কান পাতলে যেমন তার ভিতরে শন্ শন্ শব্দ শোনা যায় তেমনি তার নিজের ভিতরেই তা শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর মদন এগিয়ে গিয়ে পালঙ্ক টেনে চাঁদের আলোয় নিয়ে আসে যাতে করে নববধূর মুখ দেখতে পারে। কিন্তু সে থমকে গেল। সে তখনি ভেবেছে— ইন্দু আমার বউ, পরস্ত্রী তো নয়, পরস্ত্রীকে স্পর্শ না করার শিক্ষা ছোটোবেলা থেকেই সে পড়ে এসেছে। শালুর মধ্যে সেঁধিয়ে-থাকা নববধূকে দেখতে দেখতে মদন সিদ্ধান্ত করে নিল যে এইখানে ইন্দুর মুখ লুকিয়ে আছে। আর যখন তার পাশে পড়ে-থাকা গাঁটরীটা হাত বাড়িয়ে ছুঁলো তখন দেখল সেখানেই ইন্দুর মুখ। মদন ভেবে দেখল যে ইন্দু সহজে নিজের থেকে তার মুখ দেখতে দেবে না। কিন্তু ইন্দু এরকম কিছু করে নি, কেননা কয়বছর পূর্ব থেকে সেও এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল, আর কোনো কাল্পনিক মোষের শুঁকতে থাকার ফলে তারও ঘুম আসছিল না। চলে-যাওয়া ঘুম আর বন্ধ-করা চোখের বেদনা সত্ত্বেও আঁধার ছাড়াও সামনে ধড়ফড়-করা-কিছু নজরে এল। চিবুক পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে মুখ সাধারণত লম্বা হয়ে যায় কিন্তু এখানে সব-কিছুই গোল দেখাচ্ছিল। বোধহয় এই কারণে চাঁদের আলোয় গাল আর ঠোঁটের মাঝে এক ছায়াদার টোল তৈরি হয়েছিল— যেমন সবুজ খেত আর সুন্দর টিলার মাঝখানে হয়ে থাকে। কপাল ছিল ছোটো, কিন্তু তার উপর হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা কুঞ্চিত কেশরাশি—

তখনি ইন্দু তার মুখ সরিয়ে নিল। যেন সে মুখ দেখার অনুমতি দিয়েছিল কিন্তু এতক্ষণ ধরে নয়। আর লজ্জার তো কোনো সীমা নেই। মদন কিছুটা শক্ত হাতেই হুঁ-হুঁ করতে-লাগা নববধূর মুখ ফের উপরে তুলল আর মাতালের মতো গদ্‌গদ কণ্ঠে বলল—'ইন্দু!'

ইন্দু কিছুটা ভয় পেয়েছিল। জীবনে এই প্রথমবার কোনো অপরিচিত পুরুষ এইভাবে তার নাম ধরে ডেকেছিল আর সেই অপরিচিত পুরুষের দৈবী অধিকারের দাবিতে রাতের আঁধারে ধীরে ধীরে একাকিনী বন্ধুহীন অসহায়া নারীর আপন মানুষ হয়ে

যাচ্ছিল। ইন্দু এই প্রথমবার এক নজর উপর দিকে তাকিয়ে, তারপর চোখ বন্ধ করে কেবল এটুকু বলেছিল—'জী।'... তার আপন কণ্ঠস্বর পাতাল থেকে উঠে-আসা শব্দের মতো শুনিয়েছিল।

বেশ কিছুক্ষণ এভাবেই কাটল। তারপর ধীরে-ধীরে কথাবার্তা হতে লাগল। এখন যে কথা চালানো যায় তা'ই চলে। ইন্দু থামছিলই না। ইন্দুর বাবা, ইন্দুর মা, ইন্দুর ভাই, মদনের ভাই-বোন-বাপ, তার রেলের চাকরি, তার মেজাজ, জামা-কাপড়ের পছন্দ, খাওয়ার অভ্যাস— সব-কিছুরই হিসেব নিচ্ছিল। মাঝে মাঝে মদন ইন্দুর কথা থামিয়ে দিয়ে অন্যকিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু ইন্দু এড়িয়ে যাচ্ছিল— সীমাহীন অসহায় অবস্থায় মদন তার মায়ের কথা তুলল। মা তার সাত বছর বয়সে তাকে ছেড়ে খুব কষ্ট পেয়ে মারা গেলেন। 'যতদিন পর্যন্ত বেচারী-মা বেঁচেছিলেন', মদন বলল—'ততদিন বাবুজীর হাতে ওষুধের শিশিই ছিল, আমি হাসপাতালের সিঁড়ির উপর আর পাশের ছোটো ঘরে পিঁপড়ের সারির উপর শুয়ে থাকতাম, আর শেষে এক দিন—28 মার্চের সন্ধেবেলায়...' বলতে বলতে মদন চুপ করে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ক্রন্দন আর গলা ভরে যাওয়ার এধারে-ওধারে পৌঁছে গেল। ইন্দু ঘাবড়ে গিয়ে মদনের মাথা নিজের বুকে টেনে নিল। তার ক্রন্দনের মুহূর্ত-অবসরে ইন্দু নিজের এধারে আর পরের ওধারে পৌঁছে গেল (দূরের মানুষ কাছের হল)। মদন ইন্দুর সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চাইছিল কিন্তু ইন্দু তার হাত চেপে ধরে বলল—'আমি তো লেখাপড়া জানি না। জীবনে আমি দেখেছি মা আর বাবা, ভাই আর ভাই-বউ, আরো অনেক লোক দেখেছি, এ-কারণে আমি কিছু-কিছু বুঝি। আমি এখন তোমার। নিজের বদলে তোমার কাছে একটা জিনিস চাইছি...'

কাঁদতে কাঁদতে কান্নার নেশা ধরে যায়। মদন কিছুটা অধীরতা আর কিছুটা উদারতা মিলিয়ে বলল—

'কী চাইছ? তুমি যা চাইবে আমি তা'ই দেব।'

'পাকা কথা?' ইন্দু বলল।

মদন কিছুটা ব্যাকুল হয়ে বলল—

'হাঁ— হাঁ— যা বলেছি তা পাকা কথা।'

কিন্তু এর মধ্যেই মদনের মনে এক ভাব এল। আমার কারবার আগের থেকেই মন্দা চলছে ; যদি ইন্দু এমন কিছু জিনিস চায় যা আমার সামর্থ্যের বাইরে তা হলে কী হবে ? কিন্তু ইন্দু মদনের শক্ত আর প্রসারিত হাত আপন নরম হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে তার গালে আপন গাল রেখে বলল—

'তোমার দুঃখ আমাকে দিয়ে দাও।'

মদন খুব হতাশ হয়ে গেল। সেইসঙ্গে তার ঘাড় থেকে এক বোঝা নেমে গেল বলে অনুভব করল। সে ফের চাঁদের আলোয় ইন্দুর মুখ দেখার চেষ্টা করল কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না। সে (মদন) ভাবল মা অথবা কোনো সখীর কাছে শেখা মুখস্থ প্রবাদ ইন্দু তাকে বলেছে। আর তখনি এই তপ্ত অশ্রুবিন্দু মদনের হাতের কব্জির উপর পড়ল। সে ইন্দুকে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে নিতে বলল— 'দিলাম।' কিন্তু এই-সব কথাবার্তা মদনকে স্বাভাবিক সহজ করে তুলল।

এক এক করে সব অতিথি বিদায় নিল। চকলী বউদি দুই বাচ্চাকে আঙুল দিয়ে ধরে সিঁড়ির উঁচু-নীচু ধাপে নিজেকে সামলে চলে গেল। দরিয়াবাদী পিসি তার ন'লাখ টাকার হার হারিয়ে গেছে বলে হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছিল। হাঙ্গামা করতে করতে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল ; সেই হার স্নানের ঘরে পাওয়া গেল। যৌতুক থেকে তার প্রাপ্য তিনখানা শাড়ি নিয়ে পিসি চলে গেল। তারপর গেলেন খুড়োমশায়— জে. পি. হবার খবর তার মারফত পেয়ে তিনি এমনই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন যে মদনের বদলে নববধূর মুখচুম্বন করতে যাচ্ছিলেন।

বাড়িতে থেকে গেল বুড়ো বাপ আর ছোটো ভাইবোন। ছোট্ট দুলারী তো সবসময় বউদির গায়ে লেপটে থাকে। গলি-মহল্লার কোনো বউ নববধূকে তাকিয়ে দেখে অথবা না দেখে, যদি দেখে তো কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে, এই-সব তার এক্তিয়ারের মধ্যে ছিল।

শেষপর্যন্ত এই-সব মিটে গেল আর ইন্দু ধীরে ধীরে পুরনো হতে লাগল। কিন্তু কাল্‌কাজীর এই নয়া বসতিতে আজ পর্যন্ত লোক আসতে-যেতে মদনের বাড়ির সামনে থেমে যায় আর কোনো অছিলায় অন্দরে চলে আসে। ইন্দু তাদের দেখামাত্রই ঘোমটা টেনে দিত কিন্তু ঐ সামান্য অন্তরাল থেকেই যেটুকু দেখা যেত তা বিনা-ঘোমটায় দেখা যেতে পারত না।

মদনের কারবার ছিল দুর্গন্ধ বিরোজার। কোনো বড়ো সরবরাহ-কারীর দু-তিনটি জঙ্গলে চীড় আর দেবদারু গাছের জঙ্গলে আগুন ধরে যায় আর দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে কালী হয়ে যায়। মহীশূর আর আসাম থেকে আনানো বিরোজার বেশি দাম লেগে যায় আর লোকে বেশি দামে তা কিনতে রাজি ছিল না। একে তো আমদানি কম হয়ে গিয়েছিল, তার উপর মদন তাড়াতাড়ি দোকান আর সংলগ্ন দফ্‌তর বন্ধ করে ঘরে চলে আসত— ঘরে পৌঁছে তার একমাত্র প্রয়াস ছিল যে সকলে খাওয়া-দাওয়া করে নেয় আর আপন আপন বিছানায় শুয়ে পড়ে। খাবার সময় সে নিজেই থালা তুলে তুলে বাপ আর বোনের সামনে রাখত আর তাদের খাওয়া হয়ে গেলে এঁটো বাসন সব গুছিয়ে নিয়ে কলের নিচে রেখে দিত। সবাই ভাবত বধূ কি বউদি মদনের কানে কোনো মন্ত্র পড়ে দিয়েছে আর আজ সে ঘরের কাজেকর্মে খুব আগ্রহ দেখাচ্ছে। মদন ছিল সকলের চেয়ে বড়ো। কুন্দন তার ছোটো, আর পাশী সবচেয়ে ছোটো। যখন কুন্দন বউদির খাতিরে সকলে একসঙ্গে বসে খাবার জেদ ধরত তখন বাপ ধনীরাম তাকে বকে দিতেন— 'তুমি খাও'— বলতেন, 'বউ পরে খেয়ে নেবে।' ধনীরাম রান্নাঘরের এদিক-ওদিক দেখতেন, আর যখন বউ খাওয়া-দাওয়া থেকে ছুটি পেত আর বাসনকোসনের প্রতি মনোযোগ দিত তখন বাবু ধনীরাম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলতেন— 'রেখে দাও বউমা, বাসনকোসন সকালে ধোয়া যাবে।' ইন্দু বলত, 'না বাবুজী, আমি এখনি বাসন ধুয়ে দিচ্ছি।' তখন বাবু ধনীরাম কম্পিত কণ্ঠস্বরে বলতেন— 'মদনের মা যদি আজ থাকত বউমা,

তা হলে সে কি তোমায় এ-সব করতে দিত ?' তখন ইন্দু একেবারে হাত গুটিয়ে নিত।

ছোট্ট পাশী বউদিকে দেখে লজ্জা পেত এ কথা ভেবে যে নববধূ খুব তাড়াতাড়ি গর্ভবতী হয়েছিল। চকলী বউদি আর দরিয়াবাদী পিসি রেওয়াজমতো পাশীকে ইন্দুর কোলে বসিয়ে দিয়েছিল। তখন থেকে ইন্দু তাকে কেবল দেওর নয়, নিজের ছেলের মতো দেখত। যখনি সে আদর করে পাশীকে দুহাতের মধ্যে নেবার চেষ্টা করত তখনি পাশী ঘাবড়ে গিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দুহাত দূরে দাঁড়িয়ে যেত, দেখত আর হাসত, কাছে আসত না, দূরেও পালাত না। এক আশ্চর্য যোগাযোগে ঠিক এই সময়েই বাবুজী প্রতিবার সেখানে হাজির হতেন আর পাশীকে ধমক দিয়ে বলতেন —'আরে যা না··· বউদি আদর করে ডাকছে··· তুই কি এখনি জোয়ান-মদ্দ হয়ে গেলি ?'··· আর দুলারী তো পিছু ছাড়েই না। 'আমি বউদির কাছেই শোব'— তার এই জিদ বাবুজীর মনের মধ্যে কোনো 'জনার্দন'কে জাগিয়ে দিত। এক রাতে এই ব্যাপারে দুলারীর উপর জোরে চড় পড়ল আর সে ঘরের আধা-কাঁচা আধা-পাকা নালিতে গিয়ে পড়ল। ইন্দু দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরল— তো তার মাথা থেকে দুপাট্টা উড়ে গেল, চুলের ফুল আর পাখি পড়ে গেল। মাথার সিঁদুর, কানের ফুল সব উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। 'বাবুজী!' ইন্দু শ্বাস রুদ্ধ করে বলল। একই সঙ্গে দুলারীকে ধরতে গিয়ে আর মাথার উপরে দুপাট্টা ঢাকতে গিয়ে ঘাম বেরিয়ে গেল। মায়ের মতোই বাচ্চাকে বুকে নিয়ে ইন্দু মাথার দিকে যেখানে অনেক বালিশ ছিল সেখানে বিছানা করে তাকে শুইয়ে দিল। খাটের না ছিল প্রান্ত, না ছিল কাঠের বাজু। চোট তো একতরফা গেঁথে-যাওয়া জিনিস নয়। দুলারীর শরীরে আহত অংশের উপর ইন্দু এমন ভাবে আঙুল বুলিয়েছিল যে তাতে বেদনাও হচ্ছিল আবার তা আরামও দিচ্ছিল। দুলারীর গালের উপর বড়ো বড়ো টোল পড়ে যেত। ইন্দু ঐ-সব টোলের তারিফ করে বলত—

'তোর শাশুড়ী মরুক··· গালের উপর কেমন সুন্দর টোল পড়ে।' মুন্নী একেবারে খুকীর মতো বলত— বউদি, তোমার গালেও তো টোল পড়ে...' 'হাঁ মুন্নী', বলে ইন্দু দীর্ঘশ্বাস ফেলত।

কোনো কথায় মদনের রাগ হয়েছিল। সে পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু শুনছিল। সে বলল—'আমি তো বলছি একদিক থেকে ভালোই হয়েছে...'

'কেন? ভালো কেন হয়েছে?' ইন্দু প্রশ্ন করল।

'হাঁ, বাঁশ যদি না থাকে তো বাঁশি বাজে না··· শাশুড়ি না থাকে তো ঝগড়াও থাকে না।'

ইন্দু সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল— 'তুমি যাও তো, শুয়ে পড়োগে, বড়ো এসেছেন···মানুষ বেঁচে থাকে বলেই তো লড়াই করে। শ্মশানের চুপ-চাপ থেকে ঝগড়া ভালো। যাও না, রান্নাঘরে তোমার কী কাজ?'

মদন রাগ করে দাঁড়িয়ে রইল। বাবু ধনীরামের ধমকে আর সব বাচ্চারা আগেই আপন আপন বিছানায় শুয়ে পড়েছিল— যেন ডাকঘরের চিঠি সর্ট হয়ে যে যার জায়গায় চলে গেছে। কিন্তু মদন সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তার প্রয়োজন তাকে উদ্ধত আর লজ্জাহীন করে দিয়েছিল। কিন্তু ঐ সময়ে যখন ইন্দুও তাকে ধমকে দিল তখন সে কাঁদো কাঁদো হয়ে অন্দরে চলে গেল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত মদন বিছানায় পড়ে ছটফটাতে থাকল। কিন্তু বাবুজীর ভয়ে ইন্দুকে চেঁচিয়ে ডাকবার সাহস তার ছিল না। তার ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে গেল যখন মুন্নীকে ঘুম পাড়ানোর জন্য ইন্দু ঘুমপাড়ানি ছড়া গাইছিল।— 'আয় ঘুম রাণী, বৌরাণী, মস্তানী'।

দুলারী মুন্নীকে যে ঘুমপাড়ানি ছড়া গেয়ে ইন্দু ঘুম পাড়াচ্ছিল, তা মদনের ঘুম তাড়াচ্ছিল। নিজের প্রতি বিরক্ত হয়ে মদন সজোরে চাদর ধরে টানল। শাদা চাদর মাথায় ঢাকা দিয়ে শ্বাস বন্ধ করে খামোখা এক মড়ার মতো সে পড়ে রইল। মদনের মনে হল যে সে মরে গেছে আর তার নববধূ ইন্দু তার পাশে বসে জোরে জোরে মাথা কুটছে। দেয়ালে কব্জির আঘাত করে চুড়ি ভাঙছে আর

পড়তে-পড়তে কাঁদতে-কাঁদতে রান্নাঘরে যাচ্ছে আর চুলোর ছাই মাথায় দিচ্ছে, আবার বাইরে দৌড়ে এসে হাত তুলে তুলে মহল্লার লোকের কাছে নালিশ জানাচ্ছে—'সকলে দেখো, আমি মারা গেলাম'। এখন তার দুপাট্টার পরোয়া নেই, জামাকাপড়ের পরোয়া নেই, মাথার সিঁদুর, কেশের ফুল আর পাখি সব উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। ভাবের তোতা উড়ে গেল।

মদনের দু চোখ দিয়ে সবেগে অশ্রু বয়ে যাচ্ছিল, যদিও রান্নাঘরে বসে ইন্দু হাসছিল। মুহূর্তের মধ্যেই তার সৌভাগ্য বিনষ্ট হল আবার তার অজ্ঞাতেই সৌভাগ্য ফিরে এল। মদন যখন বাস্তব দুনিয়ায় ফিরে এল তখন চোখের জল মুছতে মুছতে নিজের 'পরেই হাসতে লাগল। ওধারে ইন্দুত হাসছিলই কিন্তু তা চাপা হাসি। বাবুজীর উপস্থিতির কারণে সে কখনো উঁচু গলায় হাসত না, খিলখিল করে হাসিও একরকমের বেহায়াপনা, দুপাট্টা আর চেপে-চেপে হাসি ঘোমটার কাজ করত। মদন মনে মনে ইন্দুর এক খেয়ালী মূর্তি বানিয়েছিল আর তার সঙ্গে অনেক কথাই বলেছিল। সে তাকে এমন আদর করেছিল যেমন আদর আজ পর্যন্ত করে নি। মদন আবার তার বাস্তব পরিবেশে ফিরে এসেছিল—সেখানে সঙ্গের বিছানা খালি পড়ে ছিল। সে হাল্‌কা আওয়াজে ডেকেছিল 'ইন্দু', তারপর চুপ করে গিয়েছিল। ঐ ইতস্তত ভাবের মধ্যে সে ঘুমের আবেশে নেশাগ্রস্ত হয়ে আধো ঘুমেই পড়েছিল। তার ঢুল এসেছিল কিন্তু সেইসঙ্গে তার মনে এই চিন্তা এসেছিল যে বিয়ের রাতে পড়শী সিব্‌তের মোষ তার মুখের কাছে ফোঁস-ফোঁস করছিল। মদন এক বিকল অবস্থায় উঠে বসল, তারপর রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকে দু-তিন বার আড়ামোড়া ভেঙে ফের শুয়ে পড়েছিল। ঘুমিয়ে গিয়েছিল।

মদন কান খাড়া করে কোনো কিছু শোনার প্রত্যাশায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন বিছানার ভাঁজ দুরস্ত করতে গিয়ে ইন্দুর চুড়িগুলি ঝনঝন করে উঠল তখন মদন হড়বড় করে উঠে বসল। হঠাৎ জেগে

যাওয়ায় তার মধ্যে প্রণয়ভাবনা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। আরাম করে পাশ না ফিরে লোকে ঘুমিয়ে গেলে হঠাৎ জেগে উঠে প্রেমের দম ফুরিয়ে যায়। মদনের সারা শরীর ভিতরকার আগুনে জ্বলছিল আর সেজন্যই তার রাগ হয়েছিল। তখন সে ইন্দুকে বিরক্তির ভাবে বলল—

'তা হলে তুমি এসে গেছ।'

'হাঁ।'

'খুকি শুয়েছে, না মরেই গেল ?'

ইন্দু ঝুঁকে-পড়া অবস্থা থেকে একদম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। 'হায় রাম!' নাকের উপর আঙুল রেখে সে বলল—

'কী কথা বলছ ? বেচারী মরবে কেন— মা-বাপের একমাত্র মেয়ে—'

'হাঁ', মদন বলল— 'বউদির একমাত্র ননদ।' তারপরই হুকুম দেবার স্বর আয়ত্ত করে বলল— 'ওটাকে বেশি মাথায় তুলো না।'

'তাতে কোনো পাপ আছে ?'

'এই পাপ আছে,' মদন রেগে গিয়ে বলল— 'তোমার পিছু ছাড়ে না। যখনি দেখি জোঁকের মতো লেগে আছে। আমি তো কোনো সুযোগই পাই না…'

'হায়।' ইন্দু মদনের চারপাইয়ের উপর বসতে বসতে বলল— 'বোনদের আর মেয়েদের এভাবে দূর্ দূর্ করা ঠিক নয়। বেচারী দু দিনের অতিথি। আজ নয়তো কাল, কাল নয়তো পরশু একদিন তো চলে যাবে…' এ বিষয়ে ইন্দু কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু সে চুপ করে গেল। তার মনশ্চক্ষুতে তার নিজের মা, বাপ, ভাই, বোন, খুড়ো, জেঠা, জেঠিমা সকলেই দেখা দিয়ে গেল। কোনো একদিন সে তাদের আদরের পুতুল ছিল, চোখের পলকে সে তাদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে গেল, আর এখন দিনরাত তার বেরিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছে, যেন ঘরে কোনো বুড়ী শাশুড়ী আছে। কোনো ঘরে যদি সাপ থাকে, তা হলে যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐ সাপকে তার গর্তে ধোঁয়া দিয়ে মেরে

ফেলা যায় ততক্ষণ ঘরের লোক নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না। দূর-দূরান্ত থেকে সাপকে খুঁটিগাড়ার, দড়ি দিয়ে বাঁধার, বিষদাঁত ভেঙে দেবার মাদারীদের ডেকে আনা হয়। বড়ো বড়ো ধন্বন্তরী আর মোতি-সাগররা আসে— শেষে এক দিন উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে লাল আঁধি এসে যায়। তা সাফ হয়ে যাবার পর এক লরি এসে দাঁড়ায়— তাতে সলমা-চুমকিওয়ালা শাড়িতে জড়িয়ে থাকা এক নববধূ বসে থাকে। পিছনের ঘরে এক সুর বাজতে থাকে, সানাই-এর আওয়াজ শোনা যায়। তারপর এক ধাক্কায় লরি চলতে থাকে।

মদন কিছুটা রাগের সঙ্গে বলল—

'তোমরা মেয়েছেলেরা খুব চালাক। গতকালই এ বাড়িতে এসেছ আর আজ এখানকার সব লোকের প্রতি আমার চেয়ে তোমার বেশি ভালোবাসা হয়েছে?'

'হাঁ।' ইন্দু বিশ্বাসের সঙ্গে বলল।

'এ-সব মিথ্যা। এ হতে পারে না।'

'তোমার মতলব আমি...'

'এ-সব শুধু লোক দেখানো...হাঁ।'

'আচ্ছা জী।' ইন্দুর চোখে জল এসে যায়, সে বলে— 'এ সব-কিছুই আমার দেখানো?' ইন্দু উঠে গিয়ে নিজের বিছানায় চলে যায় আর শিয়রের দিকে মুখ লুকিয়ে ফোঁপাতে থাকে। মদন তার অভিমান ভাঙাতে চাইছিল, কিন্তু ইন্দু নিজেই উঠে মদনের কাছে আসে আর শক্ত করে তার হাত ধরে বলে—

'তুমি সব সময় বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা বলছ, তোমার হয়েছে কী?'

স্বামীর মতো রোয়াব দেখাবার সুযোগ মদন পেয়ে যায়— 'যাও... যাও ...শুয়ে পড়ো গে', মদন বলে— 'তোমার কাছে আমার কিছুই নেওয়ার নেই...'

'তোমার কিছু নেওয়ার নেই তো আমার নেওয়ার আছে', ইন্দু বলল— 'সারা জীবন নেওয়ার আছে।' আর সে মদনের সঙ্গে হাত-কাড়াকাড়ি করতে থাকে। মদন তাকে ধুৎ ধুৎ করতে থাকে আর

সে মদনের গায়ে পড়ে মিশে যেতে চায়। সে ছিল সেই মাছের মতো যে স্রোতের সঙ্গে বহে যাবার বদলে ঝর্নার খরস্রোতের বিপরীতে সাঁতরে উপরে পৌঁছতে চায়। সে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করল, হাত ধরল, কেঁদে হেসে বলল—

'ফের আমাকে একেবারে কুট্‌নী বলবে?'

'সব মেয়েছেলেই তো তা'ই।'

'থামো···তোমার তো···' মনে হল যে ইন্দু কোনো গালি দিতে যাচ্ছিল আর মুখে কী একটা গুন্‌ গুন্‌ করেছিল। মদন দূরে বসে বলল— 'কী বললে?' আর ইন্দু শোনবার মতো আওয়াজ করে ফের সে কথা বলল। মদন খিল্‌ খিল্‌ করে হাসতে লাগল। পরক্ষণেই ইন্দু মদনের পাশে শুয়ে পড়ে বলছিল—

'তোমরা পুরুষরা কী জানো?— যার সঙ্গে ভালোবাসা হয় তার সব ছোটোবড়ো আত্মীয়ের সঙ্গেই ভালোবাসা হয়। কি বাপ, কি ভাই, আর কি বোন—' হঠাৎ দূরের দিকে তাকিয়ে বলে—

'আমি দুলারী-খুকীর বিয়ে দেব।'

'চূড়ান্ত হয়ে গেল', মদন বলল—'এখনো সে এক হাত লম্বা হয় নি, এখনি তার বিয়ের কথা ভাবছ···'

'তুমি তো এক হাতই দেখছ', বলে ইন্দু নিজের দু হাত মদনের চোখের উপর রেখে বলতে থাকে— 'একটু সময় চোখ বন্ধ করো আবার খোলো'— মদন সত্যি সত্যি চোখ বন্ধ করল, কিছুক্ষণের মধ্যে চোখ খোলে না দেখে ইন্দু বলল— 'এখন তো খোলো, এতক্ষণের মধ্যে আমি বুড়ী হয়ে যাব'— তখন মদন চোখ খুলল। মুহূর্তের জন্য মদনের মনে হয় সামনে ইন্দু নয়, আর কেউ বসে আছে। সে যেন হারিয়ে গেছে।

'আমি তো এখন থেকেই চার স্যুট আর কিছু বাসনপত্র ওর জন্যে আলাদা করে রেখেছি', ইন্দু বলল। যখন মদন কোনো জবাব দিল না তখন তাকে ঝাঁকি দিয়ে বলল— 'তুমি কি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ? নিজের ছেলেবেলার কথা মনে নেই?— তুমি তোমার দুঃখ আমাকে

দিয়ে দিয়েছ··· ?'

'অ্যাঁ!' মদন চমকে উঠে বলল আর নিশ্চিত হয়ে গেল, কিন্তু যখন সে ইন্দুকে নিজের সঙ্গে সাপ্‌টে মিশিয়ে নিল তখন সে আর একটি শরীর রইল না— সঙ্গে সঙ্গে এক আত্মাও তার আত্মার সঙ্গে মিলে গেল।

মদনের কাছে ইন্দু ছিল আত্মার আত্মা। ইন্দুর ছিল সুন্দর শরীর কিন্তু হামেশা কোনো-না-কারণে সে মদনের নজরের আড়ালে ছিল। একটা পর্দা ছিল। স্বপ্নের সুতোয় বোনা, নিশ্বাসের ধোঁয়ায় রঙিন, উচ্চ হাসির সোনালি কিরণে উজ্জ্বল আলো ইন্দুকে ঢেকে রাখত। মদনের নজর আর তার হাতের দুঃশাসন বহু শতাব্দী ধরে ঐ দ্রৌপদীর —যাকে সাধারণত বউ বলা হয়— বস্ত্রহরণ করতে থাকে কিন্তু হামেশা আশমান থেকে থানের পর থান, গজের পর গজ কাপড় তার উলঙ্গতা ঢাকবার জন্য পাওয়া যায়। দুঃশাসন শ্রান্ত হয়ে এখানে-সেখানে পড়ে যায় কিন্তু দ্রৌপদী সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। ইজ্জৎ আর শুচিতার সাদা শাড়ি-পরিহিতা সেনারী দেবীর মতো দেখায় আর—

···মদনের ফিরে আসা হাত লজ্জার ঘামে ভিজে যায়। তা লুকোবার জন্য সে হাত উপরে উঠায় আর হাতের পাঞ্জা সম্পূর্ণ প্রসারিত করে দিয়ে আড়ামোড়া ভেঙে আপন চোখের মণির সামনে মেলে ধরে। ফের আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখে— ইন্দুর মর্মর শুভ্র গৌরবর্ণ আর কোমল শরীর সামনে পড়ে আছে। ভোগের জন্য তা পাশেই আছে, বাসনার জন্যে দূরে··· যদি কখনো ইন্দুর সঙ্গে কলহ হয়ে যায় তো এই রকমের মন্তব্য হয়—

'হায় জী, ঘরে ছোটো বড়ো সবাই আছে···তারা কী বলবে?'

মদন উত্তর দেয়— 'ছোটোরা বোঝে না···বড়োরা বুঝে যায়।'

এর মধ্যে বাবু ধনীরাম সাহারানপুরে বদলি হয়ে গেল। সেখানে তিনি রেলের মেল সার্ভিসের সিলেকশন গ্রেডে হেড ক্লার্ক হয়ে গেলেন। এত বড়ো কোয়ার্টার পাওয়া গেল যে সেখানে আটটা

পরিবার থাকতে পারে। কিন্তু বাবু ধনীরাম একাই সেখানে ঠ্যাং ছড়িয়ে পড়ে থাকতেন। সারা জীবনে তিনি কখনো বাচ্চাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকেন নি। পুরো ঘরোয়া মেজাজের লোক ছিলেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে এই একাকিত্ব তাঁর হৃদয়ে ওখান থেকে পালিয়ে যাবার বাসনা জাগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তিনি নাচার। সব ছেলেমেয়ে দিল্লীতে মদন আর ইন্দুর কাছে থেকে সেখানেই স্কুলে পড়ত। বছর শেষ হবার পূর্বেই মাঝখানে নিয়ে এলে তাদের লেখাপড়ার ভালো হ'ত না। বাবুজীর হৃদয়ে আঘাতের পর আঘাত পড়তে লাগল।

অবশেষে গরমের ছুটি হল। তিনি বারবার লেখায় মদন ইন্দুকে কুন্দন, পাশী আর দুলারীর সঙ্গে সাহারানপুর পাঠিয়ে দিল। ধনীরামের দুনিয়া মুখরিত হয়ে উঠল। কোথায় তাঁর দফতরের কাজের পরে ছিল অবসরের পর অবসর, আর এখন কাজের পর কাজ। বাচ্চারা বাচ্চাদের মতোই যেখানে জামাকাপড় খুলত সেখানেই ফেলে রাখত, আর বাবুজী তা গুছিয়ে রাখতেন। মদন থেকে দূরে থাকার ফলে আলস্যে-ভরা ইন্দু তো নিজের পোষাক সম্পর্কেও বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। সে রান্নাঘরে এমনভাবে ঘুরত-ফিরত যেন খোঁয়াড়ের গোরু বাইরের দিকে মুখ তুলে-তুলে আপন মালিককে খুঁজছে। কাজকর্মের পর সে কখনো অন্দরে ট্রাংকের উপরেই শুয়ে পড়ত, কখনো বা বাইরে 'কনের' ফুলগাছের কাছে আবার কখনো বা আমগাছের নীচে আঙিনায় বসে পড়ত। শত শত হাজার হাজার হৃদয়ে সে আশ্রয় শীতলতা এনে দিত।

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে আমের দিন চলে যায়। আঙিনা থেকে বাইরের দরজা খুললে দেখা যায় কুমারী আর নববিবাহিতা মেয়েরা দোলনায় দোল দিতে দিতে গাইছে— 'আমের শাখায় দোলনা কে বাঁধল'— আবার গানের তালের অনুসরণে দুলতে থাকে আর দোল দিতে থাকে— আর যদি চারজন একত্র হয় তো লুকোচুরি খেলে। প্রৌঢ়া আর বুড়ীর দল একদিকে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। ইন্দুর মনে হয়

সে-ও যেন ওদেরই একজন হয়ে গেছে। তখন সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে পড়ে। বাবুজী কাছ দিয়ে যান তো তাকে জাগাতে আর তুলতে একটুও চেষ্টা করেন না, পরন্তু সুযোগ পেয়ে তার সালোয়ার, যার বদলে বউ শাড়ি পরে অ যা হামেশা শাশুড়ীর পুরানো চন্দন কাঠের সিন্দুকে তুলে রাখে, ত তুলে নিয়ে খুঁটিতে টাঙিয়ে দেন। এই কাজে তাঁকে সব নজ য় চলতে হয়; কিন্তু যখন সালোয়ার গুছিয়ে তুলতে গিয়ে তাঁ জের নীচের কোণে বধূর চোলীর উপর গিয়ে পড়ে, তখন তাঁর সাহস চলে যেত আর তিনি শীঘ্র-শীঘ্র ঘর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যেতেন— যেন কোনো সাপের বাচ্চা গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে। তারপর বারান্দা থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যেত— 'ওম্ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'।

আশপাশের মহিলারা বাবুজীর পুত্রবধূর সৌন্দর্যের বর্ণনা অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিল। কোনো মহিলা বাবুজীর সামনে বধূর সৌন্দর্যের আর সুডৌল শরীরের প্রশংসা করলে তিনি খুশিতে ফেটে পড়ে বলেন—'আমীচন্দের মা, আমি তো ধন্য হয়ে গেলাম। ঈশ্বরের দয়া, আমার ঘরে এক স্বাস্থ্যবতী মেয়ে এসেছে।' আর এ-কথায় তাঁর নজর অনেক দূর চলে যায় যেদিকে অসুখ, ওষুধের শিশি, হাসপাতালের— সিঁড়ি আর পিপড়ের গর্ত। নজর কাছে এলে তিনি মোটাসোটা ভরাশরীর বাচ্চাদের বগলে, কাঁধে, ঘাড়ে চড়বার-নামবার অনুভূতিতে ভরে ওঠেন আর তাঁর মনে হয় আরো বাচ্চা আসছে। পাশে শুয়ে-থাকা বউয়ের কোমর মাটির সঙ্গে মিশে যায় আর কনুই ছাদের সঙ্গে লেগে যায় আর তাদের বাচ্চাদের বয়সের মধ্যে কোনো তফাত থাকে না। কেউ বড়ো নয় কেউ ছোটো নয়, সবাই একসঙ্গে জোড়া-জোড়া··· 'নমামি, ওম্ নমো ভগবতে···'

আশপাশের সব লোক জেনে গিয়েছিল যে ইন্দু বাবুজীর স্নেহের পুত্রবধূ। দুধ আর ঘোলের ভাঁড় ধনীরামের ঘরে আসতে থাকে। একদিন সলামদীন গুজর ফরমায়েশ করে দেয়। ইন্দুকে বলে— 'বিবি, আমার ছেলেটাকে আর. এম. এস.-এ কুলীর কাজে রাখিয়ে

দাও, আল্লা তোমাকে সুফল দেবেন। ইন্দুর ইশারায় কিছুদিনের মধ্যে সলামদীনের ছেলে কুলী হয়ে গেল— সে সর্টার হতে পারল না, তার ভাগ্য।

পুত্রবধূর খাওয়া-দাওয়া আর স্বাস্থ্যের প্রতি বাবুজী নিজেই খেয়াল রাখতেন। ইন্দু দুধ অপছন্দ করত। তিনি রাতের বেলা নিজেই বাটিতে দুধ ফেটিয়ে গেলাসে ঢেলে বধূকে খাওয়াবার জন্যে তার খাটিয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন। ইন্দু নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসত আর বলত— 'না বাবুজী, আমার দুধ খেতে ভালো লাগে না'···

'তোর শ্বশুরও তো খাবে।' তিনি মজা করে বলতেন।

'তা হলে আপনিই খেয়ে নিন না।' ইন্দু হেসে জবাব দিত আর বাবুজী ছদ্মরোষে ফেটে পড়তেন— 'তুই চাস যে পরে তোরও ঐ অবস্থা হোক যা তোর শাশুড়ীর হয়েছিল?'

'হুঁ···হুঁ···' ইন্দু অভিমান করত। আর অভিমান কেনই বা না করবে। তারাই অভিমান করে না যাদের অনুনয় করে ভোলাবার কেউ নেই। কিন্তু এখানে তো অনুনয়কারী সবাই, অভিমানকারী কেবল একজন। যখন ইন্দু বাবুজীর হাত থেকে গেলাস নিত না তখন উনি খাটিয়ার পাশে শিয়রের নীচে তা রেখে দিতেন— আর— 'নে, এখানে রইল— তোর মর্জি হয় তো খা— না হয় তো খাস না—' বলে চলে যেতেন।

আপন বিছানায় পৌঁছে ধনীরাম দুলারীর সঙ্গে খেলা করতেন। দুলারী বাবুজীর খালি গায়ে গা লাগিয়ে ঘষত আর তাঁর পেটের উপর মুখ লাগিয়ে ফু-ফু করত,— এটাই তার অভ্যাস ছিল। আজ যখন বাবুজী আর খুকি এই খেলা খেলছিল আর হাসছিল, তখন খুকি বউদির দিকে তাকিয়ে বলল— 'দুধ নষ্ট হয়ে যাবে বাবুজী, বউদি তো খাচ্ছে না।'

'খাবে, নিশ্চয় খাবে বেটা', বাবুজী অন্য হাতে পাশীকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে নিতে বললেন—

'মেয়েরা ঘরের কোনো জিনিস নষ্ট হওয়া দেখতে পারে না···' এই

মন্তব্য বাবুজীর মুখ থেকে শোনা যেত। আর অন্যদিক থেকে 'হুশ্-শ্...ভাত্তারখাগী' এই আওয়াজ শোনা যেত। জানা যেত যে বধূ বিড়াল তাড়াচ্ছে— আর কেউ গট্ গট্ করে শুনিয়ে দিত আর সবাই জেনে নিত যে বধূ-বৌদি দুধ খেয়ে নিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে কুন্দন বাবুজীর কাছে এসে বলত—

'বুজী...বৌদি কাঁদছে।'

'হায়।' বাবুজী বলে ওঠেন আর উঠে পড়ে আঁধারে সেইদিকে তাকিয়ে দেখেন যেদিকে বধূর চারপাই রয়েছে। কিছুক্ষণ সেখানেই বসে থাকার পর তিনি ফের শুয়ে পড়েন আর কিছু বুঝে নিয়ে কুন্দনকে বলেন— 'যা...তুই ঘুমিয়ে পড়, সে নিজে নিজেই ঘুমিয়ে পড়বে'।

তারপর শুয়ে পড়ে বাবু ধনীরাম পরামাত্মার পুষ্পশোভিত বাগান দেখতে থাকেন আর আপনার মনে ভগবানকে শুধোন—' 'রূপোর মতো এইসব খুলে-যাওয়া বন্ধ-হয়ে-যাওয়া ফুলের মধ্যে আমার ফুল কোথায়?' সারা আকাশ তাঁর কাছে এক বেদনার নদী রূপে দেখা দেয় আর দু'কানে অনবরত হায় হায় আওয়াজ ধ্বনিত হয়, তা শুনতে শুনতে তিনি বলে ওঠেন—

'যেদিন থেকে দুনিয়া তৈরি হয়েছে সেদিন থেকে মানুষ কত কেঁদেছে।'

তারপর কাঁদতে-কাঁদতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

ইন্দুর যাবার বিশ-পাঁচিশ দিনের মধ্যেই মদন ঝামেলা শুরু করে দেয়। সে লিখল— 'বাজারের রুটি খেতে খেতে আমার বিরক্তি ধরে গেছে। আমার কোষ্ঠবদ্ধতা হয়েছে। তলপেটে বেদনা শুরু হয়েছে।' তারপর যেমনভাবে দফতরের লোক ছুটির জন্য সার্টিফিকেট পেশ করে তেমনভাবে মদন বাবুজীর এক দোস্তের সমর্থন-প্রাপ্ত চিঠি লিখিয়ে নিয়ে পাঠিয়ে দিল। তাতেও যখন কিছু হল না তখন এক ডবল তার— জবাবী টেলিগ্রাম।

জবাবী তারের পয়সা মারা গেল কিন্তু তাতে কী। ইন্দু আর

বাচ্চারা ফিরে এল। মদন দুদিন ইন্দুর সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলে নি। এর দুঃখ ইন্দুরই হয়েছিল। একদিন মদনকে একলা পেয়ে ধরে নিয়ে বসিয়েছিল আর বলেছিল— 'এত মুখ ফুলিয়ে বসে আছ। আমি কী করেছি?'

মদন নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল— 'ছাড়— দূর হয়ে যা হতচ্ছাড়ী আমার চোখের সামনে থেকে...'

'এই কথা বলার জন্যে এত দূর থেকে ডেকে নিয়ে এলে?'

'হাঁ।'

'ছাড়ো এ-সব।'

'খবরদার— এ-সব তোমার তৈরি-করা ঘটনা। তুমি যদি আসতে চাইতে তা হলে বাবুজী কি থামিয়ে দিত?'

ইন্দু বিবশতার সঙ্গে বলল— 'হায় জী, তুমি তো বাচ্চাদের মতো কথা বলছ। আমি নিজের থেকে কী করে ওকে এ কথা বলি? সত্যি কথা জানতে চাও তো বলি, আমাকে ডেকে নিয়ে এসে তুমি বাবুজীর উপর বড় জুলুম করলে।'

'মতলবটা কী?'

'মতলব কিছু নেই— বাচ্চাদের প্রতি ওঁর হৃদয়ের খুব আসক্তি জন্মেছিল...'

'আর আমার হৃদয়?'

'তোমার হৃদয়? তুমি তো কোথাও আসক্তি জন্মাতে পারো।' ইন্দু বদমায়েশী করে বলল আর মদনের প্রতি এমনভাবে তাকিয়ে দেখল যে ইন্দুর কাছ থেকে মদনের নিজেকে দূরে রাখার সব ক্ষমতাই শেষ হয়ে গেল। সেও কোনো নিপুণ ছলের খোঁজে ছিল।

সে ইন্দুকে ধরে নিজের বুকে টেনে নিল আর বলল—

'বাবুজী তোমার প্রতি খুব প্রসন্ন ছিলেন?'

'হাঁ', ইন্দু বলল— 'একদিন আমি জেগে দেখি শিয়রে দাঁড়িয়ে উনি আমাকে দেখছেন।'

'এ হতে পারে না।'

'আমি কসম খেয়ে বলছি।'

'নিজের না, আমার কসম খেয়ে বলো।'

'তোমার কসম তো আমি খাই না··· অপরে যাই দিক।'

'হঁা', মদন ভেবে বলল— 'বইতে একে বলে সেক্স।'

'সেক্স ?' ইন্দু শুধাল— 'সেটা কী ব্যাপার ?'

'ওই ব্যাপার যা পুরুষ আর মেয়েমানুষের মধ্যে হয়।'

'হায় রাম!' ইন্দু একদম পিছু হটে গিয়ে বলল— 'নোংরা কোথাকার! বাবুজীর সম্পর্কে এরকম কথা ভাবতে পারো, তোমার লজ্জা হয় না ?'

'তোমাকে দেখতে বাবুজীর লজ্জা হয় না ?'

'কেন ?' ইন্দু বাবুজীর পক্ষ নিয়ে বলল— 'তিনি নিজের পুত্র-বধূকে দেখে খুশি হয়েছিলেন।

'কেন নয় ? যখন তোমার মতো সুন্দরী পুত্রবধূ ?'

'তোমার মন নোংরা', ইন্দু ঘৃণার সঙ্গে বলল— 'এই কারণে তো তোমার কারবারও হল দুর্গন্ধ বিরোজার। তোমার বইপত্র সব দুর্গন্ধে ভরা! তুমি আর তোমার বইপত্র এ ছাড়া আর কিছু দেখতে পারে না। আমি যখন বড় হয়ে গেলাম তখন আমার বাবা আমাকে অনেক বেশি আদর করতে শুরু করেছিলেন। তা হলে কি তিনিও··· ছিলেন সেই হতভাগা যার নাম তুমি এখনি নিচ্ছিলে।' ইন্দু ফের বলল— 'বাবুজীকে এখানে আনিয়ে নাও। ওখানে তাঁর ভাল লাগছে না তিনি দুঃখী হলে তুমি কি দুঃখী হবে না ?'

মদন তার বাবাকে খুবই ভালোবাসত। সংসারে মায়ের মৃত্যুর পর মদনের বড় হবার ফলে সব চেয়ে বেশি কার্যকর প্রভাব তাঁরই ছিল। সে-কথা মদনের ভালোরকমই মনে ছিল। মায়ের রোগের শুরু থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সব-কিছু যখনি মদনের মনে পড়ে যেত তখনি সে চোখ বুজে প্রার্থনা শুরু করে দিতে— 'ওম্ নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম্ নমো···' এখন সে চাইছিল না যে বাপের ছত্রছায়া তার মাথার উপর থেকে সরে যায়। বিশেষত এই কারণে যে সে এখন পর্যন্ত

তার কারবার জমাতে পারে নি। সে অবিশ্বাসের কণ্ঠে ইন্দুকে কেবল এ কথাই বলেছিল— 'এখন বাবুজীকে ওখানেই থাকতে দাও। বিয়ের পর এই প্রথম আমরা দুজনে খুশিমতো এক সঙ্গে মিলতে পেরেছি।'

তৃতীয়-চতুর্থ দিনে বাবুজীর অশ্রুসিক্ত চিঠি এল। 'আমার স্নেহের মদন' সম্বোধনে 'আমার স্নেহের' শব্দ চোখের জলে ধুয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন— 'বউমা এখানে থাকায় আমার পুরনো দিনগুলি ফিরে এসেছিল— তোমার মায়ের দিন, যখন আমাদের নোতুন বিয়ে হয়েছিল তখন সেও ঐরকম বেপরোয়া ছিল। এইভাবেই ছেড়ে-ফেলা কাপড় এদিকে-ওদিকে ফেলে দিত আর আমার পিতাজী তা গুছিয়ে তুলতেন। সেই তো মদনের সিন্দুক, সেই তো হাজার শান্তি···আমি বাজারে যাই, আমি, কিছু নয় তো দইবড়া আর রাবড়ী কিনে নিয়ে আসি। এখন ঘরে কেউ নেই। যেখানে চন্দনকাঠের সিন্দুক ছিল সে-জায়গা খালি পড়ে আছে···' তারপর এক-আধ ছত্র ফের ধুয়ে গেছে। শেষে লিখেছেন— 'দফতর থেকে ফেরার পর এখানকার বড় বড় আঁধার কামরায় ফিরে এলে আমার মনের মধ্যে বমির মতো ভাব ওঠে···আর— বৌমার যত্ন কোরো। তাকে কোনো যে-সে দাইয়ের হাতে সঁপে দিয়ো না।'

ইন্দু দুই হাতে চিঠি টেনে নিল। দম নিয়ে চোখ টান করে, লজ্জায় গলে যেতে যেতে বলল— 'আমি মরে গেলাম। বাবুজী কী করে বুঝতে পারলেন?'

মদন চিঠিটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল— 'বাবুজী কি বাচ্চা ছেলে? দুনিয়া দেখেছেন, আমাদের জন্ম দিয়েছেন···'

'হঁ্যা।' ইন্দু বলল— 'এখন কত দিনই হল?'

তারপর সে পেটের উপর তীক্ষ্ণ নজর দিল। এখনো বাড়তে শুরুই করে নি, কিন্তু এর মধ্যেই বাবুজী আর কোনো কোনো মানুষ তা দেখতে পেয়েছে। সে তার শাড়ির আঁচল পেটের উপর টেনে নিয়ে কিছু ভাবতে লাগল। তার দেহে এক চমক এল, সে বলল—

'তোমার শ্বশুরবাড়ি থেকে শির্নী আসবে।'

'আমার শ্বশুরবাড়ি?··· ও হাঁ।' মদন পথ খুঁজে পেয়ে বলল— 'কী লজ্জার কথা! এই ছ-আট মাস মাত্র বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যেই চলে এল'— আর হেসে ইন্দুর পেটের দিকে ইশারা করল।

'চলে এসেছে না তুমি নিয়ে এসেছ?'

'তুমি···সব অপরাধ তোমার। কিছু কিছু মেয়েছেলে এরকমই হয়ে থাকে···।'

'তোমার পছন্দ নয়?'

'একেবারে নয়।'

'কেন?'

'জীবনের কয়েক দিন তো মজা করে নেওয়া যাক।'

'কেন এ বুঝি জীবনের মজা নয়?' ইন্দু দুঃখভরা কণ্ঠে বলল— 'পুরুষমানুষ বিয়ে করে কিসের জন্যে? ভগবানের কাছে বিনা প্রার্থনায় তিনি দিয়েছেন বলেই না? যার ছেলেপুলে হয় না তাকে শুধাও। সে কী না করে? পীর, ফকিরের কাছে যায়। সমাধি, মাজারের উপর পিঁপড়েদের খাওয়ায়, লজ্জা-হায়া ছেড়ে, নদীর তীরে উলঙ্গ হয়ে শরডাঁটা কাটে, শ্মশানে মশান জাগায়··· '

'আচ্ছা, আচ্ছা।' মদন বলল— 'তুমি তো ব্যাখ্যান শুরু করে দিলে···জীবন কি কেবল বাচ্চার জন্যই?'

'হবে তো', ইন্দু বিষণ্ণভাবে আঙুল তুলে বলল— 'তখন তুমি তাকে ছোঁবে না। সে তোমার নয়, আমার হবে। তোমার তাকে দরকার নেই, কিন্তু তার ঠাকুরদাদার খুব দরকার আছে। এ কথা আমি জানি···।'

আবার কিছুটা শ্রান্ত, কিছুটা দুঃখিত হয়ে ইন্দু দুই হাতে তার মুখ ঢাকল। সে ভাবছিল যে তার পেটের মধ্যে এই ছোট্ট প্রাণটিকে পালনের ব্যাপারে তার আপন লোক কেউ থাকলে কিছুটা দরদের সঙ্গে তাকে দেখবে। কিন্তু মদন চুপচাপ বসেছিল। তার মুখ থেকে একটি শব্দও বেরোল না। ইন্দু মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে মদনের

দিকে তাকিয়ে দেখল আর ভাবী প্রথম সন্তানবতীর ঢঙে বলল— 'যা-কিছু আমি বলেছি তা তো পরে হবে, তার আগে দেখ, আমি তো আর বাঁচব না···ছোটবেলা থেকেই একথা আমার মনের মধ্যে আছে···'

মদন ভয় খেয়ে গেল। এই 'সুন্দর চীজ' গর্ভবতী হবার পর আরো সুন্দর হয়েছে— এ মরে যাবে ? সে পিছন দিক থেকে ইন্দুকে ধরে ফেলে টেনে নিজের দু হাতের মধ্যে নিয়ে এসে বলল—'তোমার কিছু হবে না ইন্দু··· তোমাকে আমি মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসব···এখন সাবিত্রী নয়···সত্যবানেরই সাধনা—'

মদনের সঙ্গে মিশে গিয়ে ইন্দু ভুলে গেল তার নিজের কোনো দুঃখ আছে···

তার পরে বাবুজী আর কোনো চিঠি লেখেন নি। হঠাৎ সাহারানপুর থেকে এক সর্টার এল। সে কেবল এ কথাই জানাল যে বাবুজীর ফের হার্ট-অ্যাটাক হয়েছে। এক আক্রমণে তিনি প্রায় মরেই যাচ্ছিলেন। মদন ভয় খেয়ে গেল। ইন্দু কাঁদতে লাগল। সর্টার চলে যাবার পরে হামেশাই মদন চোখ বুঁজে মনে মনে পড়তে থাকে— 'ওম নমো ভগবতে···' পরের দিন মদন বাপকে চিঠি লিখল— 'বাবুজী চলে আসুন। বাচ্চারা আপনার কথা খুব মনে করে, আপনার বৌমাও—' কিন্তু চাকরি তো আছে। এটা কি নিজের আয়ত্তে ছিল ? ধনীরামের পত্র অনুসারে সে ছুটির বন্দোবস্ত করছিল। তাঁর ব্যাপারে মদনের অপরাধবোধ বাড়তে শুরু করল। আমি যদি ইন্দুকে থাকতে দিতাম তা হলে আমার কী ক্ষতি হত ?'

বিজয়া দশমীর আগের রাতে মদন ছটফট করতে করতে মাঝের কামরার বাইরে বারান্দায় টহল দিচ্ছিল। তখনি ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ এল আর সে চমকে উঠে দরজার দিকে দৌড়ল। বেগম দাই বাইরে এসে বলল—

'বাবুজী খুশি হও···ছেলে হয়েছে।'

'ছেলে ?' মদন বলল। উদ্‌বেগের স্বরে ফের বলল— 'বউ কেমন আছে ?'

বেগম বলল— 'ভগবানের দয়ায় ভালো আছে। এখন পর্যন্ত প্রসূতিকে ভালো রেখেছেন। পেটের ছেলে বেশি খুশি হয়ে গেলে ওর পেটের ফুল পড়ত না...'

'ও।' মদন বোকার মতো চোখ মিটকে বলল, আবার কামরার দিকে যাবার জন্যে এগোল। বেগম ওকে সেখানেই থামিয়ে দিয়ে বলল— 'অন্দরে তোমার কী কাজ ?' তারপর হঠাৎ দরজা বন্ধ করে চট্‌ করে ভিতরে চলে গেল।

এখন পর্যন্ত মদনের পা কাঁপছিল। ভয়ের জন্য নয়, সান্ত্বনায়, আর বোধ হয় এজন্য যে, যখন এই দুনিয়ায় কোনো আগন্তুক আসে তো আশেপাশের লোকের এই অবস্থাই হয়। মদন শুনেছিল যে যখন ছেলে হয় তখন ঘরের দরজা আর দেয়াল কাঁপতে থাকে। তখন ভয় হয় যে বড় হয়ে ঐ ছেলে আমাকে বেচে দেবে না রাখবে। মদন অনুভব করল যেন সত্যিসত্যি দেয়ালগুলি কাঁপছে। সূতিকাঘরে চকলী-বৌদি আসে নি, কারণ তার নিজের বাচ্চা খুবই ছোট ছিল। হাঁ, দরিয়াবাদী পিসি অবশ্যই পৌঁচেছিল। বাচ্চার জন্মের সময় সে রাম-রাম রাম-রাম রটনা করতে লাগল। এখন ঐ রটনা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে গেল।

সারা জীবনে আর কখনো মদনের নিজেকে এত ব্যর্থ আর বেকার বলে মনে হয় নি। এর মধ্যে ফের দরজা খুলে পিসি বেরিয়ে এসেছিল। বারান্দায় বিজলীবাত্তির মৃদু আলোয় তার চেহারা ভূতের চেহারার মতো একদম দুধ-শাদা দেখাচ্ছিল। মদন তার পথ আগলে বলল—

'পিসি, ইন্দু ঠিক আছে, না ?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে।' পিসি তিন-চারবার বলে নিজের কম্পিত হাত মদনের মাথায় রেখে তাকে নামিয়ে আনল, চুমু খেল আর দ্রুত বাইরে চলে গেল।

বারান্দার দরজা থেকে পিসিকে বাইরে যেতে দেখা গেল। সে বৈঠকখানায় পৌঁছল, সেখানে বাকি বাচ্চারা ঘুমিয়েছিল। পিসি এক এক করে প্রত্যেকের মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিল, তারপর ছাদের দিকে চোখ তুলে কিছু বলল, তারপর শ্রান্ত হয়ে খুকির পাশে শুয়ে পড়ল। উপর থেকে নীচে, তার দুটি ঠোঁটের ওঠা-নামা থেকে বুঝা যাচ্ছিল সে কেমন করে কাঁদছিল···মদন বিস্মিত হল···পিসি তো অনেক জায়গায় দিন কাটিয়েছে, তবে কেন আজ তার আত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠছে?

আবার ওদিকের কামরা থেকে ধুনোর গন্ধ বাইরে এল। ধোঁয়ার এক ঝোঁকা এল, তা মদনকে ছেয়ে ফেলল। তার মাথা ঘুরে গেল। তখন বেগম দাই কাপড়ে কিছু জড়িয়ে নিয়ে বাইরে বেরোল। মদন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তার খেয়াল ছিল না সে কোথায় রয়েছে। দু চোখ খুলে তাকিয়েছিল কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। এর মধ্যে ইন্দুর এক মরার মতো আর্তনাদ ভেসে এল— 'হা—য়' আবার ফের বাচ্চার কান্নার শব্দ।

তিন-চার দিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটল। মদন ঘরের এক দিকে গর্ত খুঁড়ে ফুল পুঁতে ফেলল। অন্দরে কুকুরগুলিকে আসতে বাধা দিল। কিন্তু তার কিছুই খেয়াল ছিল না। তার এই মনে হয়েছিল যে ধুনোর গন্ধ মাথায় ঢুকে যাবার পর আজই তার হুঁশ ফিরে এল। কামরায় একা সে ছিল আর ছিল ইন্দু— নন্দ আর যশোদা— আর অন্যদিকে ছিল নন্দলাল···ইন্দু বাচ্চার দিকে তাকিয়ে দেখে জানবার চেষ্টায় বলল— 'একেবারে ঠিক তোমার মতই হয়েছে...'

'হতে পারে।' মদন বাচ্চার দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল— 'আমি তো বলছি এ হল ভগবানের দয়া। তুমি বেঁচে গেছ।'

'হাঁ', ইন্দু বলল— 'আমি তো বুঝেছিলাম...'

'শুভ-শুভ বলো', মদন একদম ইন্দুর কথা কেটে দিয়ে বলল— 'এখানে যা-কিছু হবার হয়েছে, আমি তো তোমার কাছে আসব না।'

এ কথা বলে মদন দাঁতের তলায় কথা চেপে নিল।

'চুপ করো।' ইন্দু বলল।

মদন তা শুনে দু হাতে কান চেপে ধরল আর ইন্দু হাল্‌কা আওয়াজে হাসতে লাগল।

ছেলে হবার পর কয়েকদিন পর্যন্ত ইন্দুর নাভি ঠিক জায়গায় আসে নি। সে ফিরে ফিরে ঐ বাচ্চার এমন তদারকি করছিল যে এর পরেও বাইরের দুনিয়ায় গিয়ে নিজের আসল মাকে ভুলে গিয়েছিল।

এখন সব-কিছু ঠিক হয়ে গেল আর ইন্দু শান্তির সঙ্গে এই দুনিয়াকে দেখছিল। মনে হয়েছিল সে কেবল মদনের নয়, দুনিয়াভর সকল অপরাধীকে মাফ করে দিয়েছে, আর এখন দেবী হয়ে গিয়ে লোকের ভালো হবার ওষুধ আর করুণা বিতরণ করছে। মদন ইন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল— এই-সব রক্তস্রাবের পর ইন্দু কিছু দুর্বল হয়ে গিয়ে তাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। হঠাৎ ইন্দুর দু হাত নিজের বুকের উপর রাখল।

'কী হল?' মদন শুধাল।

'কিছু না।' ইন্দু কিছুটা উঠে বসবার চেষ্টা করে বলল— 'ওর খিদে পেয়েছে।' আর বাচ্চার দিকে ইশারা করল।

'এর—খিদে?'— মদন একবার বাচ্চার দিকে দেখে ইন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল— 'তুমি কী করে জানলে?'

'দেখছ না', ইন্দু নিচের দিকে নজর রেখে বলল— 'সব ভিজে গেল।'

মদন সতর্কভাবে ইন্দুর ঢিলে-ঢালা বুকের দিকে তাকাল। দুটি স্তনই দুধে ভরে আছে আর এক বিশেষ-প্রকার গন্ধ আসছে। ইন্দু বাচ্চার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল—

'ওকে আমার কাছে দিয়ে দাও।'

মদন কড়াইয়ের আগুনের দিকে হাত বাড়িয়ে তার তাপ নিয়ে নিল। তারপর কিছুটা সাহসের সঙ্গে এগিয়ে বাচ্চাকে তুলে নিল যেন একটা মরা ইঁদুর। শেষ পর্যন্ত ইন্দুর কোলে বাচ্চাকে তুলে

দিল। ইন্দু মদনের দিকে তাকিয়ে বলল— 'তুমি বাইরে যাও।'

'কেন? বাইরে কেন যাব?' মদন শুধাল।

'যাও না…' ইন্দু কিছু গর্বের সঙ্গে, কিছুটা লজ্জিত হয়ে বলল— 'তোমার সামনে আমি বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে পারব না।'

'আরে?' মদন বিস্ময়ের সঙ্গে বলল— 'আমার সামনে খাওয়াতে পারবে না?' তারপর অবুঝভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বাইরের দিকে চলে গেল। দরজার কাছাকাছি পৌঁছে সে ঘুরে ইন্দুর দিকে নজর দিল— আজ পর্যন্ত ইন্দুকে এত সুন্দর লাগেনি।

বাবু ধনীরাম ছুটিতে বাড়িতে ফিরে এলেন। তাঁকে আগের তুলনায় আধখানা দেখাচ্ছিল। যখন ইন্দু তাঁর কোলে বাচ্চাকে তুলে দিল তখন উনি খুশি হয়ে উঠলেন। তাঁর পেটের ভিতরে এমন কোনো ফোড়া হয়েছিল যা চব্বিশ ঘণ্টা তাঁকে শূলের উপর চড়িয়ে রাখত। যদি বাচ্চা না থাকত তবে বাবুজীর দশগুণ বেশি খারাপ অবস্থা হ'ত।

কয়েকবার চিকিৎসা করা হল। শেষ চিকিৎসায় ডাক্তার বাবুজীকে আধ আনা মাপের পনেরো-বিশটা গুলি রোজ খেতে দিয়েছিলেন। প্রথম দিনই তাঁর এত ঘাম হয়েছিল যে দিনে তিন-চারবার কাপড় বদলাতে হ'ত। প্রতিবার মদন কাপড় খুলে নিয়ে বালটিতে নিঙড়াত। কেবল ঘামেই বাল্তির এক-চতুর্থাংশ ভরে যেত। রাতে তাঁর বমি-বমি ভাব হ'ল আর তিনি চীৎকার করে বললেন—

'বউমা, একটা দাঁতন দাও। জিবের স্বাদ বড় খারাপ লাগছে।' বউমা তাড়াতাড়ি উঠেপড়ে দাঁতন নিয়ে এল। বাবুজী উঠেপড়ে দাঁতন চিবোতে শুরু করলেন, এমন সময় বমি এল, বমির সঙ্গে রক্তও এল। ছেলে তাড়াতাড়ি তাঁকে শিয়রের দিকে শুইয়ে দিল। তাঁর চোখের মণি উল্টে গেল আর কয়েকবার দমকের পরেই তিনি আকাশের ফুলবাগানে পৌঁছে গেলেন, সেখানে তিনি নিজের ফুলটি চিনে নিয়েছিলেন।

বাচ্চার জন্ম হবার পর মোটে বিশ-পঁচিশ দিন হয়েছে। ইন্দু মুখ চাপড়ে কপাল আর বুক চাপড়ে নিজেকে বিবর্ণ করে দিল। মদনের চোখের সামনে ছিল সেই দৃশ্য— যা রোজ তার খেয়ালে নিজের মৃত্যুর পরের দৃশ্য হয়ে উঠেছিল। তফাত এই ছিল যে ইন্দু চুড়ি ভেঙে ফেলার বদলে খুলে রেখে দিয়েছিল। মাথায় ছাই দেয় নি। কিন্তু জমিতে আছড়ে পড়ে সারা শরীরে মাটি লেগে যাওয়ার আর চুল ছড়িয়ে পড়ায় চেহারা ভয়ানক হয়ে গিয়েছিল। 'সবাই দেখ আমি সব হারিয়েছি'-র বদলে 'সবাই দেখ আমরা সব হারিয়েছি'—

ঘরের বাইরের কত বোঝা তার উপর এসে পড়েছিল, তার পুরো আন্দাজ মদনের ছিল না। সকাল থেকেই তার হৃৎপিণ্ড এক লাফে মুখে এসে গিয়েছিল। সে বোধহয় বাঁচতে পারত না যদি সে ঘরের বাইরে নালার ধারে ভিজে মাটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে নিজের হৃদয় নিজের জায়গায় নিয়ে না আসত। ছোট বাচ্চা কুন্দন, খুকি দুলারী আর পাশী এমনই চেঁচাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল পাখির বাসায় শিকরে বাজের আক্রমণে পাখির ছানাগুলি ঠোঁট তুলে চিঁ-চিঁ করছে। যদি কেউ তাদের পাখার নীচে সামলে রাখতে পারে তো সে ইন্দু— নালার ধারে পড়ে থেকে মদন ভাবছিল, এখন তো আমার কাছে এ দুনিয়া শেষ হয়ে গেল! কি, আমি কি আর বাঁচতে পারব? জীবনে আর কোনোদিন হাসতে পারব? সে উঠে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

সিঁড়ির নীচে ছিল স্নানের ঘর। সেখানে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করতে করতে মদন ফের একবার এই কথা মনে মনে আওড়াল: আমি আর কখনো হাসতে পারব?—আর সে খিলখিল করে হাসছিল, যদিও তার বাপের মৃতদেহ তখন পর্যন্ত বৈঠকখানায় পড়েছিল।

বাপকে আগুনে সঁপে দেবার আগে মদন মেজের উপর পড়ে থাকা মৃতদেহের সামনে দণ্ডবতের ভঙ্গিতে শুয়ে পড়েছিল। তার জন্মদাতার কাছে এই ছিল তার শেষ প্রণাম, তখন সে আর কাঁদছিল না। তার এই অবস্থা দেখে শোকের অংশীদার সব আত্মীয়জন, পাড়ার লোক

বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল।

তারপর হিন্দু প্রথা অনুসারে সর্বজ্যেষ্ঠ হবার কারণে মদনকেই চিতায় আগুন দিতে হল। জ্বলন্ত মাথার উপর কপাল-ক্রিয়ার লাঠি মারতে হল। মেয়েছেলেরা বাইরে শ্মশানের কূপের জলে স্নান করে ঘরে ফিরে গেল। যখন মদন ঘরে পৌঁছল তখন সে কাঁপছিল। ধরিত্রী-জননী কিছুক্ষণের জন্য যে শক্তি আপন সন্তানকে দিয়েছিলেন রাত এসে যাবার পর তা বিক্ষিপ্ততায় অবসিত হয়ে গেল···তার কোনো সাহায্য প্রয়োজন ছিল। কোনো এইরকম ভাবনার সাহায্য যা মৃত্যুর চেয়েও বড়। ঐ সময় ধরিত্রী-জননীর কন্যা জনকতনয়া ইন্দু যেন কোনো ঘড়া থেকে জন্ম নিয়ে·ঐ রামকে নিজের দু বাহুর মধ্যে টেনে নিল। ঐ রাতে যদি ইন্দু আপন অস্তিত্ব মদনের উপর উৎসর্গ করে না দিত তবে এত বড় দুঃখ মদনকে ডুবিয়ে দিত।

দশ মাসের মধ্যেই ইন্দুর দ্বিতীয় সন্তান চলে এল। স্ত্রীকে এই নরকের আগুনে ঠেলে দিয়ে মদন নিজের দুঃখ ভুলে গেল। কখনো কখনো তার মনে হয়েছে— আমি যদি বিয়ের পর বাবুজীর কাছ থেকে ইন্দুকে ডেকে নিয়ে না আসতাম,তবে বোধ হয় এত শীঘ্র তিনি মারা যেতেন না। কিন্তু সে বাপের মৃত্যুতে যে লোকসান হয়েছে তা পূরণ করার কাজে লেগে গিয়েছিল। পূর্বে অযত্নের ফলে কারবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার বিষয়ে মদনের বিবশতা চলে গেল।

একদিন বড় ছেলেকে মদনের কাছে রেখে দিয়ে ছোট বাচ্চাকে বুকে নিয়ে ইন্দু বাপের বাড়ি চলে গেল। পরে মুন্না বার বার জিদ করলে সে কখনো তা মেনে নিত, কখনো নিত না। বাপের বাড়ি থেকে ইন্দুর চিঠি এল— 'আমার এখানে আমার ছেলের কান্নার আওয়াজ আসছে। ওকে কেউ মারে না তো...?' মদন বড় বিস্মিত হল, এক মূর্খ অশিক্ষিত স্ত্রীলোক···এরকম কথা কী করে লিখতে পারে? ফের সে নিজেই নিজেকে শুধাল— 'এও বোধ হয় কোনো মুখস্থ-করা কথা।'

এক বছর চলে গেল। কখনো এত আয় হয় নি যে তা দিয়ে কোনো

আয়েশ করা যেতে পারে। কিন্তু সংসার-নির্বাহের মতো আয় নিশ্চয়ই হয়ে যেত। কষ্ট হত তখনি যখন কোনো বড় খরচ সামনে দেখা দিত।···কুন্দনকে স্কুলে ভর্তি করানো আছে, দুলারী মুন্নীকে ভালো দিন দেখে পাঠানো আছে। ঐসময় মদন মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকত, আর ইন্দু এক দিক থেকে এসে মুচকি হেসে বলত—'কেন দুঃখ করছ?' মদন তার দিকে আশাভরা নজরে তাকিয়ে বলত— 'দুঃখী হবে না? কুন্দনের বি. এ. ক্লাসে ভর্তি করানো আছে··· মুন্নী···' ইন্দু ফের হাসত, বলত, 'চলো আমার সঙ্গে'— আর মদন ভেড়ার বাচ্চার মতো ইন্দুর পিছনে পিছনে যেত। ইন্দু চন্দনের সিন্দুকের কাছে পৌঁছত। ঐ সিন্দুকে মদন সমেত কারুরই হাত দেবার অনুমতি ছিল না। কখনো কখনো এই বিষয়ে ক্ষেপে গিয়ে মদন বলত— 'মরবে তো ঐ সিন্দুক বুকে করে নিয়ে যাবে', আর ইন্দু বলত— 'হাঁ, নিয়ে যাব।' তারপর ঐ সিন্দুক থেকে প্রয়োজন মতো অর্থ বার করে সামনে রাখত।

'এ টাকা কোথা থেকে এল?'

'কোথাও-না-কোথাও থেকে এসেছে···তোমার আম খাওয়ার মতলব আছে কি···'

'তারপর?'

'তুমি যাও, নিজের কাজ করো।'

আর যখন মদন বেশি জিদ করত তখন ইন্দু বলত— 'আমি এক শেঠকে বন্ধু বানিয়েছি না···' বলে হাসতে শুরু করত। এ কথা মিথ্যা জেনেও মদনের এই মজা ভালো লাগত না। ইন্দু ফের বলত— 'আমি চোর ডাকাত···তুমি জান না, খুব বড় ডাকাত— যে এক হাতে লুঠ করে আর অন্য হাতে গরিব-গুর্বোকে দিয়ে দেয়...' এই ভাবেই মুন্নীর বিয়ে হয়ে গেল— এই বিয়েতে এই রকমই লুটের গয়না বিক্রি হয়ে গেল। ঋণ হল আবার তা শোধও হয়ে গেল।

এইভাবেই কুন্দনের বিয়ে হয়ে গেল। এইসব বিয়েতে ইন্দু স্ত্রী-আচার পালন করত আর মায়ের ভূমিকায় দাঁড়াত। আকাশ

থেকে বাবুজী আর মা দেখতেন ও পুষ্প-বৃষ্টি করতেন, যা কারুর নজরে আসত না। তারপর এই হল যে স্বর্গে মা-জী আর বাবুজীর মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেল। মা বাবুজীকে বললেন—'তুমি বউয়ের হাতের রান্না খেয়ে এসেছ, ওর সুখও দেখে এসেছ, আর আমি পোড়াকপালী কিছুই দেখি নি'—আর এই ঝগড়া বিষ্ণু ও শিবের কাছে পৌঁছল। তাঁরা মায়ের পক্ষে রায় দিলেন— আর মা এই মৃত্যুলোকে এসে বউয়ের কোলে আশ্রয় নিলেন— আর এখানে ইন্দুর একটি মেয়ে হল।...

অবশ্য ইন্দু এই ধরনের দেবী ছিল না। যখন কোনো সিদ্ধান্তের কথা হত, ননদ দেবর তো কি, খোদ মদনের সঙ্গেই ঝগড়া করত— মদন সত্যনিষ্ঠার এই পুতুলের উপর রাগ করে তাকে বলত হরিশ্চন্দ্রের বেটি। ইন্দুর কথায় প্যাঁচ সত্ত্বেও সত্য আর ধর্ম দৃঢ়ভাবে থাকত বলে মদন আর পরিবারের বাকি সব লোকের দৃষ্টি ইন্দুর সামনে নিচের দিকে থাকত। ঝগড়া যতই বেড়ে যেত, মদন স্বামী হবার গর্বে ইন্দুর কত কথাই রদ করে দিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলেই শির ঝুঁকিয়ে ইন্দুরই শরণ নিত আর তার কাছে ক্ষমা চাইত।

নতুন-বউদি এলেন। বলতে হলে তিনিও বিবি ছিলেন, কিন্তু ইন্দুকেই সকলে বিবি বলত। তার বিপরীত ছোটবউদি রানী এক বিবি ছিলেন যাকে সকলে বলত কনে বউ। রানীর কারণে ভাইদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে জে· পি· খুড়োর মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল— যার মধ্যে একদিকে মা-বাপের সম্পত্তি আর অন্যদিকে ইন্দুর নিজের তৈরি জিনিসপত্র সব বিক্রি হয়ে গিয়েছিল আর ইন্দু বুকে বেদনা বয়ে থেকে গিয়েছিল।

সব-কিছু পেয়ে যাবার পর আর আলাদা হয়ে গিয়েও কুন্দন আর রানী ঠিকমতো সংসার পাততে না পারায় ইন্দুর নিজের ঘর কিছুদিনের জন্য জমজমাট হয়েছিল।

মেয়েটার জন্মের পর ইন্দুর স্বাস্থ্য আগের মতো ছিল না। মেয়েটা সবসময় ইন্দুর বুকে লেগে থাকত। যখন সবাই ঐ মাংসপিণ্ডের উপর

থূ-থূ করছিল তখন এক ইন্দুই তাকে বুকে নিয়ে ঘুরত, কিন্তু কখনো কখনো নিজেও শ্রান্ত হয়ে পড়ত আর মেয়েটাকে সামনের দোলনায় ফেলে দিয়ে বলত— 'তুই আমাকে বাঁচতে দিবি কি না ?'

আর বাচ্চা মেয়ে চেঁচিয়ে কাঁদত।

মদন ইন্দুকে এড়িয়ে যেত। বিয়ের থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত মদন সেই নারী পায় নি যার সন্ধান সে করছিল। দুর্গন্ধ বিরোজা বেশ বিক্রি হচ্ছিল আর ইন্দুর অজ্ঞাতে মদন অনেক টাকা বাইরে বাইরে খরচ করতে শুরু করেছিল। বাবুজীর মৃত্যুর পর জিজ্ঞেস করবার মতো কেউ ছিল না। পুরো স্বাধীনতা ছিল।

পড়শী সিব্তের মোষ ফের মদনের মুখের কাছে ফোঁস-ফোঁস করছিল, বারবারই ফোঁস-ফোঁস করছিল। বিয়ের রাতের সেই মোষ তো বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার মালিক বেঁচে ছিল। মদন তার সঙ্গে এমন সব জায়গায় যেতে শুরু করেছিল যেখানে আলো আর ছায়া আজব কায়দার মূর্তি বানাত। কোণের দিকে কখনো আঁধারের ত্রিকোণ তৈরি হত, আবার উপরে ফট্ করে আলোর এক চৌকোণ এসে তাকে কেটে দিত। কোনো ছবিই পুরো তৈরি হত না। মনে হত পাশ থেকে এক পাজামা বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে উড়ে গেল। কোনো একটা কোট দর্শকের মুখ পুরোপুরি ঢেকে দিত। যদি কেউ শ্বাস নেবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে তখনি আলোর চৌকোণ এক চৌখুপী হয়ে যেত আর তার মধ্যে এক মূর্তি এসে দাঁড়িয়ে যেত। দর্শক যদি হাত বাড়ায় তবে সে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, আর সেখানে তখন কিছুই থাকে না। পিছনে কোনো কুকুর কাঁদতে থাকে। উপরে তবলার আওয়াজ ঐ কান্নাকে ডুবিয়ে দেয়…

মদন তার কল্পনার আকৃতি পেয়ে গিয়েছিল কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতে মনে হত কোথায় আর্টিস্টের এক ত্রুটিপূর্ণ রেখা রয়ে গেছে। আর হাসির আওয়াজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠত, আর মদন নিখুঁত শিল্পগত ভারসাম্যযুক্ত হাসির খোঁজে হারিয়ে যেত।

ঐ বিষয়ে সিব্তে নিজের বিবির সঙ্গে কথা বলেছিল। তার

বেগম মদনকে আদর্শ স্বামীরূপে সিব্‌তের সামনে পেশ করেছিল। কেবল পেশ করে নি, পরন্তু মুখের উপর ছুঁড়ে মেরেছিল। তাকে (ঐ আদর্শকে) তুলে নিয়ে সিব্‌তে তার বেগমের মুখের উপর ছুঁড়ে মেরেছিল। মনে হচ্ছিল তা কোনো তরমুজের ভিতরের অংশ— তার সুতোগুলি বেগমের নাক, চোখ, কানের উপর লেগে গিয়েছিল। বিস্তর গালি দিতে দিতে বেগম স্মৃতির টুক্‌রি থেকে ঐ সব ভিতরের অংশ আর বিচি তুলে নিয়ে ইন্দুর সাফসুত্‌রো আঙিনায় ছড়িয়ে দিয়েছিল।

এক ইন্দুর বদলে দুই ইন্দু হয়ে গেল। এক তো ছিল ইন্দু নিজেই আর দ্বিতীয় হল এক কম্পিত রেখা— যা ইন্দুর পুরো শরীরকে ঘিরে রেখেছিল আর যা নজরে আসছিল না।

মদন কোথাও গেলে ঘরে ফিরে এসে যেত···স্নান করে ভালো কাপড় পরে, খুশবুদার কিমাম-দেওয়া এক জোড়া মঘাই পান মুখে রেখে...কিন্তু ঐ দিন মদন যখন ঘরে ফিরে এল তখন ইন্দুর চেহারাই অন্য ছিল। সে তার মুখের উপর পাউডার মেখেছিল। গালে লাগিয়েছিল রুজ। লিপস্টিক ছিল না বলে মাথার সিঁদুর দিয়ে ঠোঁট রাঙিয়েছিল আর এমনভাবে চুল বেঁধেছিল যে মদনের নজর তার মুখের উপর আটকে গেল।

'আজ কী ব্যাপার ?' মদন বিস্মিত হয়ে শুধাল।

'কিছু না।' ইন্দু মদনের নজর বাঁচিয়ে বলল— 'আজ অবকাশ মিলেছে।'

বিয়ের পর পনেরো বছর কেটে যাবার পর ইন্দুর আজ অবকাশ মিলেছে আর তাও তখন যখন তার মুখের উপর ছায়া পড়েছে। নাকের উপর এক কালীর মতো রেখা অঙ্কিত হয়ে গেছে আর ব্লাউজের নীচে উন্মুক্ত পেটের কাছে কোমরে চর্বির দু-তিনটে স্তর দেখা যাচ্ছে। আজ ইন্দু এমন সাজগোজ করেছিল যে তার ত্রুটি-গুলির একটাও নজরে না আসে। এইসব সাজ-গোজ, আঁটসাঁটভাবে তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। 'এ হতে পারে না'— মদন ভেবেছিল

আর এ চিন্তা তাকে আঘাতের মত লেগেছিল। সে আর-একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ইন্দুর দিকে দেখেছিল— যেভাবে ঘোড়ার ব্যাপারী কোন নামী ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে দেখে। এখন মাদি ঘোড়া আর লাল লাগামও ছিল— যেখানে যে গলদ্ ছিল মাতালের দৃষ্টিতে তা দেখা যাচ্ছিল না ··· ইন্দু সত্যিসত্যি সুন্দরী ছিল। পনেরো বছর বাদে আজ ফুলোঁ, রশীদা, মিসেস রবার্ট আর তার বোনেরা তার সামনে জল ভরে নিচ্ছে ··· মদনের মনে দয়া এল, আর এল ভয়।

আকাশে কোনো বিশেষ মেঘ ছিল না কিন্তু বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছিল। ঘরের গঙ্গা বাড়তে শুরু করে তার জল কিনারে কিনারে বেরিয়ে পুরো পার্বত্যভূমি আর পার্শ্ববর্তী বসতিগ্রাম আর শহরগুলিকে আপন গ্রাসের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে এই তীব্র গতিতে স্রোত প্রবাহিত হতে থাকলে কৈলাস পর্বতও ডুবে যাবে।··· এদিকে ছোট মেয়েটা কাঁদতে শুরু করল। এমন কান্না সে আজ পর্যন্ত কাঁদে নি।

মদন তার কান্নার আওয়াজে দু চোখ বন্ধ করেছিল, তারপর যখন খুলেছিল তখন বাচ্চা মেয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিল— যুবতী হয়ে। না. না··· ও তো ইন্দু। আপন মায়ের মেয়ে, আপন মেয়ের মা— সে তাকে চোখের কোণে মুচকি হাসি নিয়ে দেখল, ঠোঁটের ফাঁকে হাসি নিয়ে দেখতে থাকল।

এই কামরায় ধুনোর ধোঁয়ায় একদিন মদনের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। আজ খশ্‌খশের সুগন্ধ তাকে পাগল করে দিল। হাল্‌কা বৃষ্টি ভারী বৃষ্টির চেয়ে বিপজ্জনক হয়ে থাকে। এইজন্য বাইরের জল উপরের কোনো কড়িতে পড়ে ইন্দু আর মদনের মাঝখানে টপ্ টপ্ করে পড়তে শুরু করল··· কিন্তু মদন তো মাতাল হয়ে গেছিল। এই নেশায় তার দু চোখ ছোট হয়ে আসছিল আর দ্রুত শ্বাস পড়ছিল— যেন তা মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস ছিল না।

'ইন্দু', মদন বলল··· তার কণ্ঠস্বর বিয়ের রাতের কণ্ঠস্বরের দুই গ্রাম উপরে ছিল আর ইন্দু দূরে দেখতে দেখতে বলল— 'জী', আর

তার আওয়াজ দুই গ্রাম নীচে ছিল··· আজ ছিল চাঁদনি রাতের বদলে অমাবস্যার রাত···

এর পরে মদন ইন্দুর দিকে হাত বাড়ালে ইন্দু নিজেই মদনের সঙ্গে মিশে গেল। ফের মদন আপন হাতে ইন্দুর চিবুক তুলে ধরে দেখছিল, সে কী হারিয়েছে, কী পেয়েছে ? ইন্দু মদনের কালী-হয়ে-যাওয়া মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে দু চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল···

'এ কী ?' মদন চকিত হয়ে বলল—'তোমার দুচোখ ফুলে গেছে।'

'এমনিই।' ইন্দু বলেছিল আর ছোট মেয়ের দিকে ইশারা করে বলেছিল— 'এই হতভাগী আমায় সারা রাত জাগিয়ে রেখেছে···'

মেয়েটা এখন চুপ হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল দম নিয়ে দেখছিল এখন কী হতে পারে ? আকাশ থেকে জল পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মদন ফের সযত্নে ইন্দুর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল— 'হাঁ··· কিন্তু এই অশ্রু ?'

'খুশিতে।' ইন্দু জবাব দিয়েছিল— 'আজকের রাত আমার'— ফের এক অদ্ভুত হাসি হেসে সে মদনকে আঁকড়ে ধরেছিল। এক আনন্দের অনুভূতিতে মদন বলল— 'আজ অনেক বছর পরে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল, ইন্দু। আমি হামেশা চেয়েছিলাম—'

'কিন্তু তুমি তো বল নি।' ইন্দু বলল— 'মনে আছে, বিয়ের রাতে আমি তোমার কাছে কিছু চেয়েছিলাম ?'

'হাঁ'— মদন বলল— 'তোমার দুঃখ আমাকে দাও।'

'তুমি তো আমার কাছে কিছু চাও নি।'

'আমি !' মদন বিস্মিত হয়ে বলল— 'আমি কী চাইব ? আমি যা-কিছু চাইতে পারতাম সবই তুমি আমায় দিয়েছ। আমার আত্মীয়জনের প্রতি ভালোবাসা— তাদের লেখাপড়া, বিয়েশাদী— এই-সব সুন্দর বাচ্চা— এই সব-কিছুই তো তুমি দিয়েছ।'

'আমিও তো তাই বুঝতাম।' ইন্দু বলল— 'কিন্তু এখন আমি জানতে পেরেছি, এই সব নয়।'

'কী বলতে চাইছ ?'

'কিছু না।' ইন্দু থেমে গিয়ে ফের বলল—

'আমি একটা জিনিস রেখেছি।'

'কী জিনিস রেখেছ ?'

ইন্দু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল — 'আমার লজ্জা··· আমার খুশি··· ঐ সময় তুমিও তো বলে দিতে পারতে··· তোমার সুখ আমাকে দাও··· তা হলে আমি···' বলতে বলতে ইন্দুর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

আর কিছুক্ষণ পরে ইন্দু বলল— 'এখন তো আমার কাছে কিছুই রইল না।'

মদনের ধরা-হাত শিথিল হয়ে গেল। সে মাটিতে মিশে গেল— এই অশিক্ষিত স্ত্রীলোক— এ কি কোনো মুখস্থ-করা কথা— ?

না তো··· এ তো এখনি তার সামনে জীবনের ভাঁটি থেকে বেরিয়ে এসেছে। এখন তো তার উপর বারবার হাতুড়ি পড়ছে আর আগুনের ফুল্‌কি চারিদিকে উড়ছে···

কিছুক্ষণ পরে মদনের হুঁশ এসে গেল আর সে বলল— 'আমি বুঝেছি ইন্দু।'

তারপর কাঁদতে কাঁদতে মদন আর ইন্দু পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেল। ইন্দু মদনের হাত ধরে তাকে এমন দুনিয়ায় নিয়ে গেল যেখানে মানুষ মরে গিয়েই পৌঁছতে পারে।

লাজবন্তী

'হথ লাঈয়েঁ। কুম্লান নী···লাজবন্তী দে বুটে' (এ হল লজ্জাবতী লতা, হাত লাগালেই কুঁকড়ে যায়।)

দেশবিভাগ হল আর অসংখ্য আহত লোক উঠে দাঁড়িয়ে আপন মুখ থেকে রক্ত মুছে ফেলল আর ফের সবাই মিলে যার মুখ নিরাপদ তার দিকেই মনোযোগ দিতে থাকল···কিন্তু হৃদয় তো আহত।

গলি-গলিতে মহল্লায়-মহল্লায় 'পুনর্বাসন করাও'-কমিটি তৈরি হয়ে গেল, আর গোড়ায় গোড়ায় অনেক মেহনতের সঙ্গে 'ব্যবসায়ে বসাও', 'জমিতে বসাও' আর 'ঘরে বসাও' প্রোগ্রাম শুরু করে দেওয়া হল। কিন্তু একটি প্রোগ্রাম এমনই ছিল যে-বিষয়ে কেউ মনোযোগ দেয় নি। সেই প্রোগ্রাম অপহৃতা মেয়েদের সম্পর্কে। এর শ্লোগান ছিল 'হৃদয়ে বসাও'। নারায়ণ বাবার মন্দির আর তার চারপাশের বসতিকারী পুরনো বংশানুক্রমিক মানুষদের মধ্যে এই প্রোগ্রাম নিয়ে খুব জোর বিরোধ চলছিল।

এই প্রোগ্রামে গতি সঞ্চারের জন্য মন্দিরের কাছাকাছি মহল্লা 'মুল্লা শকুর'-এ এক কমিটি তৈরি হয়েছিল আর এগারো ভোটের গরিষ্ঠতায় সুন্দরলাল বাবুকে তার সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হয়েছিল। সভাপতি উকিল সায়েব, চৌকী কলার মোহ্‌রার আর মহল্লার অন্যান্য মাতব্বর লোকদের খেয়াল ছিল যে সুন্দরলালের চেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়ে এই কাজ আর কেউ করতে পারবে না। বোধহয় এই কারণে যে সুন্দরলালের আপন পত্নীকে লুঠ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার নাম লাজো— লাজবন্তী।

যখন প্রভাত-ফেরীতে বেরিয়ে সুন্দরলাল বাবু আর তার সাথী রিসালু, নেকীরাম প্রভৃতি মিলে গাইত—'হথ লাইয়েঁ। কুম্লান নী··· লাজবন্তী দে বুটে'— তখন সুন্দরলালের কণ্ঠস্বর একদম বন্ধ হয়ে যেত আর সে চুপচাপ চলতে চলতে লাজবন্তীর সম্পর্কে চিন্তা করত— 'কে

জানে কোথায় আছে, কী অবস্থায় আছে, আমাদের বিষয়ে কী ভাবছে, সে কোনোদিন আসবে কি আসবে না, কে জানে?' আর পাথুরে পথে চলতে চলতে তার পা কাঁপতে থাকত।

আর শেষ পর্যন্ত সে এমনি জায়গায় পৌঁছে গেল যে লাজবন্তীর কথা ভাবাও ছেড়ে দিল। তার দুঃখ এখন দুনিয়ার দুঃখ হয়ে গিয়েছিল। তার আপন দুঃখ থেকে বাঁচার জন্য সে লোকসেবায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও অন্যান্য সাথীদের গানের গলায় গলা মেলাতে মেলাতে তার মনে নিশ্চয়ই এ চিন্তা হয়েছিল— 'মানুষের চিত্ত কত দুর্বল। অল্প কথাতেই তার আঘাত লেগে যায়। সে যেন লজ্জাবতী লতার মতো, তার দিকে হাত বাড়ালেই সে কুঁকড়ে যায়।' কিন্তু সে তার লাজবন্তীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় কোনো ত্রুটি রাখে নি। তার জায়গা-বেজায়গায় ওঠা-বসায়, খাওয়ার বিষয়ে কোনো নজর না রাখায়, আর এইরকমই মামুলি কথায় সুন্দরলাল তাকে ধরে ধরে পিটত।

লাজো ছিল পাতলা শহতূত-শাখার মতো দুর্বল দেহাতী মেয়ে। চড়া রোদের ছোপে তার রঙ শ্যামল হয়ে গিয়েছিল। তার শরীরে ছিল এক অদ্ভুত ধরনের অস্থিরতা। তার চঞ্চলতা ছিল সেই শিশির-বিন্দুর মতো— যা গাছের বড় বড় পাতায় কখনো এদিক কখনো ওদিক গড়িয়ে গড়িয়ে যায়। তার পাতলা-পাতলা ভাব তার খারাপ স্বাস্থ্যের পরিচায়ক ছিল না। তা ছিল স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। তাকে দেখে ভারী-সারি চেহারার সুন্দরলাল ঘাবড়ে গিয়েছিল, কিন্তু যখন সে দেখল লাজো সব রকমের ভারী বোঝা, সব রকমের দুঃখ, এখানকার মার-পিট সহ্য করতে পারে তখন সে তার দুর্ব্যবহার ধীরে ধীরে বাড়িয়েছিল। সীমারেখাটা সে খেয়াল করে নি— যেখানে পৌঁছলে পরে যে-কোনো মানুষেরই ধৈর্য টুটে যেতে পারে। ঐ সীমাকে অস্পষ্ট করে দেবার ব্যাপারে লাজবন্তী সাহায্যকারিণী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ সে বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত খিন্ন হয়ে বসে থাকতে পারত না। এইজন্যে বড় বড় মারপিটের পরে সুন্দরলাল স্রেফ

একবার মুচকি হাসি হাসলেই সে নিজের হাসি চাপতে পারত না। আর এক ঝাপটে তার কাছে চলে আসত আর দু হাতে তার গলা জড়িয়ে বলে উঠত— 'ফের মারবে তো আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না'— তখন বোঝা যেত মার-পিট সব-কিছু সে ভুলে গেছে। গাঁয়ের অন্যান্য মেয়েদের মতোই সে জানত যে পুরুষ-মর্দ এ রকমই ব্যবহার করে থাকে, তাই বলে মেয়েমানুষদের মধ্যে কেউ যদি বিদ্রোহ করে তো মেয়েরা নাকের পরে আঙুল রেখে বলে ওঠে— 'নাও, এও দেখি জোয়ান-মর্দ···মেয়েমানুষ যার কাছে কাবু হয় না···' ঐসব মার-পিট তাদের গানের মধ্যে ঢুকে গেছে। লাজো নিজেই গাইত— 'আমি শহরের ছেলেকে বিয়ে করব না, সে বুটজুতো পরে আর আমার কোমর পাতলা।' কিন্তু প্রথম সুযোগেই লাজো এক শহুরে ছেলের প্রতি আসক্ত হল, তার নাম সুন্দরলাল। সে লাজবন্তীদের গাঁয়ে এক বরযাত্রীদলের সঙ্গে এসেছিল আর বরের কানে-কানে স্রেফ এটুকুই বলেছিল— 'তোর শালী তো খুব নুন-ঝাল মনে হচ্ছে, তোর বিবিও চটপটে হবে'—লাজবন্তী সুন্দরলালের ঐ কথা শুনে ফেলেছিল কিন্তু সে এ কথা ভুলে গেছিল যে সুন্দরলাল কত মোটা আর কুৎসিত বুটজুতো পরে আর তার নিজের কোমর কত পাতলা।

প্রভাত-ফেরীর সময় এই ধরনের সব কথা সুন্দরলালের মনে পড়ে যেত, সে এ কথাও ভাবত— 'একবার, স্রেফ একবার লাজোকে ফিরে পাই তো সত্যিসত্যি ওকে হৃদয়ে বসিয়ে নিই আর লোকজনকে বলে দিই— এই-সব মেয়েদের লুঠ হয়ে যাবার ব্যাপারে এদের কোনো অপরাধ নেই। ধোঁকায় পড়ে পাগলামির শিকার হয়ে যাওয়ায় এদের কোনো দোষ নেই। এই সমাজ নিরপরাধ মেয়েদের মেনে নেয় না। তাদের নিজের করে নেয় না— এই সমাজ পচা-গলা সমাজ আর একে খতম করে দিতে হবে।' এই-সব মেয়েদের ঘরে নেবার উপদেশ সে দিত আর এদের সেই সম্মানদানের প্রেরণা দিত যা ঘরের কোনো মেয়েমানুষকে, কোনো মা, মেয়ে, বোন ও পত্নীকে

দেওয়া হয়ে থাকে। সে আরো বলত— 'তাদের ইশারা আর সংকেতেও এই ধরনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত নয় যে কাদের সঙ্গে তারা ছিল— কারণ তাদের হৃদয় জখম হয়েছে, তারা দুর্বল— লজ্জাবতীর মতো— হাত লাগালেই কুঁকড়ে যায়।'

'হৃদয়ে বসাও' প্রোগ্রামকে ব্যাবহারিক রূপদানের জন্য মোহল্লা 'মুল্লা শকূর'-এর এই কমিটি কয়েকবারই প্রভাতফেরী বার করেছিল। ভোর চারটে-পাঁচটা থেকেই তার জন্য সকলেই তৈরি হয়ে নিত। তখন লোকজনের চীৎকার থাকত না, ট্রাফিকের ঝামেলাও থাকত না। রাতভোর চৌকিদারি-করা কুকুরগুলিও তখন নিভে-যাওয়া তন্দুরের ভিতরে মাথা গুঁজে পড়ে থাকত। আপন আপন শয্যায় শুয়ে থেকে প্রভাতফেরীওলাদের গান শুনে লোক স্রেফ্ এ কথাই বলত— 'ওরা সেই মণ্ডলী'— আবার কখনো ধৈর্য ধরে, কখনো বিরক্ত হয়ে তারা বাবু সুন্দরলালের প্রোপাগাণ্ডা শুনত। যে-সব মেয়েছেলে কড়া পাহারায় সীমান্তের এপারে পৌঁছে গেছে, ফুলকপির মতো ফুটে উঠেছে আর তাদের নিজ নিজ পতি তাদের পাশে ডাঁটার মতো আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে শুয়ে প্রভাতফেরীর চীৎকার সম্পর্কে মন্তব্য করতে থাকে আর মুখে মুখে কিছু গুনগুন করতে থাকে। আবার কোনো কোনো বাচ্চা কিছুক্ষণের জন্য চোখ খোলে আর 'দিলে বসাও'-এর নিবেদনকারী আর দুঃখ-ভরা প্রোপাগাণ্ডাকে স্রেফ এক গান মনে করে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু ভোরের বেলা কানে পৌঁছনো শব্দ ব্যর্থ হয়ে যায় না। সারা দিন সে-কথা ঝগড়ার সঙ্গে মাথার মধ্যে চক্কর দিতে থাকে, আবার কখনো কখনো মানুষ তার অর্থ বুঝতে না পারলেও গুনগুন করতে থাকে। ওই আওয়াজ নিয়ে ঘর করার কারণে যখন মিস্ মৃদুলা সারাভাই হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানের মধ্যে অপহৃতা রমণীদের স্থানান্তরিত করিয়ে আনলেন তখন মোহল্লা 'মুল্লা শকূর'-এর কিছু লোক অপহৃতাদের পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত করল। তাদের আত্মীয়েরা শহরের বাইরে চৌকীকলায় তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে গিয়েছিল। অপহৃতা রমণীরা আর তাদের সাক্ষাৎপ্রার্থীরা কিছুক্ষণ পর্যন্ত একে

অপরের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে নিজ নিজ বিধ্বস্ত ঘরকে ফের বসানোর কাজে এগোল। রিসালু, নেকীরাম আর সুন্দরলাল বাবু কখনো 'মহেন্দ্রসিংহ জিন্দাবাদ', কখনো 'সোহনলাল জিন্দাবাদ' আওয়াজ তুলেছিল··· আর চেঁচাতে চেঁচাতে তাদের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু অপহৃতা রমণীদের মধ্যে এমনও ছিল যাদের পতিরা, যাদের বা-বাপ ভাইবোনেরা তাদের চিনতে অস্বীকার করেছিল। তারা মরে যায় নি কেন? আপন পবিত্রতা আর ইজ্জৎ বাঁচানোর জন্যে তারা বিষ খায় নি কেন? কুয়োতে ঝাঁপ দেয় নি কেন? তারা ছিল ভীরু— এভাবেই তারা জীবনের সঙ্গে লেগে ছিল। শত শত হাজার হাজার রমণী আপন ইজ্জৎ লুণ্ঠিত হবার আগেই প্রাণ দিয়েছিল। কিন্তু তাদের জানা আছে কি তারা বেঁচে থেকে কোন্ বাহাদুরীর কাজ দেখিয়েছে? কী ভাবে পাষাণ-দৃষ্টিতে তারা মৃত্যুর দিকে তাকিয়েছিল। এই দুনিয়াতে তাদের পতিরা তাদের চিনছে না। তাদের মধ্যে কেউ মনে মনেই নিজের নাম আউড়েছিল··· সোহাগবন্তী, সোহাগশালিনী... আর ঐ ভীড়ের মধ্যে নিজের ভাইকে দেখে শেষবারের মতো কেবল এ কথাই বলেছিল— 'বিহারী, তুইও আমাকে চিনতে পারলি না? আমি তোকে কোলে নিয়ে খেলা দিয়েছি রে··· ?' এ কথা শুনে বিহারী চেঁচিয়ে উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু সে মা-বাপের দিকে তাকিয়েছিল আর মা-বাপ আপন হৃদয়ে হাত রেখে নারায়ণ বাবার দিকে তাকিয়েছিল। এবং পুরো বিবশ অবস্থায় নারায়ণবাবা আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। যে আকাশ বাস্তবিকপক্ষে কোনো সত্য রক্ষা করে না আর যা স্রেফ আমাদের দৃষ্টিকে ধোঁকা দেয়, যা স্রেফ এক সীমামাত্র, তাকে ছাড়িয়ে আমাদের নজর চলে না।

কিন্তু ফৌজী ট্রাকে করে সারাভাই স্থানান্তর করিয়ে যে রমণীদের আনলেন তাদের মধ্যে লাজো ছিল না। সুন্দরলাল আশা আর ভয়ের সঙ্গে শেষ মেয়েটিকে ট্রাক থেকে নীচে নামতে দেখল, তারপর

খুব চুপচাপ আর খুব গর্বের সঙ্গে নিজের কমিটির কাজ দ্বিগুণ করে দিল। এখন স্রেফ ভোরবেলা প্রভাত-ফেরীর সময়েই সে বার হয় না, পরন্তু সন্ধ্যাবেলাতেও মিছিল বার করতে লাগল, আর কখনো-কখনো এক-আধটা ছোটখাট সভাও করতে লাগল। এই-সব সভায় কমিটির বুড়ো সভাপতি কালকাপ্রসাদ সুফী ফকিরদের সঙ্গে মিলে-মিশে এক ভাষণ দিতেন আর রিসালু তার কাছে একটা পিকদানি ধরার ডিউটিতে হামেশা হাজির থাকত। লাউড-স্পীকার থেকে অদ্ভুত রকমের আওয়াজ আসত। আর নেকীরাম মোহরার কিছু বলবার জন্যে দাঁড়াত। কিন্তু সে যত-কথাই বলত আর যত শাস্ত্র আর পুরাণের উল্লেখ করত ততটাই সে আপন অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে বলত। ময়দানের শ্রোতারা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সুন্দরলাল বাবু উঠে দাঁড়াত। কিন্তু দুটি বাক্য ছাড়া আর কিছুই বলতে পারত না। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যেত। তার চোখ দিয়ে জল গড়াতে শুরু করত আর কাঁদো কাঁদো হবার ফলে সে ভাষণ দিতে পারত না। শেষে বসে পড়ত। কিন্তু উপস্থিত লোকদের উপর এক অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধতা ছেয়ে যেত আর সুন্দরলাল বাবুর ঐ দু-চার কথার প্রভাব তাদের হৃদয়ের গভীরে চলে যেত। উকিল কালকাপ্রসাদ আর শূফী ফকির-দের সারা উপদেশাত্মক বাণী যুবকদের কাছে ভার বলে মনে হত, কিন্তু অন্য শ্রোতারা সেখানেই কেঁদে ফেলত, আপন আপন চিন্তাকে তৃপ্তি দিত আর শূন্য হৃদয়ে ঘরে ফিরে যেত।

একদিন কমিটির সদস্যরা সন্ধ্যার সময় প্রচার করতে বেরিয়েছিল আর চলতে চলতে পুরনো ধারণাবিশিষ্ট লোকদের মহল্লায় পৌঁছে গিয়েছিল। মন্দিরের বাইরে এক অশ্বত্থ গাছ ছিল, তার চারদিক সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো। সেখানে কয়েকজন শ্রদ্ধালু লোক বসেছিল আর রামায়ণ পাঠ হচ্ছিল। নারায়ণবাবা রামায়ণের ঐ কাহিনী শুনছিলেন যেখানে এক ধোপা তার ধোপানীকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল আর তাকে বলে দিয়েছিল— 'আমি রাজা রামচন্দ্র নই যে এত বছর রাবণের সঙ্গে থাকার পর ফিরে-আসা

সীতাকে ঘরে নিয়েছিল, আবার মহাসতী সীতাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল সেই অবস্থায় যখন সীতা গর্ভবতী ছিলেন'— 'এ ছাড়া রামরাজ্যের আর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় কি··· ?' নারায়ণবাবা শুধিয়েছিলেন— 'এই হল রামরাজ্য যেখানে এক ধোপার কথাও এত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে গ্রহণ করা হয় ···'

কমিটির মিছিল মন্দিরের কাছে থেমে গিয়েছিল ; লোকেরা রামায়ণ কথা আর শ্লোকের বর্ণনা শুনবার জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সুন্দর শেষবাক্য শুনে বলে উঠেছিল—

'বাবা, এইরকম রামরাজ্য আমার চাই না।'

'চুপ করো, তুমি কে হে ?'

'চুপ করো'—ভীড়ের মধ্য থেকে আওয়াজ এল আর সুন্দরলাল এগিয়ে গিয়ে বলল— 'আমার বলা কেউ থামাতে পারবে না···'

ফের মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ এল— 'চুপ করো'— 'আমরা তোমায় বলতে দেব না।'— আর এক-কোণ থেকে এ কথাও শোনা গেল— 'মেরে দেব।'

নারায়ণবাবা খুব মিষ্টি গলায় বললেন— 'সুন্দরলাল, তুমি শাস্ত্রের মান-মর্যাদা বুঝতে পার না।'

সুন্দরলাল বলল— 'বাবা, আমি এক কথা বুঝি— রামরাজ্যে ধোপার কথা শোনা হ'ত, কিন্তু সুন্দরলালের কথা নয়।'

যে-সব লোক এখনি তাকে মারতে উদ্যত হয়েছিল, তারাই নিজেদের পায়ের তলা থেকে অশ্বত্থের ফলগুলি সরিয়ে দিয়ে বসতে বসতে বলে উঠেছিল— 'শোনো, শোনো, শোনো।'

রিসালু আর নেকীরামবাবু সুন্দরলালকে সমর্থন করল আর সুন্দর-লাল বলল—'শ্রীরাম আমাদের নেতা ছিলেন, কিন্তু বাবাজী, এ কী কথা যে তিনি ধোপার কথা সত্য বলে বুঝে নিয়েছিলেন কিন্তু এত বড় মহারাণীর সত্যের উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন নি ?'

নারায়ণবাবু নিজের দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন— 'এই কারণে যে সীতা তাঁর নিজের পত্নী। সুন্দরলাল, তুমি এই

কথার মাহাত্ম্য জানো না…'

'হ্যাঁ বাবা।' সুন্দরলাল বাবু বললেন— 'এই সংসারে অনেক কথাই আছে যা আমার বোধের মধ্যে আসে না…'

'তবে আমি তাকেই সাচ্চা রামরাজ্য বলে বুঝি যেখানে মানুষ নিজের উপরেও জুলুম করতে পারে না…নিজে নিজের উপর অবিচার করা তত বড়ই পাপ যতটা অন্য কারুর উপর অবিচার করা… ভগবান রামচন্দ্র সীতাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলেন এই কারণে যে তিনি রাবণের কাছে থেকে এসেছিলেন…এতে সীতার কী অপরাধ? তিনিও কি আমাদের অনেক মা, অনেক ভগিনীর মতো ছল আর কপটের শিকার ছিলেন না? একি সীতার সত্য আর অসত্যের কথা, না রাক্ষস রাবণের ক্রূরতার কথা— যার দশটা মাথা মানুষের ছিল আর সবচেয়ে বড় মাথাটা ছিল গাধার?…

'আজ আমাদের নির্দোষ সীতাকে ঘর থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে… সীতা লাজবন্তী…' সুন্দরলালবাবু কাঁদতে শুরু করলেন। রিসালু আর নেকীরাম ও আর সকলেই তুলে ধরলেন সব কয়টি লাল পতাকা— সেগুলির উপর আজই স্কুলের ছেলেরা খুব পরিষ্কারভাবে নারা (শ্লোগান) কেটে কেটে সেঁটে দিয়েছিল। তারা সকলেই 'সুন্দরলাল বাবু জিন্দাবাদ' আওয়াজ তুলেছিল— 'মহাসতী সীতা জিন্দাবাদ'…একদিক থেকে আওয়াজ এসেছিল 'শ্রীরামচন্দ্র…'

ফের অনেকরকম আওয়াজ এসেছিল— 'চুপ…চুপ…চুপ।' আর নারায়ণবাবার অনেক মাসের মেহনত ব্যর্থ হয়ে গেল। অনেক লোক মিছিলে যোগ দিয়েছিল। মিছিলের আগে-আগে উকিল কালকা-প্রসাদ আর মোহ্‌রার হুকুম সিং চৌকী কলার দিকে চলছিলেন। নিজেদের পুরনো ছড়ি দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে করতে বিজয়ী আওয়াজ তুলে এগোচ্ছিলেন। আর তাদেরই মাঝখানে কোথাও সুন্দরলাল চলছিল। তার দুচোখে এখন পর্যন্ত অশ্রু বইছিল। আজ তার হৃদয়ে খুব আঘাত লেগেছে। লোকে খুব উৎসাহের সঙ্গে একে অপরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইছিল— 'হথ লাইয়াঁ কুম্লান নী…

লাজবন্তী দে বুটে···'

এখন গানের আওয়াজ লোকের কানে গুঞ্জন করছিল। এখনো ভোর হয় নি আর মোহল্লা 'মুল্লা শূকর'-এর 414 নম্বর বাড়ির বিধবা এখন পর্যন্ত আপন শয্যায় শুয়ে কষ্টে আড়ামোড়া ভাঙছিল। সুন্দরলালের গাঁয়ের প্রতিবেশী লালচন্দকে আপন প্রভাব আর জোর খাটিয়ে সুন্দরলাল আর খলীফা কালকাপ্রসাদ রেশন-দোকান পাইয়ে দিয়েছিলেন।

সেই লালচন্দ দৌড়ে দৌড়ে এসেছিল আর নিজের মোটা চাদর থেকে হাত বার করে ছড়িয়ে দিয়ে বলল—

'সুন্দরলাল, অভিনন্দন নাও।'

সুন্দরলাল কল্‌কেতে রাব-গুড়-মাখা তামাক রাখতে রাখতে বলল—'কোন কথায় অভিনন্দন, লালচন্দ?'

'আমি লাজো-বউদিকে দেখেছি।'

সুন্দরলালের হাত থেকে কল্‌কে পড়ে গেল আর রাব-গুড়-মাখা তামাক মেঝের উপর পড়ে গেল— 'কোথায় দেখেছ?' সে লালচন্দের দু কাঁধ ধরে শুধাল। আর শীঘ্র জবাব না পেয়ে ঝাঁকুনি দিল।

'ওয়াগা সীমান্তে।'

সুন্দরলাল লালচন্দকে ছেড়ে দিয়ে কেবল এটুকুই বলল— 'আর কেউ হবে।'

লালচন্দ নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে বলল— 'না ভাই, সে লাজো, সে লাজো।'

'তুমি ওকে চেনো?' সুন্দরলাল ফের মেঝে থেকে রাব-গুড়-মাখা তামাক তুলে নিল। হাতের চেটোয় রেখে পিষতে পিষতে শুধাল আর তা করতে করতেই রিসালুর কল্‌কে হুঁকো থেকে তুলে নিয়ে বলল—

'ভালো কথা, তুমি তাকে চিনেছ?'

'তার চিবুকে একটা আর গালের উপর আর-একটা উল্‌কি আছে।'

'হাঁ হাঁ হাঁ।' সুন্দরলাল নিজেই বলল— 'কপালের উপর আর-একটা।'

সে চাইছিল না এখন আর-কোনো সন্দেহ থেকে যায়। আর একদম তখনি লাজবন্তীর চেনা শরীরের সব উল্‌কি তার মনে পড়ে গেল। সেগুলি ছোটবেলাতেই লাজবন্তী তার শরীরে আঁকিয়ে নিয়েছিল। সেগুলি হাল্‌কা সবুজ দানার মতো ছিল। লজ্জাবতী লতার মুখের 'পরে যেমন দানা থাকে তেমনি। সেগুলির দিকে আঙুলের ইশারা করলেই তা কুঁকড়ে যেতে থাকে। ঠিক সেগুলির মতোই এই উল্‌কিগুলির দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেই লাজবন্তী লজ্জা পেত— আর হারিয়ে যেত, নিজের মধ্যে কুঁকড়ে যেত। ভাবো, যদি তার সব গোপন কথা অন্য কেউ জেনে ফেলেছে আর কোনো না-জানা রত্নের খোঁজে লুঠ হয়ে যাওয়ায় সে গরিব হয়ে গেছে। সুন্দরলালের সারা শরীর এক অজানা আতঙ্কে, এক অজানা ভালো-বাসায় কম্পিত আর তার পবিত্র অগ্নিতে দগ্ধ হতে লাগল। সে ফের লালচন্দকে ধরে ফেলে শুধিয়েছিল—

'লাজো ওয়াগায় পৌঁছল কী করে?'

লালচন্দ বলেছিল— 'হিন্দুস্থান আর পাকিস্থানের মধ্যে অপহৃতা রমণীদের অদল-বদল হচ্ছিল তো।'

'তারপর কী হল?' সুন্দরলাল উবু হয়ে বসে বলল— 'তারপর কী হল?'

রিসালুও নিজের চারপাইয়ের উপর উঠে বসেছিল আর তামাক-খোরদের অভ্যস্ত কাশি কাশতে কাশতে বলল— 'লজ্জাবতী বউদি সত্যি সত্যি এসে গেছে?'

লালচন্দ নিজের কথার জের টেনে বলল— 'ওয়াগায় পাকিস্তান ষোলোটি মেয়েকে ফেরত দিয়েছে আর বদলে ষোলোটি মেয়েকে ফেরত নিয়েছে— কিন্তু একটা মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আমাদের ভলান্টিয়াররা আপত্তি করেছে যে তোমরা যে-সব মেয়েদের ফেরত দিয়েছ তাদের মধ্যে প্রৌঢ়া, বুড়ি আর বাজে মেয়েছেলেই বেশি আছে। এই উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে লোক জমে গিয়েছে। ঐ সময় ওধারের ভলান্টিয়াররা লাজোবউদিকে দেখিয়ে বলেছে—'তোমরা

একে বুড়ি বলছ ? দেখ ··· দেখ ··· তোমরা যত মেয়েদের ফেরত পাঠিয়েছ তাদের মধ্যে একজনও কি এর সমতুল্য হতে পারে ?' আর সেখানে লাজোবউদি সকলের নজর থেকে নিজের উল্‌কি-গুলিকে লুকিয়ে রাখছিল।

'ফের ঝগড়া বেড়ে গিয়েছিল। দু তরফই আপন-আপন 'মাল' নিয়ে চলে যেতে মনস্থ করেছিল। আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম—'লাজো ··· লাজোবউদি !' কিন্তু আমাদের ফৌজের সিপাহীরা আমাদের মার-মার করে ভাগিয়ে দিয়েছে।'

লালচন্দ তার কনুই দেখিয়েছিল—সেখানে লাঠির বাড়ি পড়েছিল। রিসালু আর নেকীরাম চুপচাপ বসে ছিল আর সুন্দরলাল দূরের দিকে তাকিয়ে ছিল। বোধহয় ভাবছিল। লাজো এসেছিল তবু আসে নি ·· সুন্দরলালের চেহারা দেখেই মনে হচ্ছিল যে সে বিকানেরের মরুভূমি পেরিয়ে এসেছে আর এখন কোনো গাছের ছায়ায় বসে জিব বার করে হাঁপাচ্ছে। তার মুখ দিয়ে কেবল এ কথাই বেরিয়েছিল—'জল দাও'। সে অনুভব করেছিল যে দেশ-বিভাগের আগে আর দেশ-বিভাগের পরে হিংসা এখন পর্যন্ত কাজ করে চলেছে। কেবল তার চেহারা বদলে গেছে। এখন লোকের মধ্যে আগের মতো আড়াল নেই। যে-কোনো জনকে শুধাও— সাম্ভর-বালায় লহনাসিংহ আর তার বউদি বন্‌তো ছিল তারা কোথায়—সে ঝট্ করে বলে দেবে—'মরে গেছে'। তারপর মৃত্যু আর তার অর্থ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হয়ে কেবল এগিয়ে চলে যেত। সেখান থেকে এক পা এগিয়ে বড়ই শান্ত চিত্তে ব্যবসায়ী মানুষরূপে মাল আর মানুষের হাড়-মাংসের ব্যবসা নিয়ে কথা বলতে থাকে আর তার অদল-বদল করতে থাকে যেমনভাবে গোরু-মোষের খরিদ্দার কোনো মোষ বা গোরুর চোয়াল সরিয়ে দাঁত গুণে তার বয়সের আন্দাজ করতে থাকে।

লোকে এখন যুবতী মেয়ের রূপ, তার সাফ-সুতরো, তার সবচেয়ে প্রিয় রহস্য, তার উল্‌কি— সব-কিছুই খোলা পথের উপর প্রদর্শন

করতে থাকে। আগে মণ্ডীতে মাল বিক্রি হত আর দরাদরিকারীরা হাতে হাত রেখে তার উপর একটা রুমাল ফেলে দিত আর গোপনে কথা বলে নিত ; মালের নীচে আঙুলের ইশারাতেই কেনাবেচা হয়ে যেত। এখন গোপনতার রুমাল হঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আর সামনা-সামনি সওদা হচ্ছে, এখন লোকে ব্যবসার কায়দাই ভুলে গেছে। এইসব লেন-দেন, এইসব কারবার এখন পুরানো যুগের গল্প বলে মনে হয়— যাতে ইচ্ছামত মেয়েমানুষ কেনা-বেচার গল্প বলা হয়। উজবেক অসংখ্য নগ্ন মেয়েকে সামনে দাঁড় করিয়ে তাদের শরীর টিপে-টিপে দেখছিল ; সে যখনি কোনো মেয়ের শরীর আঙুল দিয়ে টিপছিল তখনি সে জায়গায় টোল পড়ে যাচ্ছিল আর তার চারধারে পীতাভ গোল দাগ হয়ে যাচ্ছিল, পীতাভ আর লোহিতাভ রঙ একে অপরের জায়গা নিতে দ্রুত ছুটে আসছিল। উজবেক এগিয়ে চলে যায় ; অগ্রহণযোগ্য মেয়েমানুষ পরাজয়ের আত্ম-স্বীকৃতি আর লজ্জার অবস্থায় এক হাতে গয়না ধরে থাকে, অপর হাতে সমস্ত লোকের নজর থেকে নিজেকে আড়াল করে ফোঁপাতে থাকে ···

সুন্দরলাল অমৃতসর (সীমান্ত) যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল, কারণ লাজোর আসবার খবর পেয়েছিল। একদম এই রকম খবর পাওয়ায় সুন্দরলাল ঘাবড়ে গিয়েছিল। তার এক পা ঝটিতি দরজার দিকে বাড়িয়েছিল, কিন্তু সে পিছিয়ে এসেছিল। তার মন চাইছিল যে সে অভিমান করে, কমিটির সমস্ত প্ল্যাকার্ড আর পতাকা বিছিয়ে বসে যায় আর কাঁদতে থাকে, কিন্তু এখানে এইভাবে অনুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। সে পৌরুষের সঙ্গে এই আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ মুকাবলা করেছিল আর পা মেপে মেপে চৌকী কলার দিকে চলতে শুরু করেছিল কারণ ঐ জায়গাতেই অপহৃতা মেয়েদের নামিয়ে দেওয়া হয়।

এখন তার সামনে লাজো দাঁড়িয়ে ছিল আর এক আতঙ্কে কাঁপছিল। সুন্দরলালকে সে যেমন জানত তেমন আর কেউ জানত না। সুন্দরলাল গোড়া থেকেই তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করত, আর

এখন অন্য পুরুষের সঙ্গে জীবনের কিছুদিন কাটিয়ে ফিরে আসার পর কে জানে সে কী করবে ? সুন্দরলাল লাজোর দিকে তাকিয়েছিল। সে খাঁটি ইসলামী ঢঙে লাল দুপাট্টায় নিজেকে ঢেকেছিল আর বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে ফেলেছিল। অভ্যাসের কারণে, স্রেফ অভ্যাসের কারণে। অপরাপর রমণীদের মধ্যে মিলে মিশে যাওয়ার আর শেষে আপন আপন পাখিশিকারীর জাল ছিঁড়ে পালিয়ে যাওয়ার ভাব ছিল। আর লাজো সুন্দরলাল সম্পর্কে এতই ভেবেছিল যে বেশ-পরিবর্তনের অথবা দুপাট্টা দিয়ে নিজেকে ঠিকমত ঢাকবার খেয়াল পর্যন্ত ছিল না। এ ছিল হিন্দু আর মুসলমানের শিষ্টতার মধ্যে মূলগত তফাত…ডান কাঁধে আর বাঁ কাধে দুপাট্টা রাখার মধ্যে তফাত করতে সে জানত না। এখন সে সুন্দরলালের সামনে দাঁড়িয়েছিল, এক আশায় আর এক ভয়ে কাঁপছিল—

সুন্দরলালের মনে ধাক্কা লাগল। সে দেখল লাজবন্তীর গায়ের রঙ কিছু পরিষ্কার হয়েছে আর পূর্বের তুলনায় কিছুটা স্বাস্থ্যবতী দেখাচ্ছে— না— সে মোটা হয়ে গিয়েছিল— সুন্দরলাল লাজো-সম্পর্কে যা-কিছু ভেবেছিল তা সব ছিল ভুল। সে বুঝেছিল যে দুঃখে ক্ষয় হয়ে যাবার পর লাজবন্তী একেবারে মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছে আর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোতে গিয়ে বেরোচ্ছে না। এই চিন্তায় সে পাকিস্তানে খুব খুশিতে ছিল। তার বড় দুঃখ হয়েছিল কিন্তু সে চুপ করে ছিল কারণ সে চুপ করে থাকার শপথ নিয়েছিল— কিন্তু যদিও সে জানতে পারে নি যে এত খুশি ছিল তবে চলে এল কেন ? সে ভেবেছিল বোধহয় ভারত সরকারের চাপের কারণেই আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আসতে হয়েছিল—কিন্তু একটি বিষয় সে বুঝতে পারে নি যে লাজবন্তীর শ্যামলা চেহারা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল কী করে, আর দুঃখে— কেবল দুঃখে তার শরীরে তো কেবলমাত্র হাড় থেকে গিয়েছিল। সে বেশি দুঃখে মোটা হয়ে গিয়েছিল, তার স্বাস্থ্য নজরে আসছিল কিন্তু তা এমনি স্বাস্থ্য ছিল যাতে দু পা চললেই মানুষের দম ফুরিয়ে যেত।

অপহৃতা রমণীদের শরীরের দিকে নজর দেবার প্রতিক্রিয়া ছিল কিছু অদ্ভুত। কিন্তু সে সব চিন্তাভাবনাকে এক পুরুষালি আদর্শে মুকাবিলা করেছিল। সেখানে অনেক লোক জমা হয়েছিল। কেউ বলেছিল— 'আমরা মুসলমানদের এঁটো মেয়ে নেব না…'

এই আওয়াজ রিসালু, নেকীরাম, চৌকী কলার বুড়ো মোহরারের আওয়াজে ডুবে গেল। এই-সব আওয়াজ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে কালকা-প্রসাদের গলা-ফাটিয়ে চেঁচানোর আওয়াজ আসছিল। সে কাশত আর কথাও বলত। সে এই নয়া বাস্তবতা, নয়া শুদ্ধির কথা জোরের সঙ্গে বলত, তা মেনে নিত। মনে হচ্ছিল যে আজ সে কোনো নয়া বেদ, নয়া পুরাণ আর শাস্ত্র পড়ে নিয়েছে আর অন্যদের ঐ নয়া উপ-লব্ধির অংশীদার করতে চাইছে…ঐ-সব লোক আর ঐ-সব আওয়াজের ঘেরার মধ্য দিয়ে লাজো আর সুন্দরলাল নিজেদের ঘরের দিকে যাচ্ছিল আর মনে হচ্ছিল যে হাজার হাজার বছর পূর্বের রামচন্দ্র আর সীতা কোনো এক দীর্ঘ সাংস্কৃতিক বনবাসের পরে অযোধ্যা ফিরে আসছেন। এক তরফে লোক খুশি প্রকাশের জন্য দীপমালা সাজিয়েছিল, আর-এক তরফে তাদের এত দীর্ঘ যন্ত্রণা দেবার জন্য আফসোসও করছিল।

লাজবন্তী চলে আসার পরও সুন্দরলাল বাবু ঐরকম হৈ-চৈ আর উৎসাহের সঙ্গে 'হৃদয়ে বসাও' প্রোগ্রাম চালু রেখেছিল। কথায় ও কাজে, দু দিকেই সে কর্ম নির্বাহ করেছিল। সুন্দরলালের কথায় কেবল উপর-উপর চিন্তা যাদের নজরে এসেছিল তারা এখন হেরে যেতে শুরু করল। কিছু লোকের অন্তরে ছিল খুশি আর বেশিরভাগ লোকের অন্তরে ছিল আফসোস। 414 নম্বর বাড়ির বিধবা ছাড়া মোহল্লা 'মুল্লা-শকূর'-এর অনেক মণী সোশাল ওয়ার্কার সুন্দরলাল-বাবুর ঘরে বেড়াতে যেতে ঘাবড়াত।

কিন্তু সুন্দরলালের কোনো কষ্ট বা খুশির পরোয়া ছিল না। তার হৃদয়ের রাণী এসে গেছে আর তার হৃদয়ের রিক্ততা ভরে গিয়েছিল। সুন্দরলাল লাজোর স্বর্ণমূর্তি আপন হৃদয়-মন্দিরে স্থাপনা করেছিল

আর নিজেই তার দরজায় বসে তাকে রক্ষা করত। যে লাজো গোড়ায় ভয়ে ভীত থাকত আজ সে সুন্দরলালের অপূর্ব কোমল ব্যবহার দেখে ধীরে-ধীরে উন্মোচিত হতে থাকল।

সুন্দরলাল লাজবন্তীকে আর লাজো নামে ডাকত না। সে তাকে বলত দেবী আর লাজো এক অজানা খুশিতে উন্মত্ত হয়ে যেত। সে কতই চাইত যে তার নিজের উপর যা ঘটেছিল তা সে সুন্দরলালকে শোনায় আর শোনাতে শোনাতে এতই কাঁদে যে তার সব পাপ ধুয়ে যায়, কিন্তু সুন্দরলাল লাজোর ঐ-সব কথা শোনা এড়িয়ে যেতে চাইত আর লাজো উন্মোচিত হতে গিয়ে একরকমভাবে কুঁকড়ে যেত। হাঁ, যখন সুন্দরলাল ঘুমিয়ে পড়ত তখন তাকে দেখত আর তার নিজের চুরিতে ধরা পড়ত। যখন সুন্দরলাল তার কারণ শুধাত তো সে 'না' 'এমনি' 'উঁহু' ছাড়া আর কিছুই বলত না আর সারা দিনের পরিশ্রান্ত সুন্দরলালের ফের ঢুল এসে যেত। গোড়ায় গোড়ায় সুন্দরলাল এক দফা লাজবন্তীকে 'কালো দিনগুলি' সম্পর্কে স্রেফ একথাই শুধিয়েছিল—

'সে লোকটা কে?'

লাজবন্তী নীচের দিকে নজর রেখে বলেছিল—'জুম্মা'—তারপর সুন্দরলালের দিকে দৃষ্টি মেলে কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু সুন্দরলাল এক অদ্ভুত নজরে লাজবন্তীর শরীরের দিকে তাকিয়েছিল আর তার চুলে হাত বুলিয়েছিল। লাজবন্তী ফের দুচোখ বন্ধ করেছিল আর সুন্দরলাল শুধিয়েছিল—

'ভালো ব্যবহার করত?···'

'হাঁ···'

'মারত না তো?'

'সুন্দরলালের বুকের উপর নিজের মাথা ঘষতে ঘষতে লাজবন্তী বলেছিল—'না।' সে ফের বলেছিল—

'সে মারত না কিন্তু তাকে আমার খুব ভয় করত···তুমি আমাকে মারতে তবু তোমাকে ভয় হত না···এখন তো আর মারবে না?'

সুন্দরলালের দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল আর সে মুখ লজ্জিত হয়ে খুব আফসোসের সঙ্গে বলেছিল—'না দেবী…এখন না…মারব না…'

'দেবী' লাজবন্তী ভেবেছিল, চোখের জলও ফেলেছিল।

আর তার পরে লাজবন্তী সব-কিছু বলে দিতে চেয়েছিল কিন্তু সুন্দরলাল বলেছিল—

'যা হয়ে গেছে তা যেতে দাও। তাতে তোমার কী অপরাধ? এ তো আমাদের সমাজেরই অপরাধ যে তোমার মতো দেবীদের এখানে সম্মানের আসন দেওয়া হয় না…তা তোমাদের ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতি করে।'

আর লাজবন্তীর মনের কথা মনেই রইল। সে সব কথা বলতে পারল না, সংকোচে চুপ হয়ে থাকত আর নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখত— যা দেশ-বিভাগের পরে দেবীর শরীর হয়ে গেছে, তা আর লাজবন্তীর শরীর ছিল না। সে খুবই খুশি ছিল, কিন্তু এমনি এক খুশিতে ডুবেছিল যাতে ছিল এক সংশয়— সে শুয়ে-শুয়ে হঠাৎ উঠে বসতে যেন সীমাহীন খুশির মুহূর্তে কেউ শব্দ শুনে হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে দেখছে।

অনেক দিন কেটে যাবার পর খুশির জায়গায় নিয়েছিল পুরোপুরি সংশয়। এইজন্য নয় যে সুন্দরলালবাবু ফের ঐরকম খারাপ ব্যবহার শুরু করে দিয়েছিল পরন্তু এইজন্য যে সে লাজোর সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করত— লাজো এ ব্যবহার আশা করে নি।… সে সুন্দর-লালের সেই পুরনো লাজো হয়ে যেতে চেয়েছিল— যে গাজরের সঙ্গে ঝগড়া করত আর মূলোর সঙ্গে ভাব করত। কিন্তু এখন ঝগড়ার কোনো কারণই ছিল না। সুন্দরলাল তাকে এই অনুভব করিয়ে দিয়েছিল যেন সে (লাজবন্তী) কাঁচের কোনো জিনিস যাকে ছুঁলেই ভেঙে যাবে। লাজো আয়নায় নিজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখত আর শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌচেছিল যে সে সব-কিছুই হতে পারে কিন্তু লাজো হতে পারে না। সে সংসারে আসন

পেয়েছিল কিন্তু তার ভিত্তি টলে গিয়েছিল··· তার অশ্রু দেখার মতো চোখ সুন্দরলালের ছিল না, তার দীর্ঘশ্বাস শোনার মতো কান্নাও ছিল না··· প্রভাতফেরীর দল বেরোত আর মহল্লা 'মুল্লা শকুর'-এর সংস্কারক রিসালু আর নেকীরামের সঙ্গে মিলে গলা মিলিয়ে ঐ সুরে গাইত—

'হথ লাঈয়েঁ। কুম্লান নী...লাজবন্তী দে বুটে'

বব্বল

দরবারীলাল সন্ধ্যা থেকেই ঘরে বসে সীতার জন্যে বেকার হচ্ছিল।

কারুর জন্যে বেকার হওয়া সেই অবস্থাকে বলে যখন দেখা যায় মানুষ আপাতদৃষ্টিতে ইভনিং নিউজ অথবা গালিবের গজল পড়ছে কিন্তু মনে মনে কোনো সীতার জন্যে ডুবে আছে।

সীতা তো বলেছিল সে ঠিক ছ'টায় অরোরা সিনেমার দিক থেকে যে রাস্তা এসেছে তারই মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার শাড়িটা হবে কাশরঙের—কিন্তু…

দরবারী থাকে কিংস সার্কেলে— এখন যার নাম হয়েছে মহেশ্বরী উদ্যান। সে লাউডস্পীকারের এক ফার্মে কাজ করে। আয় বিশেষ ছিল না কিন্তু পয়সার কমতিও ছিল না। বাপ মেহ্‌তা গিরধারীলাল একদিনেই 'ফরওয়ার্ড ট্রেডিং'এ তিন-চার লাখ টাকা আয় করে নিয়েছিলেন, আর হঠাৎই হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন। সে হাত আজ পর্যন্ত গোটানোই আছে। আজও 'কটন এক্‌সচেঞ্জ'-এ তার বন্ধুরা মেহতা সাহেবের মাখনের ভিতর থেকে চুলের মতো বেরিয়ে যাওয়ার জন্য গাল দিতে থাকে; জবাবে তিনি কেবল হাসতেন— এমনি হাসি যা তিন-চার লাখ টাকা ঘরে ঢুকিয়ে লোকে হাসতে পারে।

দরবারীর বড় ভাই বিহারীলালের বিয়ে হয়েছিল মারবাড়ীদের ঘরে যারা মেয়ের হাতে বিশ সের পাকা সোনা দিয়েছিল, আর এভাবেই তাকে দরবারীর বউদি বানিয়েছিল। এক বছর বাদে দরবারীর নিজের বোন সতবন্তী নার এক লাখপতি 'ইসমায়লী' সালেহ্‌ মোহম্মদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে তাকে নিকে করেছিল। গলিতে গলিতে মোহল্লায় মোহল্লায় আর সারা শহরে হাঙ্গামা হয়েছিল। কয়েক বছর মেহতা সাহেব নিজের মেয়ে আর জামাই দুজনকে নিজের বাড়ি 'প্রেম কুটিরে' ঢুকতে দেন নি। শেষ পর্যন্ত ভাবসাব হয়ে গিয়েছিল। ছেলের আত্মীয়রা বলত মেয়েকে ইসলামে শুদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে আর তার নাম হয়েছে কনীজ ফাতিমা। আর মেহতা সাহেব

বলতেন ছেলেকে শুদ্ধ করে নেবার পর তার নাম রাখা হয়েছে সরদারী মোহন। কিন্তু সরদারী মোহন ওরফে সালেহ্ মোহম্মদ হামেশা নিজের নাম লিখত এস. এম. নবাব। কারণ ছেলের এই খারাপ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের আর কোনো উপায় ছিল না। এই কারণে দরবারীলালের বন্ধুরা যখনি সতবন্তী নারের পতি ওরফে শৌহরের দেখা পেত তখনি এ কথাই বলত—'কেমন আছিস্ রে সালে – হ্?'

আজ সালেহ্ ওরফে সরদারী আর সতবন্তী তুজন বাড়িতে ছিল, তাদের তুই বাচ্চাও ছিল। ঐ সময় বিহারী আর গুণবতী-বউদি মতলব করে দরবারীর বিয়ের কথা তুলল। মেয়েরা আদর্শ স্বামীর আর পুরুষেরা আদর্শ পত্নীর বিষয়ে আলোচনা করতে করতে আপসে তর্ক করছিল। দরবারী বারান্দায় বসে নিজের বিষয়ে সব কথা শুনছিল। হঠাৎ সে এক ঝট্‌কা দিয়ে লাউডস্পীকারের চোঙার মধ্যে মুখ রেখে চীৎকার করল— 'আমি দরবারীলাল মেহতা, পিতা গিরধারীলাল মেহতা, সাকিন বোম্বাই, অবশ্য-অবশ্য বিয়ে করব না।' সকলে ঐ আওয়াজে চমকে উঠেছিল। মেয়েদের ও বাচ্চাদের তো প্রাণই বেরিয়ে গিয়েছিল।

দরবারীলাল নিজের জায়গায় ফিরে এসে ইভনিং নিউজের পাতা উল্টাতে থাকে আর অরোরা সিনেমার দিক থেকে মোড়-ঘোরা পথের দিকে দেখতে থাকে— সেদিকে কাশ রঙের শাড়ির সন্ধানে।

অন্দরমহলে সবাই হাসছিল। মাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। দরবারী ঘরেও ছিল বিশেষ বাবু। সেই কারণে সে চুলে হেয়ার টনিক লাগাত, মেহনত করে চুলের পাট করত, কাঁচি নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গোঁফের প্রান্ত ঠিক করতে এক ঘণ্টা তু ঘণ্টা লাগিয়ে দিত। এই সবই ছিল তার বাবুগিরির পরিচয়। আসল কথা এই যে বিয়ের আগে ছেলেরা মেয়েদের প্রতি আর মেয়েরা ছেলেদের প্রতি ঐভাবেই রঙঢঙ ভঙ্গি করে থাকে। তারপর বিয়ে হয়ে যায়। আপসে মিলে-মিশে গিয়ে তখন কোথাও-না-কোথাও গিয়ে নিজ নিজ কাজকর্ম সামলায়...দরবারীর এই-সব অঙ্গভঙ্গি দেখে ঘরের মেয়েরা বলাবলি

করত এ-সব হল বিয়ের লক্ষণ, আর পুরুষেরা বলত— নষ্ট হয়ে যাবার লক্ষণ।

শিখে তরখান বারান্দায় জালি লাগাবার কাজ আজ থেকেই শুরু করেছিল। সারাদিন সে এক বেঢপ, বেকায়দা ছোটখাট কাঠের তক্তা পাতলা করবার জন্য র‍্যাঁদা চালাচ্ছিল আর এইজন্যে সারা ঘরে কাঠের টুকরো, ছিল্‌কে আর গুঁড়ো ছড়িয়ে ছিল, আর সেগুলি পায়ে লেগে যাচ্ছিল। তখন রাস্তার ওধারে ডন বস্‌কো স্কুলের ঘণ্টা বাজল; শাদা-শাদা কামিজ আর নীল-নীল প্যাণ্ট-পরিহিত ছেলেরা একে-অপরের গায়ে পড়তে পড়তে হস্টেলের কামরা থেকে বেরিয়ে এল। স্কুলের মাঠে লম্বা আলখাল্লা-পরা এক ফাদার তখন পর্যন্ত বাচ্চাদের ফুটবল খেলাচ্ছিলেন। তিনিও বাঁশি বাজিয়ে দিলেন। খেলা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু এখনো সীতা এল না।

সিনেমার দিক থেকে আসা এদিকের পথের উপর কয়েকটা গোরু আলস্যের ঢঙে বসেছিল আর জাবর কাটছিল। আবার ওদিক থেকেই একটা মোটরগাড়ি মোড় ঘুরে ডানদিকের বিল্ডিঙের পিছনে দাঁড়াল। এক মোটা-সোটা মহিলাকে আসতে দেখা গেল; তার পিছনে মাদ্রাজী হোটেল 'উড়পী'র মালিক রামস্বামী। তারা একে অপরের প্রতি বিশেষ আসক্ত ছিল। দরবারীর তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন একে অপরকে এখান থেকে ওখানে ঠেলতে ঠেলতে তারা কোন-এক অদ্ভুত খেলা খেলছে।

সীতার বদলে উল্টো দিক থেকে মিস্ত্রী চলে গেল। রোজকার মতো আজও তার কোলে ছিল তার বাচ্চা বব্বল।

বব্বল এক স্বাস্থ্যবান শিশু। গোল-গোল, নরম-নরম, যেন স্পঞ্জে তৈরি। তার তো দু-একটা দাঁত বেরিয়েছিল, কিন্তু নীচের দুটি দাঁত অপেক্ষাকৃত বড় ছিল। হতচ্ছাড়া ছেলে হাসলে ওআল্ট ডিজনীর খরগোশ বলে মনে হত। আজ পর্যন্ত এমন কাউকে দেখা যায় নি যে বব্বলকে হাসতে দেখে বিবশ হয়ে হেসে না ফেলেছে।

'বব্বল'— দরবারী চীৎকার করল আর দুহাত বাচ্চার দিক ছড়িয়ে

দিল। মুচকি হাসি হেসে বব্বল দরবারীর দিকে তাকিয়ে দেখেই ভিতরের কোনো বিবশভঙ্গীতে সোজাসুজি দরবারীর উদ্দেশে হুম্-হুম্ শুরু করে দিল। এখন তাকে সামলানো তার মা মিস্ত্রীর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

'দাঁড়াও'— বলে দরবারী কুড়মুড়-ভাজা আনবার জন্য দ্রুত অন্দরে চলে গেল। সে এও ভুলে গিয়েছিল যে সীতা আসবে আর চলে যাবে। বব্বলের মুখের 'পরে এক নিরাশার ঢেউ চলে গেল আর মুহূর্তের মধ্যে তার এক অনুভূতি হল— যা তাকে বলছে— সারা দুনিয়া ধোঁকা। সে যখন এভাবেই নিরাশ হয়ে গিয়েছিল তখনই দরবারীকে আসতে দেখে খুশি হয়ে গেল।

বব্বলের মা মিস্ত্রী এক ভিখারিনী। প্রয়োজনের তাড়নায় খুব অল্প বয়স থেকে সে বব্বলকে ভিক্ষা চাইবার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিল। বাজারে গিয়ে সে কোনো বাবু-চেহারার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে যেত আর বব্বল এক রিহার্সাল-দেওয়া অ্যাক্টরের মতো ঐ লোকের ধুতি বা কামিজ টানতে থাকত আর তার যে জিনিস চাই তার প্রতি ইশারা করত। ঐ লোক দেখত, নজর বাঁচিয়ে ফের দেখত আর করুণা-পরবশ হয়ে ঐ জিনিস কিনে বব্বলের হাতে ধরিয়ে দিত। বাবু চলে যাবার পর মিস্ত্রী বব্বলের হাত থেকে ঐ জিনিস কেড়ে নিয়ে দোকান-দারকে তা ফিরিয়ে দিয়ে পয়সা উপায় করে নিত— বব্বল চীৎকার করত আর কাঁদত।

কিন্তু দরবারীর সঙ্গে বব্বল আর তার মা মিস্ত্রীর সম্পর্ক এইরকম ছিল না। কুড়মুড়-ভাজা নিয়ে তা বেচে দেবার কোনো যুক্তিই বা এখানে কোথায়। কুড়মুড়-ভাজার সঙ্গে মিস্ত্রী দুয়ানি বা সিকি পেয়ে যেত— তাতে বব্বলের কোনো আসক্তি ছিল না। তার তো কুড়-মুড়-ভাজা চাই— যা তার মা ছিনিয়ে নিত না আর কোনো দোকান-দারকে দিয়ে দিত না। সে সোজা মুখের মধ্যে কুড়মুড়-ভাজা ফেলে দিত আর দাঁত দিয়ে চিবোতে চিবোতে হুম্‌হুম্ করে উছলে উছলে আপন খুশি প্রকাশ করত। আজ যখন দরবারী বব্বলকে কোলে

তুলে নিয়েছিল তখন একবারেই কুড়মুড়-ভাজায় মুঠি ভরে নিয়ে সে মায়ের দিকে ফিরে যেতে ঝুঁকে পড়েছিল। দরবারী বব্বলকে আটকাবার খুব চেষ্টা করেছিল, বাপু-বাছা বলে আদর করেছিল, কিন্তু সে কি তা শোনবার ছেলে! 'উঁ-উঁ' করতে করতে সে তার মায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে যাচ্ছিল।

দরবারী বলেছিল— 'হতচ্ছাড়া··· শালা···'

অন্দরমহল থেকে সালেহ্ অথবা সরদারীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল— 'হুজুর, কী হুকুম্ আছে?'

'আপনার খোঁজ করি নি, দয়া করে শুনুন'— দরবারী অন্দরের দিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিয়ে ফের বব্বলের কচি কচি গালের উপর চাপড় লাগিয়ে তাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল— 'এত স্বার্থপর?··· সেলাম দিলি না··· ধন্যবাদ দিলি না··· কাজ হয়ে গেলে তুই কে আর আমি কে?'

ফুটপাথের জীবনে যার কাছে লজ্জার বিশেষ বালাই ছিল না, সেই মিস্ত্রী বিশেষতার সঙ্গে বলল — 'বাবুজী এরা সব এরকমই হয়ে থাকে...' তারপর বব্বলকে বুকে নিয়ে সেখানেই সে নিজের দুয়ানি বা সিকির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

বব্বল রোজকার মতোই আগাপাছতলা উলঙ্গ ছিল; কেবল তার কোমরের কাছে সে একটা কালো তাগা পরেছিল— তার মাঝখানে একটা তাবিজ ঝোলানো ছিল। এই পোষাকে খুশি থেকে মার কাছে পৌঁছেই সে নিজের মুখ মিস্ত্রীর বড় বড় দুইটি স্তনের মাঝখানে ফেলেছিল। সেখান থেকে সে এক মস্ত বিজয়ীর মতো ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিল যেন সে কোনো বড় কেল্লায় পৌঁছে গেছে। ফের নজরের ধনুকে তীর চড়িয়ে সে কেল্লার গম্বুজের 'পর বসে সামনের কোনো লড়ুয়ে ফৌজের খোঁজ-খবর করছিল— এমনি ফৌজ, হামলা করার আগেই যাদের দম ছুটে যায়। তারপর হঠাৎ কোনো পরীর চিন্তায় ঘোড়ায় চড়ে সওয়ারের মতো দ্রুত ছুটতে শুরু করেছিল। আগে— আরো আগে— উপরে— আরো উপরে··· আর তার পাখায় হো-হো

করে তার পায়ের উপর ঘরবাড়ি পড়ে যায়।

মিস্ত্রী ছিল পাকা রঙের কালো যুবতী আর ববল গৌরবর্ণের বাচ্চা। এ কেমন করে হল? — দরবারী কোনোদিন তা শুধায় নি। সে অনুধাবন করেছিল এই গরিব মেয়েটি কতই অসহায়। পথের ধারে পড়ে থাকা মিস্ত্রীকে কোনো বাবু আট আনা বা একটা টাকার বদলে ববল উপহার দিয়েছিল।

'বাবুজী, আপনার কাছে তো ও যায় কিন্তু এই পাজিটা··· কোনো বেটাছেলের কাছে যায় না।'

'কেন? কেন?' দরবারী বিস্মিত হয়ে শুধিয়েছিল।

'জানি না', মিস্ত্রী বলে। তারপর আদরের সঙ্গে ববলের দিকে তাকিয়ে বলে— 'হাঁ, মেয়েছেলেদের কাছে ও চলে যায়।'

দরবারী খুব জোরে হেসে উঠেছিল— 'বদমাশ আছে না।... এখন থেকেই মেয়েমানুষের মজা বুঝতে পারে। বড় হয়ে কী করবে··· ?'

মিস্ত্রী খুব লজ্জা পেয়েছিল আর খুবই ধাক্কা খেয়েছিল। তার মনে হয়েছিল যে সে তার কোলে অসংখ্য গোপীসৃত কানাইকে খেলা দিচ্ছে। মিস্ত্রীর কল্পনায় সে নিজে ঐ গোপীদেরই একজন ছিল আর ববল ছিল মিস্ত্রীর প্রাণ, আর মিস্ত্রীর সব ভাবনা তার চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচত··· ববল এখন পর্যন্ত এক গোপীর সঙ্গেই ছিল, ফের অনেকের সঙ্গে।

দরবারী মিস্ত্রী বাঈয়ের সঙ্গে কথাবার্তায় কিছুটা স্বাধীনতা নিত। সে ঘাবড়ে গিয়ে বলে বসল—

'মিস্ত্রী, এর বাপ কী কাজ করে?'

'এর বাপ?' মিস্ত্রী যেন ভেবে নিয়ে বলল— 'নেই।'

এই উত্তরের মধ্যে অনেক কথাই ছিল। এ কথা ছিল যে সে মারা গেছে। এও ছিল যে মৃত্যুর চেয়েও খারাপ কিছু হয়েছে। মিস্ত্রী দূরের দিকে তাকিয়েছিল তারপর দরবারীর দৃষ্টিতে যে আফসোস ছিল তা দূর করে বলেছিল— 'একবার সে এসেছিল··· আমার মনে হয়েছিল যে সে-ই। কিন্তু··· বাবুজী আমি তখন কি বলতে পারতাম··· ?

...আমি তাকে প্রাণ ভরে দেখিই নি।... তখনো পর্যন্ত আমি এই বাচ্চার কোনো নাম রাখি নি।... কখনো গোপু কখনো নারিঅাঁ বলে ডাকতাম। যখন সে বাচ্চার হাতে একটা পাঁচটাকার নোট রেখে খুব আদরের সঙ্গে ডাকল, বব্বল, ...তখন থেকেই আমি এর নাম রেখেছি বব্বল..'

মিস্ত্রী ফের ভাবতে লাগল — 'এর বাপ না হলে কি পাঁচ টাকা দিত··· ?'

দরবারী ভাবল— 'হতে পারে সে সেই লোক নয়··· পাঁচ টাকার নোটই এই বাচ্চার বাপ...'

দরবারী মিস্ত্রীর হাতে দেবার বদলে বব্বলের হাতে আজকের আধুলিটা দিল। বব্বল মুদ্রাটা হাতে নিয়েছিল। তারপর খুব জোরে হাত নেড়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলেছিল।

আধুলিটা সড়কের ম্যানহোলের মধ্যে পড়েই যেত, কিন্তু মিস্ত্রীর ভাগ্যের এক সামান্য দয়ায় একটা শুকনো আমের খোসা সেটাকে থামিয়ে দিয়েছিল। মিস্ত্রী ঝুকে পড়ে আধুলি তুলে নিয়ে বব্বলকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলেছিল —

'তুই লুচ্চা না···' ফের তার মুখে চুমু খেয়ে দরবারীলালকে বলেছিল-- 'সত্যি যদি শুধাও তো বলি এই-ই আমার পুরুষ।'

'তোর পুরুষ মানুষ— ?'

'হাঁ', মিস্ত্রী বব্বলকে সামলে ছিল। সে তার মায়ের মাথা থেকে আঁচল টানছিল। মিস্ত্রী ফের বলে —

'এ উপায় করে, আমি খাই।'

মিস্ত্রী ছিল খুব কথা-কইয়ে। সে আরো অনেক কিছু বলত। বব্বল আরো কুড়মুড়-ভাজা চাইত, কিন্তু দরবারীর নজরে এল ঐ দিগন্তে কাশ রঙের ঢেউ। সে তাড়াতাড়ি মিস্ত্রীর সৌন্দর্য আর বব্বলের সরলতা হঠিয়ে দিয়ে— 'আমি চল্লাম সালেহ্ ভাই··· আচ্ছা বউদি'— বলে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপর সে সড়কে না পৌঁছতেই তার পাতলুনের ঘেরের মধ্যে আটকে-থাকা

কাঠের ছিলকে দেখা যাচ্ছিল। দরবারী ঝুঁকে পড়ে তা বার করে ফেলে সীতার কাছে পৌঁচেছিল।

শিবাজী পার্কে সমুদ্রের ধারে ক্লাব আর ভেলপুরীওআলাদের কিছু দূরে রেখে দরবারী আর সীতা এক দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল।

সীতা আঠারো-বিশ বছর বয়সের যুবতী। তার মা ছিল, কিন্তু বাপ মারা গিয়েছিল। সংসারের অবস্থা খুব-একটা খারাপ ছিল না কারণ বাড়িটা ছিল নিজেদের। ভাড়াটের ভাড়া কখনো উশুল হত, কখনো বা হ'ত না। সীতার মা লছমনদেঈ মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছিলেন। কিন্তু বিয়ের চেয়ে একথার উপরেই সে বেশি জোর দিয়েছিল যে এমন কোনো পুরুষকেই সে চায় যে প্রতি-মাসে আপন রোয়াবে ভাড়া আদায় করতে পারে। সীতার কথামতো বাড়ির দরজায় প্রতিমাসে যে-সব ভেড়া দেখা দিত তারা পালিয়ে যেত··· আর বেঁচে থাকাই সুখের হয়েছিল। সীতা লছমন দেঈর কাছে দরবারীর কথা বলেছিল। গোড়ার তার মা সংশয় আর দ্বিধার কথাই বলেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি জানলেন যে দরবারীর পুরা নাম দরবারীলাল মেহতা তখন তিনি ঝট্ করে অনুমতি দিয়ে দিলেন, কারণ বোম্বাইয়ে যে-সব লোক ভাড়া অর্জন করে থাকে তাদের বলে মেহতা।

সীতার উচ্চতা ছিল মাঝারি রকমের কিন্তু শরীরের গঠন এত সুবিন্যস্ত ছিল যে পুরুষ-চিত্তে আবেগ জাগিয়ে দিত আর কোনো ব্যাকুলতায় তাদের ঠোঁটে সিটি বেজে যেত। চেহারার কাট-ছাঁট গড়ন সুন্দর ছিল, কিন্তু তার কাছে এলেই তা জানা যেত। তার চোখের পাতা ভিজে-ভিজে, কারণ সীতার চোখদুটি ছিল কিছুটা ভিতরে-ঢোকা। তাকে আড়াল করবার জন্যে চোখের পাতা দুটি ঝুঁকে পড়েছিল। কিন্তু এই ঢুকে-যাওয়া চোখদুটির কারণেই সীতা পুরুষ-হৃদয়ের অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পারত। সে কাউকে কিছু বলে অথবা না বলে, তা আলাদা কথা, কিন্তু সব-কিছু সে জানত। হাঁ, সীতার চুল ছিল খুব লম্বা, সে-কারণে দরবারী তাকে শুধাত — 'তোমাদের বাড়িতে কেউ কি কোনো বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে এনে-

ছিল ?' আর সাতা বলত — 'আমি নিজেই বাঙালি মেয়ে···আমার নাম সীতা মজুমদার।' 'দরবারী বলত — 'সীতা মজাদার।' আর সীতা হাসতে শুরু করত। সীতা খুশি ছিল যে তার উচ্চতা ঠিক ততটাই যার দ্বারা সে তার সুন্দর উজ্জ্বল কোঁকড়ানো কেশরাশি-শাভিত মাথা দরবারীর বুকের উপর রাখতে পারে আর আপন শরীরের আত্মা পর্যন্ত কাউকে সমর্পণ করে নিজের সব দুঃখ ভুলে যেতে পারে আর কিছুটা তফাত করে সে পতি আর পিতাকে এক করে দিতে পারে —

দেয়ালের আড়ালে বসে দরবারী সীতাকে আদর করছিল। সীতা চাইত না যে তার (দরবারীর) ভালোবাসা সীমা ছাড়িয়ে যায়। কোমরের চার দিক হাত পড়তেই সে চমকে উঠেছিল। সে দরবারীকে কথাবার্তার মধ্যে টেনে নিয়ে আসতে চাইছিল। ব্লাউজের ভিতর থেকে সে একটা ছোট রুপোর ডিবে বার করে দরবারীর মুখের কাছে নিয়ে বলে— 'দেখ, তোমার জন্য কী এনেছি ?'

'কী এনেছ ?' দরবারী শুধাল আর অন্যমনস্ক হয়ে সীতার কোমর থেকে হাত সরিয়ে এনে ডিবেটার দিকে বাড়িয়েছিল।

সীতা ডিবে দূরে সরিয়ে নিয়ে বলেছিল— 'এভাবে না... আমি নিজেই দেখাব।' ফের সেটাকে দরবারীর নাকের কাছে ধরে বলেছিল — 'শোঁকো।'

বিব্রত হয়ে দরবারী ডিবে শুঁকেছিল, আর তার হাঁচি এসে গিয়েছিল।

ভালোবাসার সব খেলা থেমে গিয়েছিল। দরবারী হাঁচির পর হাঁচি দিচ্ছিল আর পকেট থেকে রুমাল বার করে বারবার নিজের নাক পুঁছছিল। আর পাশে বসে সীতা হাসছিল।

'এই —' দরবারী বলেছিল, ফের হেঁচে নিয়ে বলেছিল— 'কী রকমের ঠাট্টা ?'

সীতা বলেছিল— 'তুমি একে ঠাট্টা বলছ ?— বিশ টাকা ভরির নস্যি।'

'নস্যি ?'

'হাঁ', সীতা বলল — 'তুমি হাঁচছ, আমার খুব ভালো লাগছে।'

দরবারী সীতার দিকে তাকাল যেমন করে কেউ কোনো পাগলের দিকে তাকায়। সীতা তার প্রতি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে বলল— 'মনে আছে প্রথমবার আমার সঙ্গে তুমি কোথায় দেখা করেছিলে?'

'মনে নেই,' দরবারী মাথা নেড়ে বলেছিল— 'কেবল এ কথাই মনে আছে যে কোথাও তোমার সঙ্গে প্রথমবার দেখা হয়েছিল।'

'ওখানে,' সীতা সামনে মহাত্মা গান্ধী সুইমিং পুলের দিকে ইশারা করে বলল —

'তুমি স্নান করছিলে আর হাঁচছিলে। আমার সঙ্গে আরো তিন-চারটি মেয়ে ছিল। ঐদিন দফতরে আধা দিনের ছুটি হয়ে গিয়েছিল আর আমরা এমনি ঘুরতে ঘুরতে ওদিকে চলে গিয়েছিলাম—'

'ও দিকে কেন?'

'এমনিই', সীতা বলেছিল— 'ছুটি হয়ে গেলে আমাদের— সব মেয়েদের কী হতে পারে। আমরা ঘরে থাকতেও পারি না। এভাবেই বাইরে বেরিয়ে যাই যাতে কিছু হতে পারে। কিন্তু যখন দেখা গেল হওয়া-হওয়ানো কিছুই না তখন কোকা কোলা খেতে থাকি।'

সীতা হেসেছিল। সঙ্গে দরবারীও হেসেছিল। সীতা আবার কথার খেই ধরে বলতে থাকে —

'আমরা সবাই তোমার দিকে তাকিয়ে হাসছিলাম কারণ তুমি হাঁচতে হাঁচতে বোর্ড থেকে ফোয়ারার দিকে আর ফোয়ারার কিনারার দিকে আসছিলে। আর এইভাবে আসা-যাওয়ায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত দু-তিন ভাগ হয়ে যাচ্ছিলে— বাচ্চাদের মতোই। আমার প্রাণ চাইছিল তোমাকে ধরে ফেলি, আঁচল দিয়ে তোমার মুখ মুছিয়ে দিই, নাক পুঁছে দিই আর তোমার পিছন দিকে এক চড় লাগিয়ে বলি— এখন যাও মজা করো…'

দরবারী যেন একটা কথাই ভাবছিল — 'আর সব মেয়েরা কে কে ছিল?'

'এক তো ছিল কুমুদ', সীতা বলল—'দ্বিতীয় জন জুলি…ওদিকে

খাড়ির পাড়ে মাউণ্ট মেরীর কাছে থাকে। তৃতীয় জন—' আর হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল— 'তুমি কেন শুধাচ্ছ ?'

'এমনিই', দরবারী জবাব দিল— তোমার সখীরা তোমার জুতোরও পরোয়া করে না।'

'তুমি দেখেছ ?'

'দেখি নি তো।'

সীতার চেহারায় যে আনন্দ ফুটে উঠেছিল তা কমে গেল। দরবারীর আবার এক হাঁচি এসেছিল কিন্তু তা থেমে গিয়েছিল। সে সামনের দিকে তাকিয়ে বলল— 'আজ দিন তো শেষই হয় না!'

সমুদ্রে জোয়ার শুরু হয়ে গেছে। কিনারার দিকে ঢেউয়ের পর ঢেউ আসছে আর তার সঙ্গে নিয়ে আসছে অগণিত ভেলপুরীর পাতা, আখের ছিবড়ে, বাদামের খোসা, নারকেলের খোলা। তটভূমিতে কয়েকটা কয়লা-চাঙড়ও দেখা যাচ্ছে — সেগুলি সমুদ্রের অনেক ভিতরে ধোঁয়াওয়ালা বজরা আর বড় বড় জাহাজ আপন বোঝা হাল্‌কা করার জন্যে ফেলে দিয়েছিল। তেলের অবশেষ শুকনো ডাঙায় ঢেলে দেওয়া হয়েছিল ; তাদের খালি-হয়ে-যাওয়া ডীজেল-টিন তটভূমিকে বড় পিছল আর কালী করে দিচ্ছিল।

সীতা ঘুরে বসে দেখল। দরবারী কিছুটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চিকন চেহারার উপর কালী রঙ চকচক করছে।

...সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। সে তার আলোর দীর্ঘ কেশরাশি দুনিয়ার দুই কিনার থেকে গুছিয়ে তুলে নিচ্ছিল আর তাকে বগলে চেপে এক গভীর জর্দা-রঙের গাঁঠরি বানিয়ে দূর পশ্চিমের গভীর জলে নামিয়ে দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরেই তার রশ্মি দিগন্তের গোল রেখায় হারিয়ে গেল। এখানে সমুদ্রের কিনারায়, তটবর্তী বাড়িগুলিতে আর সে-সব বাড়ির অধিবাসীদের উপর সে রশ্মি এসে পড়েছিল যা আকাশের ভ্রাম্যমাণ মেঘের আড়াল থেকে নীচে মাটির উপর পড়ছিল আর ধীরে-ধীরে বড় আদরের সঙ্গে নিজের জায়গা আঁধারকে ছেড়ে দিচ্ছিল—

যেন বলছিল — নাও এখন তোমার রাজত্ব। যাও মজা করো...

ঐ হাঁচি দরবারীকে সীতার থেকে অনেক দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। আবার একবারেই তা ওকে কাছে নিয়ে এসেছিল··· সীতা কাঁপতে শুরু করেছিল। দরবারী হাঁফাচ্ছিল।

আঁধার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই পুল, ক্লাব আর সড়কের উপর আলো জ্বলে উঠেছিল—এক দিকে ফেরিওয়ালাদের ঝাঁকা আর ঠেলাগাড়ির উপর টিম-টিমে লম্ফ জ্বলছিল।

তখনি দেয়ালের ধার থেকে আওয়াজ এল— 'কি করছ দরবারী ?'

দরবারী নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে বলল — 'এই কথার মানে হল তুমি আমাকে ভালোবাস না।'

'ভালোবাসার মানে এই নয়।'

'আমি সব জানি···' দরবারী উঠে দাঁড়িয়ে পোশাক ঠিক করে নিচ্ছিল। সীতা তাকে থামাতে চেষ্টা করেছিল আর অনুনয়ের স্বরে বলেছিল —'চাঁদ, কী করছ তুমি ?'··· বালির উপর শুয়ে পড়ে সীতা দরবারীর পায়ের উপর পড়েছিল। দরবারী রাগে কাঁপছিল।

দরবারী এক ঝট্‌কায় নিজের পা ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল— 'কুত্তী, বড় পবিত্র-শুচি হয়েছিস্। তুই ভেবেছিস···'

'আমি কিচ্ছু ভাবি নি'— সীতা হাঁটু ঘষে ঘষে ফের দরবারীর পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—

'চন্দা, আমি তোমারি··· শিরায়: শিরায় অণু-পরমাণুতে আমি তোমারি··· আমি এক বিধবার মেয়ে...আমাকে বিয়ে করে নাও···'

'কোনো বিয়ে-ফিয়ে নয়। তোমাকে যা বলে দিয়েছি তা কি যথেষ্ট নয় ? মন্ত্র পড়ে সাতপাক ঘোরা কি খুব জরুরি ? আইনের আশ্রয় নেওয়াটা জরুরি ?'

এ কথা বলে দরবারীলাল থেমে গিয়েছিল কারণ এখনো তার আশা ছিল যে···

'হাঁ, জরুরি', সীতা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল— 'এই দুনিয়া তুমি-আমি বানাই নি।'

দরবারীর শেষ আশাও ভেঙে গেল। সে বলল— 'আমি ঐ ভালোবাসাকে মানি না যার মাঝখানে কোনো পর্দা, কোনো শর্ত আছে। আত্মায় আত্মায় মিলন যদি জরুরি হয় তো দেহে দেহে মিলনও জরুরি। এই মিলনে স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হন। শাস্ত্রে এইরকমই লিখেছে।'

'লেখা হতে পারে', সীতা বলল— 'সকলে তোমার মতো এই কথা মেনে নিত…'

'আমি কারুর পরোয়া করি না,' দরবারী সক্রোধে মাটিতে লাথি মেরে বলল। বালুতে লাথি মারায় গর্ত হয়ে গেল আর সে বালি থেকে পা টেনে নিয়ে চলতে শুরু করল।

সীতা তার পিছনে দৌড়ল— 'শোনো'…তখনো দরবারী দেয়ালের সীমা পেরিয়ে যায় নি। তখনো তার আড়ালে সে বসতে পারে আর আঁধারের সঙ্গে মিশে থাকতে পারে।

দু-একটা ছেলে ঐ খোলা ময়দানে তার পাগলামো দেখে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এল ছোলাভাজাওয়ালা। তার ফেরীতে যে ল্যাম্পোর আগুন ছিল সমুদ্র থেকে আগত হাওয়ায় তা কিছুক্ষণ পর পরই লাফিয়ে উঠছিল—

এখন সীতা কেবল দরবারীর পা ধরে পড়েছিল না, সেইসঙ্গে তার বাঙালিনী-সুলভ কেশরাশি তার পায়ের উপর রেখেছিল ; তার চোখ জলে ভরে এসেছিল, ঠোঁট ভিজে গিয়েছিল। দরবারীর পা পর্যন্ত জ্বলছিল আর ভিতরের আগুনে সে কাঁপছিল। পায়ে চুমু খেয়ে, তার উপর চোখের জল ফেলে সীতা উঠে বসেছিল, দরবারীর দিকে তাকিয়ে দেখে বলেছিল— 'তুমি ভেবেছ আমি বরফে আর পাথরে তৈরি। তোমার মধ্যে মিশে যাওয়ার বাসনা কি আমার নেই ? তুমি আমার গা ঘেঁষে বসলে আমার সর্বাঙ্গ কি ভেঙে পড়ে না ?… কিন্তু একটি মেয়ের দুঃখ তুমি কী জানো…'

তারপর এক অদ্ভুত ভয়ে কেঁপে উঠে সীতা বলল— 'আমি বলছি না যে এ দুঃখ তুমি আমাকে দিয়েছ। ভগবান দিয়েছেন। ভগবানও

মেয়েমানুষের প্রতি অবিচার করছেন…'

'আমি সব জানি,' দরবারী নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা ক'রে বলল— 'পুরুষমানুষ সব সহ্য করতে পারে, অপমান সহ্য করতে পারে না…'

'কার আপমান ?'

দরবারী জবাব দেবার বদলে সীতাকে ধাক্কা মারল আর সে পিছন দিকে পড়ে গেল। লম্বা-লম্বা পদক্ষেপে দরবারী আলোর দিকে চলে গেল—

সীতা এমনি এক ভয়ে কাঁপছিল যে ভয় তার এই ছোট জীবনে সে কখনো অনুভব করে নি। এই ভয়ের অভিজ্ঞতা তার পিতার মৃত্যুতেও হয় নি। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে সে সব ভুলে গিয়েছিল! যেমন করে যন্ত্রণাকর ঘায়ের চারদিকে আলতোভাবে আঙুল বুলালে এক ধরনের সুখ, এক ধরনের আরাম পাওয়া যায় তেমনভাবে মাথার উপর মা হাত বুলালে তার সারা দুঃখ দূর হয়ে গিয়েছিল… ঐ বালির উপর পড়ে-পড়ে সীতা দমকে-দমকে ফোঁপাচ্ছিল। মাঝে কখনো কখনো মাথা তুলে দেখে নিচ্ছিল। কেউ তো তাকে দেখছে না। কেউ তো তাকে সাহায্য করতে আসছে না। দুঃখে পতিত রমণীর জন্যে কোনো স্ফূর্তিবান যুবক নিশ্চয়ই এগিয়ে আসছে কি…সামনে দীপশিখায় কোনো জিনিস চকমক করে উঠছে। সীতা তা তুলে নিল। ওটা তো সেই রুপোর ডিবে যা নীচে পড়ে গিয়েছিল আর এখন— তাতে বালি ঢুকে গেছে।

আসলে তো দরবারী সীতাকে ভালোবাসত কিন্তু সীতা যতটা ভালোবাসত ততটা নয়। এই দুনিয়ায় সীতা তার নাম সার্থক করতে এসেছিল আর এখন অশোকবনে পড়ে থেকে দেখছিল কেউ উপর থেকে উপহারের সঙ্গে আংটি ফেলে…কিন্তু রামচন্দ্রের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অনেক কিছু হয়ে গেছে। এখন তো ইংরেজী 'ফোন' এসে গেছে ; দরবারী এখন তার পুরা রস আদায় করতে চাইছিল।

ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলানো হয়েছিল। তিন দিন খুব খাটুনির

পর শিখ তিরখান কাজ শেষ করে চলে গেছে। সাফ-সুতরা বারান্দায় বসে দরবারী খালি-খালি নজরে সড়কের ঐ মোড়ের দিকে তাকিয়ে দেখছিল—ওখানে কোনো কাশনী বা কোনো সরৌটী, কোনো ধানী অথবা কোনো জোগিয়া রঙের ঢেউ ওঠে কিনা তা দেখছিল। দরবারীর কাছে তার ভাইপো মাহমুদ ওরফে বনওয়ারী শরকাঠি আর টিন দিয়ে তৈরি এক বেঢপ খেলনা নিয়ে খেলছিল—তা থেকে তার হাত কেটে যাবার ভয় ছিল। বোধহয় এই জন্যে অন্দরমহল থেকে সতবন্তী ওরফে কনীজ দৌড়ে এসে বাচ্চার কাছ থেকে তার খেলনা কেড়ে নিয়েছিল। বাচ্চা কাঁদতে শুরু করেছিল।

'হায় হায়', দরবারী আপত্তি করেছিল— 'আপা, কী করছ তুমি?'

'তুমি চুপ করে থাকো', সে বলেছিল—'তোমাকে হাজার বার বলেছি, আমাকে আপা বলে ডেকো না···দিদি বলতে কি লজ্জা হয়?'

'আচ্ছা জী', দরবারী বলল— 'আর আসল কথা তো তা নয়। দেখো তো ছেলেটা কেমন করে কাঁদছে··· পুরো নৌবাহিনী ডুবে যাওয়ার পর লর্ড কিচেনারও এমন করে কাঁদে নি··· ওর খেলনা ওকে দিয়ে দাও···'

'কী করে দিই··· কোথায় চোখে খোঁচা লাগাবে'—

'সব বাচ্চাই আজে-বাজে খেলনা নিয়ে খেলা করে। ক'জনের আর চোখে খোঁচা লেগেছে।'

'এ যত শয়তান এমন আর তো কেউ নয়?'

'সব মার কাছেই আপন বাচ্চা শয়তান বলে মনে হয়।'

আর মাহমুদ ওরফে বনওয়ারী খুব দুঃখের সঙ্গে কাঁদছিল। বাড়ির সবাই তার জন্য বিব্রত হয়ে উঠছিল। দরবারী তাক থেকে জাপানী বিড়াল তুলে নিয়েছিল— চাবি দিয়ে দিলেই তা দৌড়তে থাকে আর নানা কসরৎ দেখাতে শুরু করে। তাকে দেখে দেখে বাচ্চা তো কী বড়দেরও খুব মজা লাগে। কিন্তু বাচ্চাদের চাই সেই খেলনা যা কেউ কেড়ে নিয়েছে··· দরবারী নানারকম মুখভঙ্গি করে বিচিত্র ঢঙে খু-খু,

খা-খা শব্দ করেছিল, মুখে আঙুল দিয়ে হনুমান হয়েছিল, আবার জনি ওয়াকার, আগা··· কিন্তু বাচ্চা কাঁদতেই থাকল। তার নিজের সেই খেলনাটাই চাই। দরবারীর ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে এক থাপ্পড় মারে। যদি বাচ্চার আরো বেশি কান্নার ভয় তার না থাকত তবে সে তাকে নিশ্চয়ই মারত। দরবারী হঠাৎ চটে গিয়ে বলল—'শালা এখন চুপ কর···'

অন্দর থেকে আওয়াজ এল— 'কাঁদতে দাও ভাই।'

বাচ্চা কেঁদেই চলেছে। শেষপর্যন্ত দিদি জল্‌দি দৌড়ে এল— 'হায় রাম।'

'হায় আল্লা কেন বলছ না?'

'ভগবানের দোহাই তুমি চুপ করো।'

'খোদার দোহাই দিয়ে বলো···'

সতবন্তী ওরফে কনীজ যেমনভাবে খেলনা কেড়ে নিয়েছিল তেমন-ভাবেই তা ফিরিয়ে দিয়েছিল— 'নাও আমার বাপ'— খেলনা বাচ্চার হাতে দিয়ে সে বলেছিল। আর বাচ্চার দুঃখী অবস্থা দেখতে না পেরে তাকে তুলে নিয়েছিল, বুকে চেপে ধরেছিল আর দোল দিয়ে-ছিল, কাপড় দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিয়েছিল, নাক পরিষ্কার করে দিয়েছিল, চুমু খেয়ে আদর করেছিল···তার কথা অনুযায়ী 'খুব ঠাণ্ডা পড়েছে'···ফের নিজেই নিজেকে অনেক গালি দিয়েছিল···

'হায়, এমন মা মরে যাক··· এ দুনিয়ায় যেন না থাকে··· বাচ্চাকে কতই না কাঁদিয়েছে?···

তারপর আপন পতি ওরফে শৌহরের দিকে তাকিয়ে তাকে ধমক দিয়েছিল— 'দেখ তো কেমন মজা করে বসে আছে?'

সে উঠে দাঁড়িয়েছিল··· তাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

দরবারী বলল— 'এখন চাও তো কেবল হাত নয় মুণ্ডুও কেটে নিতে পারো।'

'কেটে নাও', দিদি বলল— 'আমি তো মরব···তোমাদের তো তাও হবে না।'

'হোক বা না হোক', দরবারী বলল— 'বলছি যে বোকারা তা'ই করে বুদ্ধিমানরা যা করে, কিন্তু হাজারবার না খেয়ে মরে যাবার পরে··· গোড়া থেকেই খেলনা কেড়ে নেবার বোকামিটা না করলেই পারতে।'

'হাঁ আমি তো বোকা', দিদি এ কথা বলে বাচ্চাকে নিয়ে অন্দরে গেল— 'মা হওয়া আর আক্কেল রাখা আলাদা কথা।'

দেখা গেল দিদির কাঁধের উপর মাথা রেখে বদমাশ মাহমুদ ওরফে বনওয়ারী হাসছে, যেন আপন সামর্থ্য আর ক্ষমতার বিষয় তার খুব ভালোভাবেই জানা আছে।

যখন অরোরা সিনেমার দিক থেকে আগত পথের মোড়ে দু-তিনবার নারঙ্গী রঙের ঢেউ উঠল তখনি দরবারী জল্‌দি-জল্‌দি পোশাক-আশাক ঠিক করে নিয়ে মাথায় টুপি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

মোড়ে সীতা দাঁড়িয়েছিল। সে একবার দরবারীর দিকে তাকিয়েছিল, তারপর অন্য দিকে দেখছিল। তার চোখদুটি আরো কিছুটা ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল; বরং আরো জলে ভরে গিয়েছিল।

'বলুন হুজুর... কী হুকুম?' দরবারী শুধাল।

সীতা কোনো জবাব দিল না। দরবারীর মনে হল যেন সীতা কিছুটা কাঁপছে। কিছুক্ষণ দরবারী তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—

'যদি চুপ করেই থাকবে তবে ফের···' এ কথা বলে সে ফিরেই যাচ্ছিল।

'শোনো', সীতা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল— 'আমাকে ক্ষমা করো। ঐ দিন আমার বড়ো ভুল হয়ে গেছে।'

দরবারী থেমে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখল—

'এখন তো তার ভুল হবে না?'

সীতা মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানাল।

'যেখানে যেতে বলব আমার সঙ্গে যাবে?'

সীতা মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছেছিল। দরবারীর শরীরে রক্তের চাপ বেড়ে গিয়েছিল ; যেন হঠাৎ ভিতরের উত্তাপ বাড়ছিল। সে তার আপন কর্কশ হাত ছড়িয়ে দিয়ে সীতার নরম হাত ধরে বলেছিল— 'সীতা, তুমি তো এমনই ভয় পাচ্ছ··· তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন আমি খুব নীচ।'

সীতা যেন এ কথাই শুনতে চাইছিল। সে বলল— 'না···এমন কথা কেন ?'

দরবারী আর সীতা সেখানেই পৌঁছল—

শিবাজী পার্কে দেয়ালের নীচে··· সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আজ আকাশে এমন কোনো মেঘও ছিল না যা ধরণীর গোল দিগন্তরেখা থেকে আকাশ পর্যন্ত প্রতিবিম্বিত রশ্মিকে এদিকে মাটির প্রতি ছড়িয়ে দেয়। এই কারণে আঁধার শীঘ্র শীঘ্র দুনিয়াকে ঢেকে দিয়েছিল। সামনে মহাত্মা গান্ধী সুইমিং পুলের চারপাশ একবার দেখা যাচ্ছিল আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল।

দরবারীর বর্ধিত ভালোবাসার সামনে সীতা লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল। দরবারী খুব রাগ করে বলল— 'কিছু হাসো, কথা বলো···' সীতাকে হাসতে হয়েছিল।

দরবারী সীতার ফাঁকা হাসির নকল করেছিল আর সীতা সত্যি-সত্যি হেসে ফেলেছিল ·· দরবারী সুযোগ পেয়ে বলেছিল— 'তোমার কি সত্যিসত্যি আমার উপর বিশ্বাস নেই ?'

'এ কথা নয়', সীতা বলল— 'তুমি আমাকে বিয়ে করে নিলেও তবু আমাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে··· বুঝতে পেরেছ— আমি এমনিই হাসছিল্যম।'

'না সীতা, আমি বুঝব না··· কোনোদিন বুঝব না।'

ঐ সময় কয়েকটি লোক হাতে লোহার শাবল নিয়ে এসেছিল। দরবারী চমকে উঠেছিল। যখন তারা শাবল দিয়ে বালি খুঁড়তে শুরু করল তখন সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তারা জাহাজের কিছু

লুকোনো মাল খুঁজছিল যা দু-এক দিন আগে তারা বালিতে গর্ত খুঁড়ে রেখে গিয়েছিল। এখন সমুদ্রে জোয়ার আসার আগেই তা তুলে নিতে চাইছিল। দরবারী আর সীতা উঠে গিয়ে কিছুদূরে দেয়ালের অন্য ধারে গিয়ে বসল। মুখ ঘুরিয়ে দেখল দেয়ালের উপর বোম্বাইয়ের বাসনমাজার কাজ করে এমন নীচু শ্রেণীর 'রামা'-দের কয়েকজন বসে আছে আর নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করছে। দরবারী তাদের দেখেও দেখতে চায় নি। সীতা ঘাবড়ে গিয়েছিল, লজ্জা পাচ্ছিল, ঘেমে উঠেছিল। সে তো পুরোপুরি দরবারীর হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল। আজ তার নিজের কোনো অভিপ্রায় ছিল না। সে কোনো অসন্তুষ্ট পুরুষকে খুশি করতে চেয়েছিল আর তার জন্যে যে-কোনো দাম দিতে প্রস্তুত ছিল।

তখন কয়েকটা রাস্তার বাজে ছেলে "এ মেরে দিল কঁহী···" গান গাইতে গাইতে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখনি এক পুলিশ সেখানে এসেছিল আর দরবারী রেগে গিয়ে উঠে পড়েছিল। লাল চোখ দিয়ে আশপাশের দৃশ্য দেখেছিল আর ইংরেজীতে একটা খারাপ গালি দিয়েছিল। সীতাকে সে বলেছিল—

'চলো সীতা আমরা জুহু যাব।'

'জুহু ?'

'হাঁ। ওঠো, কেডেল রোড থেকে ট্যাকসি নিয়ে নেব।' সীতা চুপচাপ উঠে দরবারীর সঙ্গে চলতে শুরু করেছিল। সীতা আর দরবারী জুহুর 'বীচে' এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে পারে নি কারণ তাতে বিপদ ছিল। রোজ কোনো-না-কোনো ঘটনা সেখানে ঘটে থাকে। এই কিছুদিন আগে একটা খুন হয়ে গিয়েছে। কয়েকটা গুণ্ডা এক মিঞা-বিবিকে জীবন-সাগরের দুই তীরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু সেদিন জুহুর সব হোটেল সব কটেজ খরিদ্দারে ভরা ছিল।

এক ঘণ্টা - দেড় ঘণ্টা পরে দরবারী আর সীতা ফোর্টের দিকে যাচ্ছিল। পথে সীতা কোনো কথা বললে দরবারী অন্য কোনো জবাব

দিয়েছিল। কিন্তু তা এলোমেলো অসম্বদ্ধ। তার কথায় ছিল এক অদ্ভুত রকম তোতলামি। মনে হচ্ছিল মুখের মধ্যে কোনো নেশার জিনিস রেখেছে— যার ফলে জিব ফুলে গেছে।

ট্যাক্সি হাজীঅলি হয়ে তাড়দেও অঞ্চলে পৌঁচেছিল। সেখান থেকে অপেরা হাউস হয়ে পৌঁচেছিল হর্নবি রোডে— ঐ পথের এখন নাম রাখা হয়েছে মহাত্মা গান্ধী রোড। এক হোটেলে পৌঁছে দরবারী ম্যানেজারকে শুধাল— 'কোনো কামরা খালি আছে?'

ম্যানেজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দরবারীর দিকে দেখল। দরবারীর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যে সে কোনো ঘটনা ঘটিয়ে এসেছে অথবা ঘটাতে যাচ্ছে। পিছনে দাঁড়িয়ে সীতা মাটির দিকে তাকিয়ে থর-থর করে কাঁপছিল। দুজনে স্বভাবগত অপরাধী ছিল না। বড় কাঁচা। দয়াহীন প্রকৃতির হাতে গ্রেফতার হয়ে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল।

ম্যানেজার প্রশ্ন করেছিল— 'আপনারা কোথা থেকে আসছেন?'

'জী?' দরবারী হঠাৎ ভেবে নিয়ে বলেছিল— 'ঔরঙ্গাবাদ থেকে।'

'বেশ।' ম্যানেজার দরবারীর পিছনে দাঁড়ানো সীতার দিকে তাকিয়ে আবার দরবারীর কালী-রঙের চেহারা দেখে বলেছিল—

'আপনাদের মালপত্র কোথায়?'

'জী। মালপত্র তো নেই।'

'মাফ করুন', ম্যানেজার দরবারীর দিকে তাকিয়ে এমনভাবে বলেছিল যেন সে কোনো দুর্গন্ধ পচা জিনিস। ফের বলেছিল—

'আমার কাছে এখন কোনো রুম খালি নেই।'

'মতলবটা কী? এখনি তো টেলিফোনে··· ?'

27 নম্বর বেয়ারা একটা ট্রেতে বাদাম, মুগের ডাল, সোডার বোতল আর চাবি নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে বলে গেল— 'সাহেব, এই হোটেল সম্ভ্রান্ত লোকদের জন্যে।'

দরবারী কিছু বলতে পারল না, যদিও সে জানত আর পুরো

বিশ্বাসের সঙ্গেই জানত এই বেয়ারার টিপ্‌স এক টাকার বেশি নয়, আর মাননীয় ম্যানেজার সাহেবের ইজ্জত পাঁচ টাকায়··· আর আজ এরা সকলে একেবারে ভালোমানুষি, ইজ্জৎ আর সম্ভ্রান্ততার পুতুল হয়ে বসে আছে। তারা ইজ্জৎ আর সম্ভ্রান্ততার পুতুল হোক বা না হোক, একটা কথা নিশ্চিত যে জীবনে কিছু-না-কিছু করার জন্যে অভ্যস্ত হবার প্রয়োজন আছে। দৃষ্টিতে এক পেশাদারী ভাব আনা চাই যাতে হিম্মৎ, সাহস আর বেহায়াপনা ধরা পড়ে— এর সামনে বিরোধীর শিষ্টতা, সম্ভ্রান্ততা আর সাধুতা মিথ্যা হয়ে যায়··· দরবারী নিজের ভিতরে কোথাও দুর্বল, কোথাও ভিতু ছিল— সে ছিল এক আ-কাটা পালিশ-বিহীন হীরা···

ফিরে আসার সময় সে ইংরেজীতে গালাগালি করছিল— সে হোটেলের বন্দোবস্তকারীদের শোনাতে চাইছিল আর তাদের থেকে লুকোতেও চাইছিল—

'চলো সীতা' দরবারী বলল— 'ফের কোনো দিন···'

দুজনে ট্যাক্‌সিতে বসে বাড়ির দিকে চলল।

জীবন হয়ে গিয়েছিল নিরানন্দ। পরাজয়ের এইরকম অনুভূতি দরবারীর কখনো হয় নি। তার কল্পনায় কিছু লোক 'হীরো' হয়ে গিয়েছিল আর অনেক হীরো এসে তার পায়ে পড়েছিল।

আজ তার কোথাও যাবার অভিপ্রায় ছিল না, কোনো প্রোগ্রাম ছিল না, যদিও এক বিরক্তিকর অনুভূতি নিয়ে সে দফতর থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসেছিল। সে শ্রান্ত, ভগ্ন, নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। এ সন্ধ্যার পরাজয় আর বেইজ্জতীর পর এক নিশ্চিন্ত-তার অনুভূতি হয়েছিল আসলে যাতে নিশ্চিন্ততা ছিল না। তা ছিল সেই আগুন যা জন্ম নিতে পারছিল না। এই কারণে বড় বড় লোক চিন্তাকে খুব মূল্য দিয়ে থাকেন। এরকম কোনো মানুষের জন্ম হয় নি, আর যদি হয়েও থাকে, তবে আপনি মানুষের সন্তানের মতো তাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন না, তাকে গলা টিপে মারতে পারেন

না, কারণ তুই অবস্থার মধ্যেই মৃত্যু আছে। এই মস্তিষ্ক কোনো এক কোণে চুপচাপ পড়ে থাকবে আর সেইসময় উঠে আসবে যখন আপনি পুরোপুরি অস্ত্রহীন হয়ে পড়বেন— একেবারে হাত-পা-বিহীন— শবদেহকে স্নান করানোর মতোই নিষ্প্রাণ—

দরবারী ঐ সময় বারান্দায় বসে 'ডন বস্কো'র দেয়ালের গায়ে লেগে-ওঠা গাছগুলিকে দেখছিল। গাছের ছায়ায় মোহল্লার ধনীদের মোটরগাড়িগুলি বিশ্রাম নিচ্ছিল। কয়েকটা গাড়ির মালিক ছিল ধনী মজদুররা যারা ঘর থেকে দফতর আর দফতর থেকে সোজা ঘরে চলে আসত আর বিবির সঙ্গে ঝগড়াতেও তারা পুরো নিশ্চিন্ত হয়ে যেত। আর কয়েকটা গাড়ির মালিক ছিল এমন-সব লোক যারা চলাফেরায় গাড়িগুলিকে বদ্ মেয়েছেলেদের ঘর বানিয়ে তুলেছিল। তাদের ড্রাইভারদের একমাত্র কাজ ছিল সন্ধ্যা থেকে গাড়ি চকচকে পালিশ করা আর আপন মুখ বন্ধ রাখা। এ কারণেই তাদের বেতন দেওয়া হত।··· এই বেয়ারার নম্বর ছিল 28।

দরবারী ঐদিন হোটেলে উপজিত নিরাশাকে মোটর গাড়িকে বাড়তে-থাকা আশার সঙ্গে টেনে-হিঁচড়ে সম্বন্ধযুক্ত করে নিয়েছিল। কিন্তু তাতে লাভ কী? আশাকে মেজেঘষে পালিশ করলেই মোটর-গাড়ি পাওয়া যায় না। বাপ গিরধারীলাল মেহতা তো তার টাকাপয়সায় হাওয়া পর্যন্ত লাগায় না। পরের জন্মে ও সাপ হয়ে লুকানো সম্পত্তি পাহারা দেবার মতলব করেছিল।

সালেহ্ ভাই ওরফে সরদারীলাল বিবি-বাচ্চার সঙ্গে নিজের বাড়ি চলে গিয়েছিল। থেকে গিয়েছিল বাঁজা সন্তানহীনা বউদি। বাচ্চা না হবার জন্য ভায়ের সঙ্গে বউদি ঝগড়া করত। এ বলত— তোমার কোনো ত্রুটি আছে, আর সে বলত— তোমারই ত্রুটি আছে। এ বলত—তুমি ডাক্তার দেখাও, আর সে বলত— তুমি নিজেকে পরীক্ষা করাও। অজাত বাচ্চাকে বউদি নৈরাশ্যের সঙ্গে দেখত আর মাথা কুটত।

দরবারী পুরোপুরি বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে জানত সে যদি

আর কিছুক্ষণ ঘরে থাকে তো মা বিয়ের কথা বলতে আসবে। আর সে এখন বিয়ে করতে চাইছিল না। হাঁ, কিছুদিন তো জীবন ভোগ করে নিই। শেষ পর্যন্ত একদিন না একদিন প্রত্যেকেরই তো বিয়ে হবে—

কার সঙ্গে বিয়ে? তার মাথায় চট করে সীতা চলে এল। সীতা এমনিতে ঠিক আছে কিন্তু বিয়ে ব্যাপারে তাকে দিয়ে চলবে না। সে খুব সংকোচশীলা আর সমর্পিতা যুবতী। তার চেহারাও খারাপ নয়। কিন্তু বউ— বউ হল অন্য জিনিস। তার কিছুটা চুলবুলে হওয়া চাই —এদিক-ওদিক ঝোঁকা চাই যাতে করে পুরুষ তার কান ধরে বলতে পারে—'বিধবার বেটি, ফের এদিক-ওদিক?— এমন করে পুরুষ-মানুষের গায়ে ঢলে পড়ছে যেন তার স্বামী নয়, বাপ।'

—আমি কি কেবল ভাড়া আদায় করে বেড়াব?

হাঁ, কিছুক্ষণের জন্যে প্রেমের ব্যাপারে সীতার চেয়ে আচ্ছা জিনিস আর কেউ নেই। আহ্, কী মাল! ঐ সময়ে মিস্ত্রীকে আর বব্বলকে দেখা গেল।

মিস্ত্রী দূর থেকেই 'বাবুজী'র দিকে আঙুল তুলে ইশারা করে আসছিল। বব্বল ওখান থেকেই গুঁ-গুঁ, গাঁ-গাঁ করতে করতে হুমকি দিচ্ছিল। বব্বলের মধ্যে হঠাৎ জীবন লাফিয়ে উঠেছিল যেমনভাবে মাটির উপর 'বল' লাফিয়ে ওঠে আর মিস্ত্রীর পক্ষে তাকে সামলানো মুশকিল হয়ে পড়েছিল।

আজ বব্বল খোদার পোশাকে নয়, মানুষের পোশাকে ছিল। একটা ময়লা বেনিয়ান পরেছিল। হাঁ, নীচে ছিলেন আল্লাহ্— কেবল আল্লাহ্।

কাছে আসতেই বব্বল দুই হাত ছড়িয়ে দিয়েছিল— 'হতচ্ছাড়া, আমি যেন তোর জন্যে কুড়ুমুড়-ভাজা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।' অন্দরে যাওয়া আর বাইরে এসে তার সামনে দাঁড়ানোর যে সময় তার মধ্যে বব্বলের ধৈর্যের শেষ সীমা পেরিয়ে যাচ্ছিল।

দরবারী কুড়মুড়-ভাজা নিয়ে বাইরে এল। তার খেয়াল হল যে

মিস্ত্রী এক রমণী আর বব্বল তার বাচ্চা। আর এ-সব কত পবিত্র! গরিব লোকের মধ্যে বাপ থাকে কিন্তু তা কেবল লোক-দেখানো জিনিস।

তখন দরবারীর মস্তিষ্ক খুব দ্রুত কাজ করছিল। সে এক বৃত্তের মধ্যে ঘুরছিল আর ঘুরে-ফিরে সেখানেই আসছিল। এখন যেন তার সামনে থেকে পর্দা উঠতে লাগল। সে চোখ খুলে দেখছে আবার চোখ বন্ধ করছে। দরবারীলাল আজ ওখান থেকেই বব্বলকে কুড়মুড়-ভাজা দিয়ে দিল। কে জানে কী ব্যাপার, আজ দরবারী বব্বলকে কোলে নিল না। সে যেন তাতে লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু বব্বল যেন রবারের বল— দেয়ালে লেগে আবার ফিরে আসে। এ নয় যে আজ কুড়মুড়-ভাজা চাই না। তার কুড়মুড়-ভাজাও চাই আর আশমানের বাদশাগিরিও চাই। বব্বল বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিল— আজ এই বাবু আমাকে কোলে নিচ্ছে না কেন?

'আজ তুমি কত পয়সা উপার্জন করেছ মিস্ত্রী··· ?' দরবারী কিছুটা লজ্জা করেই প্রশ্ন করল।

'এই আনা-চোদ্দ।'

'কেন— কেবল চোদ্দ আনা কেন?'

'আজ আমার মর্দ নাগপুরে চলে গিয়েছে', মিস্ত্রী অকুতোভয়ে বলল।

'তোমার মর্দ?' দরবারী অবাক হয়ে বলল—

'তুমি কোনো মর্দ বেছে নিয়েছ নাকি?'

মিস্ত্রী হেসে বব্বলকে দুহাতের মধ্যে নিয়ে দরবারীর সমান-সমান উঁচু করে তুলে ধরল, বলল—

'এ আমার মর্দ— আমার উপার্জনকারী পুরুষ— একে আজ এর মাসি পারেলের চুগাভাঁটিতে নিয়ে গিয়েছিল। এই বেনিয়ান দিয়েছে। এই বদমাশ পড়তেই চায় না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফেলে দিতে চায় যেন সারা দুনিয়ার বোঝা তার কাঁধে চাপানো হয়েছে—'

দরবারী বুঝে নিয়েছিল আর হেসেছিল। এখন পর্যন্ত সে বব্বলকে

দু হাতের মধ্যে নেয় নি আর বব্বল কুড়মুড়-ভাজা ইত্যাদি সব ভুলে গিয়ে হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছিল।

মিস্ত্রী বলল— 'উলঙ্গ থাকার অভ্যাস হয়ে যায় তো বড় হয়ে গিয়ে কী করবে?'

'এখনকার চেয়েও ভালো দেখাবে মিস্ত্রী।'

বব্বল হুম-হুম করে যেন এ কথা বলছিল— 'মিথ্যা কথা— ভালো দেখাচ্ছে তো আমাকে নিচ্ছ না কেন?' সে এখন খুব চেঁচামেচি করছিল— 'হেঁা··· হেঁা··· হেঁা'।

'বব্বল থাকলে তুমি কত উপার্জন করতে পারতে?' দরবারী শুধাল।

'এই'—মিস্ত্রী বব্বলকে নীচে নামিয়ে দিতে দিতে বলল— তার দুহাত অবশ হয়ে গেছে— 'এ যদি থাকে তা হলে আমার তিন টাকা হত— চার টাকাও—'

দরবারী নিজের পকেট থেকে দশ টাকার নোট বার করে মিস্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে ধরল—

'এ কী বাবুজী?' সে বলল। তার মুখ লাল হয়ে যাচ্ছিল।

'তুমি নাও-না,' দরবারী বলল, তারপরে এদিক-ওদিক দেখে বলল —'জল্‌দি নিয়ে নাও, নচেৎ আর-কেউ দেখে ফেলবে···'

মিস্ত্রী এদিক-ওদিক দেখল। এখন তার মুখ গাঢ় লাল হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি দশ টাকার নোটটা নিল আর এদিক-ওদিক দেখে নিজের সায়ার ঘেরের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল। তারপর সে অপেক্ষা করছিল ঐ কথা শোনার জন্যে— যে কথা সে বছরে মুশকিলের সঙ্গে তিন-চার বার শোনে। কিন্তু মিস্ত্রীর রঙ কালী হয়ে গেল যখন সে দরবারীর কথা শুনল—

'মিস্ত্রী, তুমি তো জানো,' দরবারী বলল— 'আমি একে কত স্নেহ করি— বব্বলকে— যদি তুমি একদিনের জন্যে আমাকে দিয়ে দাও— '

মিস্ত্রী কিছু বুঝতে পারল না...

দরবারী বলল— 'আমি একে কল্‌জের সঙ্গে লাগিয়ে রাখব— মায়ের মতো, তোমার মতো··· একে আমার এত ভালো লাগে।' তারপর দরবারী হাত বাড়িয়ে বব্বলকে কোলে নিয়েছিল।

বব্বল একেবারে খুশিতে উছলে পড়েছিল। দরবারীর কোলে এসে সে কুড়মুড়-ভাজার জন্যে এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিল— যেমনভাবে চলবার সময় ময়ূর ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে।··· তার গোলগাল কচি-কচি হাত সাইকেলের মতো চালাতে শুরু করেছিল। দরবারী কুড়মুড়-ভাজার কয়েকটি দানা বব্বলের মুখের মধ্যে দিয়েছিল —যা পেয়ে গেলেই বব্বল সাধারণত মায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ত কিন্তু আজ সে দরবারীর দু হাতের মধ্যে শয়তানী খেলার ভঙ্গি করছিল। কখনো বলছিল, ছেড়ে দাও। নীচে নামিয়ে দাও। কখনো বলছিল, ধরো, বুকে তুলে নাও।— মাঝে মাঝে মায়ের দিকে দেখছিল। হাসছিলও। কিন্তু দরবারীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। মাকে বিরক্ত করছিল যেমনভাবে দরবারীকে বিরক্ত করেছিল।

মিস্ত্রী এখন পর্যন্ত ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়েছিল আর অবিশ্বাসের ঢঙে বাপ-বেটার মতো দুই মূর্তিকে দেখছিল।

'কোথায় কখন আপনার পোষাক খারাপ করে দেয় যদি—'

'তা হলে কী হবে?' দরবারী বলল— 'বাচ্চাদের সব-কিছুই অমৃত।'

মিস্ত্রীর দুচোখ জলে ভরে গেল। গোড়ায় সে ভেবেছিল জীবনে অনেক-কিছুই তার কাছে দুর্লভ, কিছুকালের জন্য সে মর্দকে পেয়েছে। সে তখন ভাবল আমার বাচ্চার বাপ পাওয়া গেছে— প্রথম জিনিসের চেয়ে দ্বিতীয় জিনিস অনেক বড়।

'আমি ওকে খাওয়াব মিস্ত্রী'— দরবারী কথা দিয়েছিল— 'তুমি রাত দশটার কাছাকাছি একে নিয়ে যেয়ো।'

'আচ্ছা', মিস্ত্রী মাথা হেলিয়েছিল।

মিস্ত্রী চলে গেল। ফের থেমে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাচ্চার দিকে দেখল। বাচ্চা দরবারীর দু হাতের মধ্যে খেলা করছিল আর নিজের চারদিকে দরবারীর বন্ধ মুঠি খোলার জন্য চেষ্টা করছিল

আর তা খুলতে না পেরে রেগে যাচ্ছিল। মিস্ত্রী তাকে ডেকেছিলও। ববল তাকিয়ে দেখেও নি। আজ তার কোনো কথারই পরোয়া ছিল না। বাপের পরোয়া ছিল না। মায়েরও ছিল না। মিস্ত্রী আবার চলে যেতে থাকে কিন্তু তার হৃদয় সেখানেই থেকে গিয়েছিল; থেমে গিয়ে সে ফিরে তাকিয়ে দেখছিল। আর যখন সে এ কথা ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছিল যে ববল থেকেই যাবে, তখন সে তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল। কিছু দূর গিয়ে সে তার সায়ার ঘের থেকে দশ টাকার নোটটা বার করে নিয়ে সেটার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যেমনভাবে কেউ তার পতির দিকে তাকায়।

দরবারী ববলকে নিয়ে অন্দরে এল। কামরার অনেক জিনিসের প্রতি ববলের খুব কৌতূহল দেখা গেল। তার কাছে প্রতি জিনিসই নতুন। প্রতি জিনিসই সে মুখে দিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে চাইছিল। এমনই অভিজ্ঞতা যার কোনো সীমা নেই। এমনই স্বাদ যার কোনো সীমা নেই। তখনই দরবারীর মা ঘরের ভিতরে এসেছিলেন। দরবারীর কোলে বাচ্চাকে দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন। নাকের উপর আঙুল রেখে বলেছিলেন— 'হায় রাম, এ কে?'

'মা, এ হল মিস্ত্রীর ছেলে ববল', দরবারী বলল, 'একে আমার খুব ভালো লাগে।'

'ওর মা কোথায়?'

'চলে গেছে। আমি কিছুক্ষণ খেলা দেবার জন্যে ওদিকে গিয়েছি··· একবার জন্ম দিয়েছে আর মায়ের কী কাজ?' দরবারী মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল—

'যা রে যা', মা বললেন— 'ছ-আটমাস পর্যন্ত মায়ের প্রয়োজন হয়, তারপরই নিজেই নিজের মতো ছেলে বনে যায়।'

'আচ্ছা মা', দরবারী বলল— 'আমি একে পোদ্দার কলেজের সামনেকার ময়দানে নিয়ে যাচ্ছি। ওখানে জগমোহনের কাছে আমার বই ফেরত দিতে হবে। তুমি একে একটু ধরো।'

মা চমকিত হয়ে উঠলেন— 'হা— নোংরা' হাত হেলিয়ে বললেন

—'আমি একে ছোঁব না।'

বউদি একটু আগে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল— 'এতই যদি শখ তবে নিজের বউ-বাচ্চা কেন নিয়ে আসছ না? বিয়ে করবে না?'

'না', দরবারী বউদির উপর রেগে উঠে বলল— 'অপরের বাচ্চা আমার ভালো লাগে।'

বউদি দীর্ঘশ্বাস নিল— 'ভগবান যদি না দেন তো কে কী করতে পারে?'

দরবারী বব্বলকে নীচে মেজের উপর বসিয়ে দিল। একটা জার্মান সিলভারের চামচ তার মনোযোগ আকর্ষণ করল। দরবারী ভিতরের ঘরে চলে গেল আর বব্বল মুখে চামচ ঢুকিয়ে চুষতে লাগল। বোধহয় তার আরো দুয়েকটা দাঁত বেরিয়েছিল।

হঠাৎ বব্বলের নিজেকে একলা বলে মনে হল। সে প্রথমে মায়ের দিকে, তারপর বউদির দিকে হাত ছড়িয়ে দিল। মা তো ছিঃ ছিঃ করে ভিতরে চলে গেলেন। বউদি এক মুহূর্তের জন্য নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরই যেন অন্তরের কোনো স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি তাকে অসহায় করে দিল আর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে বব্বলকে তুলে নিল। তাকে বুকে জাপটে ধরে দুলতে লাগল যেন কোনো অপার সুখশান্তির দোলনায় দুলছে। তার কাছে বব্বল নোংরা বলে মনে হয় নি। মনে মনেই সে বব্বলকে নাইয়ে-ধুইয়ে ভিখারিনীর ছেলেকে কোনো রানীর ছেলে বানিয়েছিল। অন্তরে অন্তরে সে শত শত রেশমী আর সূতীর ফ্রক বানিয়েছিল আর ভেবেছিল ছেলেটা এত সুন্দর, আমি এর জন্যে মেয়েদের পোশাক বানাব—

অন্দরে পৌঁছে দরবারী সুটকেস বার করল। তার মধ্যে কিছু কাপড় রাখল, তার উপরে কয়েকটা বই। তারপর ধপ্ করে সুটকেস বন্ধ করে বৈঠকখানার দিকে চলল।

বৈঠকখানায় পৌঁছে দেখে বব্বল যেন চিরদিনের মতো বউদির বুকে মাথা রেখে পড়ে আছে। দরবারী পৌঁছবার পর সে মুখ তুলে এক বিজয়ীর মতো দরবারীর দিকে তাকিয়ে দেখল। পর মুহূর্তেই

কে জানে কিসের ভাবে, কী হিসেব করে সে দরবারীর দিকে তার দুই হাত বাড়িয়ে দিল। দরবারী এগিয়ে গিয়ে এক হাতে ববলকে তুলে নিল, অপর হাতে সুটকেস ধরে 'আচ্ছা বউদি'··· বলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

দাদারে পৌঁছে রেডিমেড কাপড়ের দোকান থেকে দরবারী ববলের জন্যে একটা জামা আর তার সঙ্গে একটা জাঙিয়া কিনল। জামা তো ববল যেমন-তেমন পরে নিল, কিন্তু জাঙিয়া পরাবার সময় সে খুব হৈ-চৈ লাগিয়ে দিল, হাত-পা ছুড়ে চেঁচাতে শুরু করে দিল। যতক্ষণ সে দাঁড়িয়েছিল ততক্ষণ নিজের দুই ঠ্যাঙ দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছিল। তারপর হুম্-হুম্ করে পড়ে গেল। দরবারী এক হাত দিয়ে তাকে ধরে, সে অপর হাতের দিকে ট'লে পড়ে যায়। তারপর মুখ তুলে দরবারীর দিকে অবাক হয়ে দেখে— যেন সে বলছে—

তুমি তো অদ্ভুত লোক— একটা বাচ্চাকেও ধরতে পার না। !

তারপর হঠাৎই এক বিজলী বাতির প্রতি তার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। সে উপর দিকে তাকিয়ে হুম্ হুম্ করল। বিজলীর ভয়ে দরবারী হাত উপর দিক তুলল যাতে ববল পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে টেবিল ফ্যানের জালির মধ্যে নিজের আঙুল ঢুকিয়ে না দেয়। দোকানদার ঝাঁপ দিয়ে পড়ে হাত সরিয়ে নিল, নইলে তো জনাবের আঙুল উড়েই যেত। ঝট করে হাত সরিয়ে দেওয়াতে সে কাঁদতে শুরু করে দিল আর যখন দরবারী তাকে কোলে তুলে নিল তখন সে অনুযোগের দৃষ্টিতে দরবারীর দিকে, তারপর দোকানদারের দিকে তাকিয়ে তার হাত তুলে দেখিয়েছিল, যেন বলছিল— ও আমাকে মেরেছে।

ট্যাক্সিতে বসেই ববলের কিছুটা রাগ হয়ে গিয়েছিল। আসলে ঐ জাঙিয়ার জন্য তার কষ্ট হচ্ছিল। সে 'সারা জীবনে' জাঙিয়া পরেই নি। দরবারী তাকে সিটের উপর বসাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে ধড়াস করে শুয়ে পড়েছিল। যেন সে বলছিল—'তুমি

গাড়িতে বসো, আমি তোমার উপর বসব— নয়তো আমাকে নিয়ে চলো বাজারে— যেখানে লোক আসছে যাচ্ছে।' আবার বব্বল জোরের সঙ্গে উপর-নিচ করে শেষ পর্যন্ত জাঙিয়া খুলে ফেলেছিল আর সেটার উপর লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে এমনভাবে দলামচা করে দিয়েছিল যে কোনো রমণী কোঁচকানো ভাঁজগুলিকে সোজা করে দিতে পারত না। এখন জাঙিয়া খুলে ফেলার পরে সে খুশি হয়ে গিয়েছিল। এক অদ্ভুত রকমের স্বাধীনতার অনুভূতি তার হয়েছিল, গাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে সারা দুনিয়াকে দেখছিল আর দেখা দিয়েছিল।

দরবারী যখন সীতাদের বাড়ি পৌঁছল তখন সীতা ঘরে ছিল না। দরবারী কপাল চাপড়েছিল। মা জানিয়েছিলেন যে সীতা 'প্রভাদেবী'তে কুমুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। 'প্রভাদেবী'-এলাকা খুব একটা দূরে নয়, কিন্তু কুমুদের খোঁজ পাওয়া যাবে কী করে? যদি জিজ্ঞাসা করে তা হলে মা বলবেন— কেন, কী দরকার? এইজন্যে চুপ করে থাকাই ভালো।

তার উপর আর-এক দুঃখ— মা বলতে থাকেন আগে ম্যাল-এ থাকত যে সিন্ধী সে 'নোস্ট' দিয়ে দিয়েছে। নোটিস তো দিয়ে দিয়েছে, এখন সে কী করে? এই সময়ে তো পরিস্থিতি তাকে নোটিস দিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ বসে থেকে দরবারী বুড়ি মায়ের বকবকানি শুনেছিল আর বলেছিল যে বব্বল তার ভাইপো। খুবই স্নেহের বাচ্চা, কিন্তু ওর প্রতি মায়ের তেমন কোনো টান দেখা গেল না। কেবল একবার বলেছিলেন— 'কী রে?' বব্বল জবাবও দিয়েছিল। কিন্তু সীতার মা বকবক করেই চলেছেন। মায়ের কথা বব্বলের জানা ছিল, কিন্তু মা বব্বলের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি আবার কাঁদতে বসেছিলেন— 'কমিটি বলছে প্রতি বছর মেরামতের জন্যে এত টাকা ঢালো। এখন লোকে রুটি খায় না মেরামত করায়। কী কী সব আইন পাস হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস সরকার তো ডোবাবার জন্য এসেছে। অষ্টগ্রহ সমাবেশে কী হবে জানো? আমি তো

জগাধ্রীতে বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছি···তুমি বিয়ে করবে কবে ?'

কিছুক্ষণ পরে সীতার মা 'বোর' হয়ে গেলেন। বললেন— 'বুঝতে পারছি না সীতা আসবে কি আসবে না। তুমি তো ট্যাক্সিতে এসেছ। আমাকে একটু 'মাহিম'-এর কাছে নামিয়ে দাও···'

'মা-জী, আমি তো মাহিম-এর দিকে যাচ্ছি না—'

'কোন্‌দিকে যাচ্ছ ?'

'শহরে দিকে।'

'ঠিক আছে', মা বললেন— 'ওখানে পারেল-এ আমার কাজ আছে···হিন্দোলা আসছে তো। আমাকে মূলো কিনতে হবে। জানো মূলো কী জিনিস।'

দরবারী কপালে করাঘাত করে থেকে গিয়েছিল। ববৃবল বিরক্ত করছিল। ওদিকে বাইরে ট্যাক্সির মীটার চড়ছিল। সে কিছু ভাবতেই পারল না। মনে মনে শিরে কর'ঘাত করে বলল— 'চলো মা-জী···আমি তোমাকে পারেল-এ নামিয়ে দেব। পথে কুমুদের বাড়ি পড়বে না ?'

'হ্যাঁ তো', মা উঠতে উঠতে বললেন— 'আগুন লেগে যাক্— এই বোম্বাই বাজারের মুখে আগুন লাগুক— বিশ বার গেছি বিশ বারই বাড়ি ভুল করেছি—'

'চলো, একুশ বারের বারও ভুলে যাবে।'

'কিন্তু সীতাকে নিয়ে তুমি কোথায় যাবে ?'

'দিদির কাছে···বললাম না···'

'শুনেছি ও মুসলমান হয়ে গেছে ?'

'কী কথা বলছ মা-জী ?' দরবারী যেন কোনো পড়ে-যাওয়া পাথরকে ধরে ফেলল— সতবন্তী' নার অন্য কোনো মুসলমান মহিলার নাম হতে পারে···?'

সীতার মা দরবারীর উপর পুরো আধিপত্য বিস্তারের আগেই সীতা চলে এসেছিল। বসন্তের এক তীব্রগতি বাতাসের মতো আঁচলে পাতা আর ফুল নিয়ে এসেছিল। সে আয়রন-রঙের এক

চোলী পরেছিল আর বেগনী চাউল-রঙের হ্যাণ্ডলুম শাড়ি গায়ে জড়িয়েছিল যাতে করে শরীরের সব উঁচু অংশ এক স্বাধীনতা পেয়েছিল, যেন এক ঝড়ের মাথায় চড়েছিল। সে ছিল বসন্তের এক তীব্রগতি বাতাস, কিন্তু দরবারীর কাছে তা ঝরাপাতার খবর নিয়ে এসেছিল। তার ভিতরে ফুল-পাতা এক এক করে শুকিয়ে যাচ্ছিল, পড়ে যাচ্ছিল, আর কিছু ধুলোর ঝড়ের সঙ্গে উড়ে যাচ্ছিল··· আর ডালে যা থেকে গিয়েছিল তা শুকিয়ে গিয়ে নিজে নিজেই ঝরে পড়ছিল. হৃদয়কে আন্দোলিত করছিল—

সীতা এসে গোড়াতেই বব্বলকে দেখে চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিল— 'এ কার বাচ্চা?' আর দৌড়ে বাচ্চার কাছে গিয়েছিল— 'এই···কত সুন্দর বাচ্চা···ববলু···'

'হাঁ' দরবারী বলল— 'এর নাম বব্বল। তুমি কী করে জানলে?'

'আমি কী করে জানব?' সীতা হাততালি দিয়ে বব্বলকে কোলে আসবার জন্য ডাকছিল। সে বলল—

'প্রত্যেক বাচ্চার চেহারা থেকেই তার নাম জানতে পারা যায়··· তুমি জানতে পার না?'

বব্বল প্রথমে সংশয়ের দৃষ্টিতে সীতার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর সে মুচকি হেসেছিল। যেন সে অনেক বছর ধরে তাকে জানে। দাঁড়িপাল্লার ঢঙে সে তার দু হাত তুলেছিল। সীতা তাকে তুলে নিয়েছিল, বুকে জাপটে ধরেছিল, আর সব মেয়েদের মতোই সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়েছিল। ব্যস্, সম্পর্ক কায়েম হয়ে যাবার পরই বব্বল ছোট আলমারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, একটা ঝাঁপির প্রতি ইশারা করে 'উ-উঁ' করতে শুরু করেছিল— যেন সে বলছে— ওটার মধ্যে আমার জন্যে কিছু আছে?···

দরবারীর দৃষ্টিতে ছিল স্বপ্ন। সীতা যখন দেখেছিল তার দৃষ্টিতে ছিল শয্যা আর বাচ্চা। বোধহয় সীতার দু চোখের অশ্রুতে বব্বল প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল। দরবারী কিছুটা অস্থির হয়ে বলেছিল— 'এক ঘণ্টা ধরে তোমার পথের দিকে তাকিয়ে আছি···দিদি তোমাকে

ডেকেছে…'

সীতা মায়ের প্রতি তাকিয়ে ছিল— 'মা— ?'

'হাঁ বাছা', মা অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন।

'দাঁড়াও… আমি এর জন্য কিছু বিস্কুট আনি।'

দরবারী অধৈর্যের সঙ্গে বলেছিল—

'হবে, হবে, তুমি চলো….আমার এত সময় নেই…' তারপর সীতা বব্বলের গাল টিপতে টিপতে রওনা হল। বলছিল—

'তুই আত্ত্যা থোতা-মোতা গোলগাল বব্লু।'

সীতা মনে কোনো সংশয় না রেখেই রওনা হয়েছিল। বাইরে ট্যাক্সি দেখে বলেছিল— 'এতে চড়ে যাবে ?'

দরবারী মাথা নেড়েছিল। ট্যাক্সি ড্রাইভার এতক্ষণ অস্থির হয়েছিল, এবার খুশি হয়ে গেল। পিছনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে ট্যাক্সির দরজা খুলেছিল। বব্বল, সীতা, শেষে দরবারী উঠে বসেছিল। যখন সুটকেসের প্রতি সীতার নজর পড়েছিল তখন তার মুখের উপর এক সংশয়ের ছায়া পড়েছিল।

'এই সুটকেস ?'

'হাঁ', দরবারী বলেছিল।

'দিদির ওখানেই যাচ্ছ তো ?'

'কোথাও যাচ্ছি…তাতে তোমার কী', সীতার দিকে এক রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল— 'তুমি বলেছিলে না… যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব·· '

সীতা কিছু কিছু বুঝতে পারল। দরবারীর মুখের রঙ…সুটকেস… বাচ্চা…সে সভয়ে বব্বলকে সীটের উপর বসিয়ে দিয়ে নাকের পাটা ফুলিয়ে বলেছিল— 'হাঁ বলেছিলাম'—

দরবারীর প্রতি সীতা খরদৃষ্টান্তে তাকিয়েছিল আর এমন ভাব করেছিল যেন তাকে দেখে নি। তার নিজের কাছেই নিজেকে নোংরা মনে হয়েছিল। শাড়ির আঁচল দিয়ে সে তার লাল-হয়ে-যাওয়া মুখ মুছেছিল। দরবারী নেশায় ডুবে-যাওয়া দৃষ্টিতে সীতাকে

দেখে বলেছিল— 'সীতা, তুমি ঠিক সেদিনের মতো ব্যবহার করছ।'

সীতা ভয় পেয়েছিল— 'না তো।'

ট্যাক্সি হাজীঅলীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। আজ সমুদ্রের সেই রঙ ছিল যা 'মনসুনে'র গোড়ায় হয়ে থাকে। ময়লা-ময়লা, নোংরা আর ভিজে··· বোধ হয় দূরে কোথাও বৃষ্টি শুরু হয়েছিল আর অগণিত নোংরা নালা আর নদীর জল সমুদ্রে পড়েছিল।

আবার সেই পথে যাত্রা— তাড়দেও, অপেরা হাউস, মহাত্মাগান্ধী রোড, ফ্লোরা ফাউণ্টেন— আর এক হোটেল। আজ সেই হোটেল নয় যেখানে তারা সেদিন গিয়েছিল।

সামনে দাঁড়িয়েছিল এক বেয়ারা। দরবারী, সীতা আর ববলকে দেখে দৌড়ে এসেছিল। খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে সে ট্যাক্সির দরজা খুলেছিল। দরবারী নেমেছিল, ট্যাক্সিঅলাকে ভাড়া দিয়েছিল আর বেয়ারাকে সুটকেস নামাতে ইশারা করেছিল··· সীতা নেমে-ছিল। তার চোখদুটি ছিল ভরা-ভরা। ববলকে দু হাতে কোলে নিতে তার যেন কিছুটা সংকোচ হচ্ছিল।

'কোলে নাও না'— দরবারী ববলের দিকে ইশারা করে বলেছিল —'বাচ্চাদের হামেশা মেয়েছেলেরাই কোলে নেয়।'

সীতা কিছুটা অসহায়ভাবে ববলের দিকে দেখেছিল। তাকে সে এখন কোলে নিতে চাইছিল না কিন্তু দরবারী আর তার ক্রোধকে সে ভয় পাচ্ছিল। পুরুষমানুষ আর তার পাগলামোকে সে খুব ভয় পেত। সে ববলকে তো কোলে তুলে নিল কিন্তু তাকে আদর করতে পারছিল না··· তার কাঁচা-কাঁচা টক-টক, দুর্গন্ধ-ভরা ঢেঁকুর উঠে আসছিল।

হোটেল ছিল উপরতলায়। দরবারী এই কথাও জিজ্ঞাসা করে নি— কামরা আছে?··· এখন সে প্রশ্নের কোনো প্রয়োজন নেই। সে তার দৃষ্টিতে পেশাদারী লোকের মতো নির্ভয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে-ছিল। এখন তার প্রয়োজনও ছিল না।

সীতা দেখেছিল— সিঁড়ির উপর কেমন করে কোনো লোক তেল

আর ঘিয়ের ড্রামের উপর ড্রাম রেখেছিল। যে দড়িটা ধরে কে জানে কত লোক উপরে গিয়েছিল, তাদের হাতে লেগে তা কত ময়লা আর দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত পরিবেশ থেকে একটা বাসি দইয়ের পচা গন্ধ আসছিল।

দড়িতে হাত না দিয়েই সীতা দরবারীর পিছন-পিছন উপরে চলে গিয়েছিল।

তিনজনকে আসতে দেখেই ম্যানেজার সাহেবের মুখের উপর এক অদ্ভুত পবিত্র আভা দেখা গেল। সে তাড়াতাড়ি কাউন্টারের পিছন থেকে বেরিয়ে এলেন। দুই হাত কোমরের দিকে ঝুঁকিয়ে বলল—'ওয়েলকম স্যর...' আজ সব কামরার দরজা সীতা আর দরবারীর সামনে খুলে গিয়েছিল।

দরবারী ম্যানেজারকে বলল—

'আমরা বিল্লীমোরা থেকে এসেছি, আর এখন ট্রান্‌জিটে আছি। রাত এগারোটায় পাঞ্জাব মেলে আগ্রা যাব— ওখানে শাহজাহান আপন প্রিয়া মুমতাজের জন্যে যে তাজমহল বানিয়েছিলেন তা দেখব। আসলে মুমতাজের প্রতি তাঁর এত প্রেম ছিল না যতটা অপরাধবোধ ছিল, কারণ তিনি মুমতাজের গর্ভে ষোলো-আঠারোটা সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন আর আপন অন্যায়ের প্রতিদান দিতে চেয়েছিলেন...' কিন্তু এ-সব কথার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ম্যানেজার 'স্যার' 'স্যার' করছিল। দরকার হলে হাসছিলও। প্রয়োজনের অতিরিক্ত হাসি হাসছিল— মাথাও নাড়ছিল— ঝুঁকে-ঝুঁকে আদাবও দিচ্ছিল।

রেজিস্টারে দস্তখত করার পর দরবারী যখন কামরায় পৌঁছল তখন বব্বলের হাতে বিস্কুট ছিল।

'এ কে দিয়েছে?'

'বেয়ারা,' সীতা বলল।

'আর এই— আইসক্রীমের 'কোন'?'

'পাশের ঘরের এক অতিথি দিয়েছে।'

বেয়ারা বাচ্চার জন্যে বাটি করে দুধ এনেছিল... যেন শতাব্দীর

পর শতাব্দী সে বেকার ছিল, আজ হঠাৎ কোনো কাজ— এমনি রোজগার সে পেয়েছে যা কোনোদিন শেষ হবার নয়, যাতে কোনো ছুটি নেই— যার সামনে টিপসের আমদানি আর অন্যের ডাকের কোনো অর্থ ছিল না। সে খুব খুশি হয়ে দুধের বাটি হাতে ধরে সেখানেই দাঁড়িয়েছিল। যেন সে কারুর নয়, কেউ যেন তার উপর অধিকার বিস্তার করে রেখেছে। সে ওখান থেকে চলে যেতে চাইছিল না।

'আচ্ছা বেয়ারা', দরবারী নিষ্ঠুরভাবে বেয়ারাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বলল— 'আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি। দেখো না কখন থেকে চলছি। এখন একটু বিশ্রাম করব।'

'জী,' বেয়ারা বলল— 'আমার প্রয়োজন পড়ে তো সাহেব···'

দরবারী তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভিতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়েছিল। সে সত্যি সত্যি পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। সীতা বব্বলকে দুধ খাওয়াচ্ছিল—এটা তার ভালো লাগছিল না, কিন্তু সে কিছু বলতে পারে নি। বললে খারাপ দেখাত। খুবই খারাপ—

তখন দস্যিপনা করে বব্বল হাত দিয়ে বাটিটাকে ধাক্কা দিয়েছিল আর দুধ মেজেতে পড়ে গিয়েছিল—

'এই নোংরা ছেলেটা!' সীতা বলেছিল, রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিয়েছিল আর ঝাড়ন দিয়ে মেজে সাফ করেছিল। বব্বলের হাত দেওয়ায় দেরী ছিল কিন্তু সে এখন সীতার হাত ধরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

সীতা ভিতরে ভিতরে কাঁপছিল। দরবারীর কিছুটা লজ্জা লজ্জা করেছিল।

'এই হোটেলটা এমনকিছু ভালো নয়',— এমনি কোনো কিছু বলতে হবে বলেই এ কথা সে বলেছিল।

'ঠিক আছে।' সীতা বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলেছিল।

দরবারী ফের নাক সিঁটকে এদিক ওদিক শুঁকে বলেছিল—

'কোথা থেকে দুর্গন্ধ আসছে···' তারপর নিজের কপাল থেকে ঘাম মুছে নিয়ে বলেছিল— 'তুমি এখন ওকে ছাড়ো তো···'

সীতা বব্বলকে বসাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু সে ধড়াস করে শুয়ে পড়েছিল।

দরবারী বব্বলের কাছে একটা অ্যাশ-ট্রে রেখেছিল। সেটাকে খেলনা মনে করে বব্বল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সে বসে ছিল আর খেলছিল··· সে কী করছে ?

তারপর দরবারী এগিয়ে গিয়ে আনাড়ি বিচ্ছিরি ঢঙে গোঁয়ারের মতো সীতার হাত ধরেছিল।

'ভগবানের দোহাই' সীতা বলেছিল আর বব্বলের দিকে ইশারা করেছিল।

কিন্তু দরবারীর চোখের উপর চর্বির পর্দা পড়ে গিয়েছিল। সে কিছুই দেখছিল না। কেবল একই অনুভূতি ছিল— তা হল এক তাজা মচ্‌মচে যুবতী। সে জোরের সঙ্গে শ্বাস নিয়েছিল। সে যখন সীতার শরীরের চারদিক দু হাত দিয়ে ঘিরে ধরেছিল তখন তা রক্তমাংসের নয়, কাঠের তৈরি বলে মনে হয়েছিল। সীতার নরম মাংসল শরীরে তা বসে যাচ্ছিল। সীতা কোনোরকম বাধা দেয় নি। দরবারীর দু হাতের মধ্যে সে কাঁপছিল আর তার দম ফুরিয়ে যাচ্ছিল —আজ সে নিজেই অসহায় হয়ে যেতে চাইছিল।

বব্বল সভয়ে দুজনের দিকে তাকিয়েছিল।

সীতাকে এখন পর্যন্ত কাঁদতে দেখে দরবারী বলেছিল— 'ঐ মতলব করেছ না— ···তুমি আমাকে ভালোবাস না ?'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি না ?— আমি তোমারি।'

বব্বল অ্যাশ-ট্রের ছাই মুখে মেখে নিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল।

'আরে চুপ', দরবারী ঘৃণা আর ক্রোধের সঙ্গে বলল।

সীতা চমকে উঠেছিল। সে বাইরে পালিয়ে যেতে চাইছিল কিন্তু —তার হাত জবাব দিয়ে দিয়েছিল···

দরবারীর ধমক খেয়ে বব্বল ভয় পেয়ে চেঁচানো শুরু করে

দিয়েছিল। দরবারী খুব রেগে গিয়ে ছুটে গিয়েছিল যেন তাকে গলা টিপে মারবে। মর্দ আর মেয়েমানুষের মাঝেখানে এই বাজে আওয়াজ চিরতরে শেষ করে দেবে। বব্বলের কাছে পৌঁছেই সে বব্বলকে জোরে এক থাপ্পড় মেরেছিল। বব্বল গড়িয়ে দূরে গিয়ে পড়েছিল।

'তোমার লজ্জা করে না?' কোথা থেকে যেন মিস্ত্রীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

দরবারী পিছনদিকে তাকিয়ে দেখেছিল— মিস্ত্রী নয়, সীতা। এক অজানা শক্তি এসে যাওয়ায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় সে দৌড়ে বব্বলের কাছে চলে গিয়ে তাকে তুলে আপন বুকে চেপে ধরেছিল। বব্বল সীতার বুকে মাথা রেখে শুয়েছিল আর ফুঁপিয়ে উঠছিল। ফের সে মুখ তুলেছিল। রুদ্ধকণ্ঠ সত্ত্বেও দরবারীর দিকে ইশারা করেছিল— যেন সে বলেছিল— 'এ আমাকে মেরেছে।'

দরবারীর এই অনুভূতি হয়েছিল যেন এই-সব সাফ-সুতরো কাপড়ের মধ্যে সে এক দুর্গন্ধ। সীতার কাছে তার ততটা লজ্জা ছিল না যতটা বব্বলের কাছে···কিন্তু নিজেকে বুঝাবার মতো অনেক যুক্তি তার নিজের কাছে ছিল।

দরবারী যেন কাদার মধ্যে থেকে তার মাথা তুলে বব্বলের দিকে তাকিয়েছিল। সে সীতার দিকে তাকাতে পারছিল না, কারণ সীতা প্রায় নগ্ন অবস্থায় ছিল আর বব্বলকে দিয়েই আপন নগ্নতা ঢেকে রেখে দরবারীকে দেখছিল— যেন সে দুনিয়ার সবচেয়ে অধম মানুষ, যে নীচতার শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছে···আর তার দৃষ্টি ছিল শূন্য। সে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

লজ্জা, আত্মগ্লানি আর ক্ষোভে দরবারী বব্বলের দিকে দু হাত বাড়িয়েছিল। সীতার হুঁশ থাকত তো সে কখনো বব্বলকে নোংরা অশুচি হাতে তুলে দিত না। কিন্তু সে কী করত! বব্বল নিজেই অস্থির হয়ে দরবারীর দু হাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আর কাঁদতে কাঁদতে উল্টে সীতার দিকে ইশারা করেছিল। যেন সে বলছে— এ আমাকে মেরেছে···এখন দরবারীর কাছে কোনো যুক্তি ছিল না—

আর সীতার কাছেও ছিল না—

'সীতা !' দরবারী ডেকেছিল।

সীতা কোনো কথা বলে নি। সে কাঁদতেও পারছিল না। তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচল টেনে নিজের শরীর ঢেকেছিল।

'সীতা', দরবারী বলেছিল।— 'তুমি কখনো···কখনো তুমি আমাকে মাফ করতে পারবে ?' ফের সংশয়ের ভাবে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল— 'আমরা এবার শীঘ্রই বিয়ে করে ফেলব।'

তারপর সাহস করে সে তার অন্য হাত দিয়ে সীতাকে জড়িয়ে ঘিরে নিয়েছিল। সীতা দরবারীর চোখের দিকে তাকিয়েছিল, তারপর এক অধীরতার সঙ্গে দরবারীর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল আর তার কাঁধের উপর মাথা রেখে বাচ্চাদের মতোই কাঁদতে শুরু করেছিল। তার চোখে জল দেখে দরবারীর চোখে জল এসেছিল। দুজনের দুঃখ এক হয়ে গিয়েছিল সেইসঙ্গে সুখও···

তাদের দুজনকে কাঁদতে দেখে বব্বল কান্না বন্ধ করে অবাক হয়ে কখনো সীতার দিকে আবার কখনো দরবারীর দিকে তাকিয়ে দেখছিল···তারপর হঠাৎ হেসে ফেলেছিল যেন কোনো কিছুই ঘটে নি, আর নিজের কুড়মুড়-ভাজার জন্যে দরবারীর মুঠো খুলতে শুরু করে দিয়েছিল··· ।

টার্মিনাস থেকে দূরে

খুব ধীর গতিতে পাঞ্জাব মেল প্লাটফর্মের হাতা থেকে বেরিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত মোহন জামের শীর্ণদেহী বধূ সুমিত্রার শাদা হ্যাণ্ডলুম শাড়িতে ঘেরা মুখটি দেখা গেল। সুমিত্রা কম্পার্টমেণ্টের দরজায় দাঁড়িয়েছিল আর এক স্টলের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে দম না ফুরোনো পর্যন্ত মোহন তার রুমাল নেড়েছিল।

গাড়ি চলতে শুরু করার আগেই সুমিত্রার দু চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। হামেশাই কথা বেকার হয়ে যাচ্ছিল— 'ঘরের সব-কিছু খেয়াল রাখবে'— 'হোটেলের রুটি খেয়ো না'— 'সপ্তাহে একটি নয় দুটি চিঠি অবিশ্যি লিখবে'— এই-সব কথা আঁখির ভাষার সামনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আর তা মোহন জামের মতো পুরুষের দিল্‌কেও নরম করে দিয়েছিল··· প্রত্যেক বউই বিচ্ছিন্ন হবার আগে দৃষ্টির ভিতরে দৃষ্টিতে কোনো স্বীকৃতি চায়। ঐ সময় কোনো কোনো লোক কিছু মিথ্যা কথা বলে ফেলে···মোহন কিছুই বলে নি। সে গোড়ায় খুব জোরে-জোরে আর শেষে ধীরে ধীরে রুমাল নেড়েছিল। এই রুমাল-নাড়া এক ফর্মালিটি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তা ভালোই মনে হয়। হৃদয় কোথায়, কেন আর কার জন্যে ধক্ ধক্ করে ওঠে তা তো দেখা যায় না, অবশ্য আবছা-হয়ে-আসা দৃষ্টিতে রুমাল দেখা যাওয়া পর্যন্ত ঐ মানুষটিকে দেখতে পাওয়া যায়— সে চলে যাচ্ছে।

এই সফর ব্যাপারটাই অর্থহীন। আমার তো কোথাও যেতে হলে শরীর খারাপ হয়ে যায়। স্টেশনে ভীড়, কেবল ভীড়ের কারণেই মানুষ একলা হয়ে যায়। আবার, আগে যাবার জন্য গাড়ি কিছুটা পিছু হটে যায়। তারপর সিটি বাজে, আরো-সব আওয়াজ— 'আরে-আরে গাড়ি ছেড়ে গিয়েছে, আমার মালপত্র রয়ে গেছে'— শেষপর্যন্ত কেউ কারুর নয়···এই দুনিয়া···এক-একবার তো প্রাণ চায়, লোকে টিকিট-ফিকিট ফেরত দিয়ে দেয় আর ঘরে ফিরে মজা করে বসে পড়ে— ইচ্ছা করে তো বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে।

জীবনের জয় এখানেই যে বিষাদের ছায়াতেও কখনো খুশির ভাবনা গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসে আর গাড়ি ছেড়ে দিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনে এসে যায় আর তার আলোয় বিষাদ লুপ্ত হয়ে যায়— আগে যার সঙ্গে প্রোগ্রাম বানানো হত এখন তাকে ছাড়াই তা করা হয়ে থাকে···মোহন এক গভীর শ্বাস নিল— যাক, দু মাসের জন্য ছুটি! কোনো কিছু না হওয়াই এক রকমের হওয়া। সুমিত্রা ফিরে এলে একবার সেও বুঝতে পারবে যে আমাকে ছাড়া জীবনের কী মানে হয়?··· ফের নষ্ট করবার জন্য তার স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাবে। সে কীভাবে আলিঙ্গন করবে···উল্টে আমাকেই বলবে— 'মোহনী তুমি চলে গিয়েছিলে?'

মোহন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস প্লাটফর্মের বাইরে যাবার জন্যে যেই ঘুরেছিল সেদিক থেকে অন্য কোনো গাড়ি প্লাটফর্মে আসছিল। মোহন চমকে গেল। তার মনে হল যেন সুমিত্রা ঐ গাড়িতে গিয়েছিল আর এই গাড়িতে ফিরে আসছে। কম্পার্টমেণ্টের দরজায় একটি মোটা মেয়েছেলেকে আটকে যেতে দেখে সে মুচকি হেসে রওনা দিয়েছিল। তার রেডিও ক্লাব যাওয়ার ছিল। কয়েকজন তাসের মাদারীর সঙ্গে ফ্লাশ খেলার জন্য যেতে চেয়েছিল। সেখানে মাঝে-মাঝে কখনো কখনো তাসের বিবি বেঁচে উঠত আর সমুদ্র থেকে আগত ঝড়ে তার গোলাপি শাড়ির আঁচল কেউ-না-কেউ নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিত। আঁচল সরিয়ে নেওয়া পর্যন্ত শাড়িতে জড়িয়ে-যাওয়া এক শরীরের বদলে দুই শরীরের অস্তিত্ব অনুভূত হ'ত।

মোহন চলে যাচ্ছিল। ঘর আর মোটর-কারের চাবি তাব বাঁ হাতের আঙুলে তার অজান্তে ঘুরছিল। ডান হাত ছিল পাতলুনের পকেটে— তার মধ্যে সে প্লাটফর্মের টিকিট খুঁজছিল। তখনি তার নজর পড়ল সামনে।

'অচ্চী!' সে থেমে গিয়ে বলল।

মোহন অচলাকে চিনত কিন্তু খুব একটা পরিচয় ছিল না। অচলার স্বামী রাম গদকরীর সঙ্গে তার বোধহয় জীবনে এক-আধবারই দেখা

হয়েছে। কিন্তু অচলার সঙ্গে 'অকসর মিষ্টান্ন'তে দেখাশুনা হত। সেখানে অচলা তার এক দুষ্টু মতন সখীর সঙ্গে ভেজিটেরিয়ান খানা খেতে আসত। নমস্তে-নমস্তে ছাড়া মোহন জাম আর অচলা গদকরীর মধ্যে আট-দশটা কিম্বা হয়তো বারো-পনেরোটা বাক্যবিনিময় হয়ে থাকতে পারে। তা থেকে মাত্র এটুকুই জানা গিয়েছিল যে সে কোলাবায় থাকে। তফাত এই ছিল যে মোহন 'কফ প্যারেড'-এর একটা ভালো ফ্ল্যাটে থাকে আর অচলা 'কারমুয়ে'তে এক পুরানো বিল্ডিঙে থাকে।

বোধ করি মোহন তাকে 'অচ্চী' নামে ডাকত না কিন্তু দেবী মোহনের কাছে ঐ নামেই তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। দেবীকে মোহন ভালোমতন জানত। দেবী এ কথাও বুঝত মিছরির পক্ষে জল কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। তার স্বাধীন জীবন কিছুটা এইরকমের শরবৎ ছিল যা জীবনের গেলাসে রাত-ভর পড়ে থাকত। সকাল পর্যন্ত পড়ে-থাকা জল কোনো আগুনের তাপে বাষ্প হয়ে উড়ে যেত; আবার মিছরির খণ্ড গেলাস বা বয়েমের তলায় পড়ে আছে দেখা যেত। গোড়া থেকেই সে ছিল সাফ-সুতরো, চকমকে, সুতীক্ষ্ণ।

মোহনের ডাকে অচলা ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল আর কেবল এটুকুই বলল— 'মো'— আর কিছুটা পরে বলল...'হন'।

আবার তার নিজের শাড়ির আঁচলে চোখের জল মুছে ফেলল। এখন সে মুচকি হাসি হাসল। মনে হল যেন কেউ তার মাথায় এক সোনালী মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। মোহনের কিছু কাছে এসে বলল— 'আপনি এখানে কী করে?'

'বউকে বিদায় দিতে এসেছিলাম,' মোহন জবাব দিয়েছিল— 'কাশ্মীর যাচ্ছে···বাচ্চাদের ছুটি হয়ে গেছে তো···আপনি?···'

'আমি?' অচলা একদম খিলখিল করে হেসে উঠে তারপরই একদম চুপ হয়ে গেল। কিছুটা লজ্জিত হয়ে বলল— 'আমি ওঁকে বিদায় দিতে এসেছিলাম।'

'ও', মোহনও হেসে ফেলেছিল। অচলার দিকে এক নজর তাকিয়ে

থেকে সে অন্য গাড়ির ইঞ্জিনের দিকে তাকিয়েছিল-- তার থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছিল। ফের অচলার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—

'গদকরী সাহেব কোথায় গেলেন?'

'দিল্লী।'

'কবে আসবেন?'

'এই আট-দশ দিনের মধ্যে।' অচলা বলল-- 'কী একটা কন্‌ফারেন্স হচ্ছে।'

'বোধহয় বেশি দিনও লেগে যেতে পারে?'

'হাঁ। বোধহয়...'

অচলা আপন কেশরাশি ঠিকঠাক করেছিল— তা আগের থেকেই সাজানো ছিল। কেবল একটা পিন আলগা হয়ে উপরে উঠে এসেছিল। অচলা মোমের মতো হাত দিয়ে সেটাকে বসিয়ে দিল। তাতে মনে হচ্ছিল যে তার হাত অনেকক্ষণ ধরে উপরে উঠে আছে। মোহনের দৃষ্টি অচলার সারা শরীরের উপর পড়েছিল। এক পলকের জন্যে সে দৃষ্টি তার শরীরের সেই অংশের উপর থেমেছিল— যে অংশ ছিল শাড়ি আর চোলীর ঠিক মধ্যিখানে। হঠাৎ হাত নামিয়ে সে শাড়ি দিয়ে তার শরীরের উন্মুক্ত অংশটা ঢেকে নিয়েছিল।

মোহন ভেবেছিল শরীরের এই অংশকে ইংরেজীতে বলে 'মিডর্ফ'। স্টেশনের বাইরে চলে যাওয়া পর্যন্ত এই শব্দ তার মাথার মধ্যে মৌমাছির মতো ভন্‌ভন্‌ করছিল... মিডর্ফ... মিডর্ফ... মিডর্ফ... মিডর্ফ...

আর মোহন তার মাথা থেকে ঐ শব্দকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টাও করে নি। সবই ব্যর্থ হয়েছিল। মোহন জানত মৌমাছি কত ঠেঁটা হয়। বারবার উড়ে যায় ফের ওখানেই বসে যেখান থেকে উড়ে গিয়েছিল। রাগ করে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করলে নাক ভেঙে যায়, মৌমাছি পালিয়ে যায়।

বাইরে গরম, ঘাম খুবই জবজবে, পচা-পচা। ব্লাউজ বুকের ছাতিতে আটকে গিয়েছিল আর কান ফুঁড়ে যে সোনার তুল লাগানো

হয়, কানে ঘর্মবিন্দু তার মতোই সুন্দর দেখাচ্ছিল। ঘর্মবিন্দু শাড়ি আর পাতলুনের ভিতর থেকে ভিতরে ঢুকে পায়ের গোছা পর্যন্ত গড়িয়ে গিয়েছিল আর জোঁকের মতো গুঁড়ি গুঁড়ি এগোচ্ছিল··· স্টেশনে চলা-ফেরার তৃষ্ণা দমিত ছিল, সে-কারণেই এখন তৃষ্ণা আরো তীব্র হয়েছিল। বাইরে হলের এক কোণে অল্প একটু জায়গা ছিল যেখানে উপরের ছাতে দুই ব্লেডঅলা পাখা ধীর গতিতে ঘুরছিল। তার নীচে একটা বুড়ো হাঁ করে মেজেতে ঘুমোচ্ছিল; তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো লাশ সনাক্ত হবার অপেক্ষায় মুর্দাখানায় পড়ে আছে—

মোহন আর অচলা দু-চার কথা বলেছিল, তারপর তাদের কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল। দুজনে আপন আপন মনে কোনো বিষয় চিন্তা করছিল। বেশি চিন্তা করার ফলে তা স্পষ্ট চেহারা নিতে পারছিল না। অচলা দু কদম আগে আগে যাচ্ছিল আর পিছনে মোহন। নিজের শরীরের সেই-সব উন্নত অংশের চেতনা তখন অচলার মনে এল— যেগুলিকে মেয়েরা খারাপ বলে ভেবে থাকে আর পুরুষেরা সুন্দর বলে মনে করে আর প্রত্যেক রমণী তা একেবারে বিনামূল্যে দেখাতে চায় না। তারা পয়সা অথবা ভালোবাসা যা-ই চাক, তা প্রায়শই খোলাখুলি নগ্ন রূপের হয়। পোশাক পরিয়ে দিলে তাতে আর ভালোবাসা থাকে না। অচলা আপন শরীরের পিছন অংশ শাড়ি দিয়ে ঢেকে দিল। তার যেন মনে হচ্ছিল দৃষ্টির বর্শা পিছন থেকে তার শরীরের প্রত্যেক অংশে বিঁধে যাচ্ছে।

'আচ্ছা মোহনজী···' সে ঘুরে তাকিয়ে বলল— 'আমি এখন বাড়ি যাব।'

'কী করে যাবেন?' মোহন শুধাল।

'এভাবেই,' অচলা কিছুদূরে হেঁটে গিয়ে দেখাল আর দুজনে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। এই কথাতেই দুজনের মধ্যে আপনভাবের জন্ম হয়ে গেল। শেষে মোহন বলল— 'আমার বলবার উদ্দেশ্য আপনি তো গাড়ি নিয়ে আসেন নি।'

অচ্চী মাথা হেলিয়ে বলল—

'আমি গাড়ি চালাতে জানি না…'

'আমি তো আছি,' মোহন বলল—'আজ কিছু সময়ের জন্য আমাকেই আপনার ড্রাইভার বলে মনে করুন…'

'জী', অচলা বলল— 'না, না, এ কী করে হবে? আমি…আমি বাসে চলে যাব। আপনি কেন কষ্ট করছেন?'

আপনি কেন কষ্ট করছেন— এটা এমনি কথা যাতে কেউ অপর কাউকে কষ্ট দিতে চায় আর তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোলা রাখে। বোধহয় তাকে হাতড়ে দেখে— তুমি আমার সঙ্গে কোন্ সীমা পর্যন্ত যেতে পার? এই বাক্য পুরুষ যখন বলে, তা একটা মামুলি কথা হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু রমণী যখন বলে, তা খাস বাত… এ তো মেয়েদেরই বাক্য, যেমন— 'মিথ্যুক কোথাকার,' 'আমি মরে গেলুম'…ইত্যাদি।

'এতে কষ্টের কী আছে,' মোহন বলল— 'আমি তো বাড়িই যাচ্ছি। পথে আপনাকে নামিয়ে দেব।'

যেন মোহনের মাথার মধ্যে রেডিও ক্লাব আপনিই ব্রডকাস্ট হয়ে গিয়েছিল।

কিছুটা ইতস্ততার পর অচলা গদকরী মোহন জামের গাড়িতে গিয়ে বসল।

গাড়ি ফ্রীয়র রোডের দিকে গেল। ক্রসিঙে পুলিশম্যান উল্টো হাত দেখিয়েছিল, তাই মোহনকে গাড়ি থামাতে হয়েছিল। মোহন পুলিশম্যানের উল্টো হাত দেখলে প্রায় সময়েই চটে উঠত আর মুখে হরদম গালি দিত। কিন্তু আজ ঐ হাত তার কাছে যীশুর হাত বলে মনে হয়েছিল।

'দেবী কেমন আছে?' মোহন কথা বলার একটা বিষয় খুঁজে নিয়েছিল।

অচলা জবাব দিয়েছিল—'এই একরকম।'

'তার মানে?' মোহন চমকে গিয়ে বলেছিল।— 'আমি তো ভেবেছিলাম সে খুব ভালো মেয়ে।'

'আমি কবে বলেছি সে খারাপ মেয়ে?' বলে অচলা হাসতে শুরু করেছিল।

মোহন অচ্চীর ফাঁদে ধরা পড়ে গিয়েছিল আর তা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে এদিক-ওদিক নিজেনিজেই ফড়ফড় করছিল। ঘামের ছোট ছোট ফোঁটা তার কপালে দেখা দিয়েছিল। অচলা তার থেকে দূরে সরে দরজার সঙ্গে লেগে বসেছিল যেন কাপড় ছোঁয়া গেলে কোনো সম্পর্ক ঘটে যাবে। নিজের লজ্জা এড়াবার জন্যে মোহন বলল— 'আপনি আমার থেকে এতদূরে বসে আছেন কেন?'

'এমনিই,' অচলা বলেছিল আর কুণ্ঠিতভাবে এক ইঞ্চি মোহনের দিকে সরে এসেছিল ..

...'আমি ভেবেছিলাম আপনার গীয়ার বদলানোয় কষ্ট না হয়...'

'আবার ঐ কথা...কষ্ট!'

তখন পুলিশম্যান সোজা হাত দেখিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মোহনের মোটরকার যেমন তেমনি দাঁড়িয়েছিল। পুলিশম্যানের সিটি আর পিছনের কারগুলির হর্ন একসঙ্গে শোনা যাচ্ছিল। মোহন তাড়াতাড়ি গাড়ির গীয়ার দিয়েছিল আর ঘাবড়ে গিয়ে ক্লাচ থেকে তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়েছিল। গাড়ি এক ঝটকায় এগিয়ে গিয়েছিল। বন্ধ হতে হতে বেঁচে গিয়েছিল। পুলিশম্যান থেকে কিছুটা এগিয়ে যাবার পর অচলা বলল— 'আপনি কি এভাবেই গাড়ি চালান?'

'না', মোহন বলল— 'আমি তো এত যত্নের সঙ্গে চালাই যে বুঝতেই পারা যায় না... কিন্তু আজ...'

'আজ কী হল?'

'আপনি আছেন... আর কী হবে?'

মোহন আর অচলা দুজনে টাউন হলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। কেন কে জানে মোহনের মন চাইছিল আজ কোনো অ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে যায়। একটা বাস খুব দ্রুত চলে গেল। নিজের মনের মধ্যেকার ঐ আজব ইচ্ছাকে মোহনের দমিয়ে দিতে হ'ল। সামনে টাউন হলের দিকে এগিয়ে-যাওয়া সোপানশ্রেণী পেরিয়ে হলের দিকে

তাকিয়ে মোহন বলল—

'কী সুন্দর ?'

'খুব সুন্দর।'

এলফিনস্টোন সার্কেলের দিক থেকে যৌবন-বিকশিত এক অতীব সুন্দরী মেয়ে এক যুবকের হাত ধরে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের দফতরের দিকে যাচ্ছিল। বোধহয় তাদের বিয়ে হবার কথা; এই কারণে তাদের মুখের ভিতর থেকে আনন্দ ফুটে বেরুচ্ছিল।

অচলা মোহনকে শুধিয়েছিল—

'আপনার কেমন লাগছে ?'

'অচ্ছী।'

মোহন 'অচ্ছী' শব্দটা এমনভাবে বলেছিল যেন 'অচ্ছী' আর 'অচ্চী' এ-দুয়ের মধ্যে কোনো তফাত নেই। অচ্চী খুশি হয়ে গিয়েছিল। কে কী করতে পারে ?··· সে খুশি হয়ে গিয়েছিল তা দেখাবার জন্য বলেছিল— 'আমি কোথায় এত সুন্দর ?'

মোহন এক নজর অচলার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যে তাতেই সবকথা বলে দিয়েছিল যে-কথা সে মুখে বলতে পারে নি।

কামা হল, লেবাইন গেট পেরিয়ে গেল। এখন মোহনের গাড়ি রিগ্যাল সিনেমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। গাড়ি 'কজওয়ে'-র উপর 'সত্য সদন'এর সামনে গিয়ে থামল— এখানেই অচ্চী বাস করে।

অচ্চী চট্ করে এদিক-ওদিক দেখে নিয়েছিল। সামনে এক টেলর মাস্টার— যে অচ্চীর জামার মাপ জানত— সে ছাড়া আর কেউ অচলাকে অন্য কোনো লোকের গাড়ি থেকে নামতে দেখে নি। আর যদিই দেখত তাতে তার কী পরোয়া ছিল ? মোহনের কোনো লজ্জা ছিল কী ? তা সত্ত্বেও একদমে দরজা খুলে অচলা গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিল। একটু থেমে, 'আচ্ছা মোহনজী, অনেক ধন্যবাদ' বলে চলে গিয়েছিল।

মোহন যেমন-তেমনি ড্রাইভারের সিটে বসেছিল। এক ঠ্যাং ভিতরে, অপর ঠ্যাং খোলা দরজার বাইরে। সে নেমে গিয়ে অচলার

জন্যে দরজা খুলে দিতে চেয়েছিল কিন্তু সে সুযোগ অচলা তাকে দেয় নি, কিছুটা গিয়ে অচলার এ কথা মনে হয়েছিল··· সে কিছুটা থেমেছিল— তার পর যা বলেছিল তা কেবল এইজন্যে যে তা সে বলতে চায় নি, আর আপন মনের মধ্যে কোনো বাক্য থামিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কখনো কখনো শরীর আত্মার চেয়েও আগে চলে যেতে চায়···

'কোনো একদিন আসবেন মোহনজী···'

মোহনের জবাবের অপেক্ষা না করে অচলা তার ঘরের দিকে দ্রুত চলে গিয়েছিল। পিছনে মোহন যেন হাওয়ার সঙ্গে কথা বলছিল— 'আসব··· কেন আসব না?'

অচলার খেয়াল ছিল— মোহন তো সমঝদার লোক— সে বুঝে নেবে। ইনি ঘরে না থাকলে··· কত খারাপ দেখায়··· ঐ আমন্ত্রণ কেবল ফর্মালিটির কথা।

মোহন ছিল যথার্থই সমঝদার। অন্যথায় সে পরদিনই অচলার ওখানে পোঁছে যায়? তখন অচলার মনের মধ্যে তার পতি রাম গদকরীর চিন্তাও ছিল না।

মোহন জাম দরজার ঘন্টা এমনই জোরেই বাজিয়েছিল যে অচলা ঘাবড়ে গিয়ে দৌড়ে এসেছিল— যেন পরদিনই রাম পুষ্পক বিমানে চড়ে চলে এসেছে। দরজা খুলে সে একটু মুখ বার করে হঠাৎ পিছু হটে গিয়েছিল, নিজের মধ্যে সংকুচিত হয়ে পড়ে বলেছিল— 'একটু-খানি দাঁড়ান।'

সে দৌড়ে অন্দরে চলে গিয়েছিল।

মোহনের মধ্যে এতটা সাহস ছিল কোথায়? সে তো নীচের থেকেই এমনভাবে এসেছিল যেন ফার্স্ট গীয়র দিয়ে এসেছে। সে দরজায় মৃদু ধাক্কা দিতে তা খুলে গিয়েছিল। পর মুহূর্তেই সে ড্রইং-রুমে এসে গিয়েছিল আর মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের সব জিনিসপত্র যাচাই করছিল। ওর তো কপালের উপরেও কয়েকটা চোখ ছিল।

সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে অচলার শোবার ঘর সোজাসুজি দেখা যাচ্ছিল।

রমণী আর ঘরের মধ্যে তফাত কী? কম-সে-কম জিজ্ঞাসা তো করা চাই। আর শেষে এই-বা কী? কিন্তু মোহন মাথা থেকে পা পর্যন্ত উছলে পড়ছিল যেন বড়ো শোবার-ঘরের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল অচলা সংকুচিত হয়ে আছে। দুজনে এরকমই ছিল যেমন ভাবনা, কল্পনা-চোখ আর শরীরের দৃষ্টি দিয়ে ভগবান তাদের বানিয়েছিলেন। অচলা পালঙ্কের প্রান্ত-ধার থেকে শাড়ি তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি নিচের কাপড় উপরে জড়িয়ে নিয়েছিল।

'মাফ করবেন', মোহন জাম ওখান থেকেই বলেছিল, আর ওধার থেকেই অচলা তেমন ভাবেই জবাব দিয়েছিল— 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

ড্রইং-রুম আর বেড রুমের মাঝখানে একটা ছোট্ট জায়গা ছিল যেখানে কাঁচের ক্যাবিনেটের ভিতরে শিব ভোলানাথের ছবি টাঙানো ছিল আর তার উপর এক শুকনো মালা ঝুলানো ছিল। কেবল তাই নয়। ঐসঙ্গে কুমারী মেরীর ছিল, আর গুরু নানকেরও ছিল··· আর তার সঙ্গে ঝুলছিল ক্যালেন্ডার— যার মধ্যে নগ্না লীডা দাঁড়িয়েছিল আর একটি রাজহংস পা গুটিয়ে বসে ঠোঁট তুলে তার কেশগুচ্ছ টানবার চেষ্টা করছিল।

ঐ এক মুহূর্তের মধ্যে মোহন জাম সারা দুনিয়ার রমণীদের দেখে নিয়েছিল। সুমিত্রাকে দেখেছিল, দেবীকে দেখেছিল, জাজা গাবরকে দেখেছিল, আরো অনেককে দেখেছিল। রাধাকে দেখেছিল— সে ছিল মোহনের সহোদর বোন। পারেলে আপন পতি উইভিং মাস্টারের সঙ্গে থাকত।

মোহন হামেশা রমণীদের মায়ের রূপে দেখত। বাইরে থেকে আর অন্দর থেকে তাকে আরো বেশি কিছু বলে মনে হত। ভালো আর মন্দ, পাপ আর পুণ্য কখনো সুন্দর চেহারায় কখনো অসুন্দর চেহারায় আপসে মিলেমিশে যেত। আবার যে রমণী পোশাকের মধ্যে ভরা-

ভর্তি হয়ে দেখা দিত সে আসলে ছিল দুর্বল, আর যাকে দেখে দুর্বল মনে হত সে ছিল ভরাভর্তি···তাকেই তো বলে মায়া অথবা লীলা··· তেমনি যাকে বেশ স্বাস্থ্যবতী রমণী বলে দেখায় তারই তলপেটে বেদনা হতে থাকে, তাতে ভয় পাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। আর হাড়ের খাঁচার থেকে মুক্তি পাওয়ায় ততটা লাভ হয় না যতটা হয় কোনো মজুরের বিশ সের কাঠ কাটায়।

মায়া— যার বিষয়ে ভাবা যায় সে বশে আছে, তবু সেই কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়, আর যার বিষয়ে এই হাত আসে না সেই ঘাড়ধাক্কা দেবে— মায়া আর কী হতে পারে?···বোধহয় আর-এক মায়া হতে পারে যা পেয়ে যাবার পর আয়ত্তে আনা যায় না। এই দুনিয়া থেকে চলে যাবার সময় এ কথাই মনে হয় মানুষ নিজে কাউকে পায় নি···নিজেকেই সবাই পেয়েছে।

শাড়ি আর ব্লাউজ ঠিকঠাক করে অচ্চী ড্রইং-রুমে চলে এল। তাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল। তা কি এইজন্যে যে সে ছিল পরস্ত্রী?···না, না, সে যদি নিজের স্ত্রী হত তা হলেও সুন্দর বলেই মনে হত। তার মধ্যে এমন কোনো কিছু ছিল যা অন্য কোনো রমণীর মধ্যে ছিল না, কিন্তু···এমন কথা তো আবার প্রতি জন সম্পর্কেই বলা যেতে পারে, কিন্তু তার ভ্রূ-লতার উপর ছেলেবেলার কোনো আঘাতের কারণে একটা অগভীর দাগ ছিল। তার চুলকে ইচ্ছামত দুভাগে ভাগ করে দিয়েছিল। আর ছিল ঐ দাগ যাতে চুমু খেয়ে নিতে প্রাণ চায়।

মোহনের কাছে আসতে আসতে অচ্চী ফের হাত উপরে তুলে সামনের দিকের কিছু চুল উপরে তুলে দিয়েছিল। চুলের এক টায়রা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সোনা আর হীরার মুকুট তার সমকক্ষ হতে পারে না। সে তার আপন শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজেই নিজেকে হাওয়া করতে করতে এসেছিল—

'উফ্, আজ কী গরম?'

তারপর ডান দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়ালে পাখার সুইচ টিপে দিয়েছিল। তখন মোহন বলেছিল—

'আমিও ভাবছিলুম…'

'আপনি কী ভাবছিলেন…?' অচলা এক প্রতীক্ষার দৃষ্টিতে মোহনের দিকে তাকিয়েছিল।

'এ কথাই' মোহন বলেছিল— 'উফ্, আজ কত গরম…' আর যখন পাখার হাওয়ার প্রথম ঝোঁকটা এল তখন মোহন আর অচলা নিশ্চিন্ত হয়ে শ্বাস নিয়ে সামনা-সামনি সোফায় বসেছিল। কতই না জুলুম! তারা একে অপরের পাশেও বসতে পারে না। সব-কিছুই কত অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল। আর এ ঠিকও ছিল। যদি ত্বনিয়া-ভর পুরুষ আর নারী প্রাকৃতিক জীবন যাপন করতে শুরু করে তা হলে কী হয়? কিন্তু পুরুষ আর নারী ত্বজনেই অপূর্ণ। তাদের পূর্ণতা— ? শরীরে গুলি মারো, আত্মাকে পাবার জন্যেও কি আলাস্কা ঘুরে আসতে হবে?

এইরকম আদব-কায়দায় লোকে একে-অপরের থেকে অনেক মাইল দূরে চলে যায়। ফের আজব ধরনের টানা-হেঁচড়া শুরু হয়, চেনা-শুনা নেই আর আসার সঙ্গে সঙ্গেই হাত ধরে ফেলে, আর এও — আগে কেন বলো নি? কী বুঝছ? প্রেমের খেলায় তো প্রথম দৃষ্টি, প্রথম বাক্য, আর প্রথম এগোনোর ভঙ্গি শেষ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে।…

একদিন দেবী এক চিত্রকরের বিষয়ে কিছু বলছিলেন; তার সঙ্গে উনি প্রেম করেছিলেন আর এখনো করছেন— 'আমি তো আমার সব কিছু তাকেই দিয়ে দিতে চাই কিন্তু দৌড়তে গিয়ে সে কেমন বিশ্রী ঢঙে আমার হাত ধরেছিল আর আমার ছোটবড় সব গোপন কথা জানবার চেষ্টা করেছিল…এসব ঠিকমতো নয়। আমি ঐরকম বিশ্রী ঢঙে তাকে থামিয়ে দিয়েছিলাম। এখন আমি তার পিছনে দৌড়চ্ছি আর সে কেবলই জিদ করছে। চলে যাবার সময় কী সে ব্যাপার ছিল যাতে …শুনেছি অগরীপাড়েতে কোনো বেশ্যার কাছে সে যায়…'

অচলার কোনো সন্তান ছিল না। পাঁচ-ছ বছর বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও তার ভালোবাসা এমনি দমিত হয়ে গিয়েছিল। তার পনেরো-ষোলো বছর

বয়সের এক চাকরানী ছিল। তার নাম সহসা। সে অচ্চীর ইশারায় চা তৈরি করে নিয়ে এসেছিল, আর একটা প্লেটে খাটাই (একরকমের বিস্কুট) নিয়ে এসেছিল। অচলা তা ঘরেই তৈরি করেছিল— তাতে পেস্তা বেশি করে ছড়িয়ে দিয়েছিল। চাকরানী মোহনকে 'কোনো-দিন-তো-দেখি-নি' আন্দাজে দেখেছিল, তারপর কাজ করার জন্য রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল।

'মেয়েটা ভালো মনে হচ্ছে,' মোহন মুখে খাটাই পুরে বলেছিল।

'হ্যাঁ,' অচলা অন্দরের দিকে একটু তাকিয়েছিল— 'কিন্তু ঘরে যুবতী মেয়ে রাখা ঠিক নয়।'

'কেন, রাখা ঠিক নয় কেন?'

'কী বলব?' অচলা হেসে ফেলেছিল— 'রোজ কোনো-না-কোনো বেপরোয়া প্রেমিক দরজায় হাজির হয়ে যায়।'

আর দুজনে মিলে হেসেছিল। মোহন কথা শুরু করেছিল— 'আমিও তো হাজির হয়েছি।'

অচ্চীর মুখে লাল আভা দেখা দিয়েছিল। যেন সে তাকে দেখে নি এমনভাবে পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে বলেছিল—

'আপনার কথা আলাদা', আর হঠাৎ কথা এগিয়ে নিয়ে বলেছিল— 'এবার রাম ফিরে এলে আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব, বড় মজার লোক…'

মোহন খোঁচা দিয়ে বলেছিল— 'এ কথার মতলব হল তার আগে যেন না আসি?'

'না, না,' অচলা বিব্রত হয়ে বলল— 'আপনার যখন ইচ্ছা হবে আসবেন…এ তো আপনার নিজের বাড়ি।'

ফের অচলা ভেবেছিল সে কী কথা বলে ফেলেছে। মেয়েমানুষ হওয়াই এক দুঃখ। কেন সব সময় তাকে ভয় পেতে হয়। কেন বলতে হয় একরকম, আর অভিপ্রায় থাকে অন্যরকম।

অচলা রাম গদকরীর কথা শুরু করে দিয়েছিল যেন তার চেয়ে ভালো পুরুষমানুষ আর কেউ এই দুনিয়ায় নেই। এক রাম অযোধ্যায়

জন্ম নিয়েছিলেন। এখন বিংশ শতাব্দে জন্ম নিয়েছেন আর-এক রাম আর তিনি কোশাবায় বাস করেন।

মোহন জামের কাছে সুমিত্রার কথা বলা ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না। দুজনের মধ্যে দূরত্ব আরো বেড়ে গিয়েছিল আর বরাবর বেড়ে যাচ্ছিল। তাদের চেনা-জানা ছাড়া তারা একে অপরের থেকে দূরে চলে গিয়ে কাছে চলে আসার চেষ্টা করছিল। মোহন বলেছিল সুমিত্রা খুব মহীয়সী রমণী কিন্তু তার স্বাস্থ্য খারাপ হবার ফলে সারা জীবনের উপর এক দুঃখের ছাপ পড়ে গেছে···

এ সময়ে চাকরানী হাত পুঁছতে পুঁছতে এসে হাজির।

'বাঈ, আমি চলে যাব?'

'না, না', অচলা মোহনের দিকে তাকিয়ে বলেছিল— 'যাও কাপড়গুলি ধুয়ে ফেল। দেখছ না স্নানঘরে কাপড়ের স্তূপ হয়ে গেছে? যাও, যাও।'

আর চাকরানী অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। এ ছাড়া উপায়ই বা কী ছিল?

মোহন এভাবেই সুমিত্রার কথা বলছিল— 'দশ বছর ধরে এই রমণী তোমাকে সঙ্গ দিয়েছে। তাকে তুমি এখন ছেড়ে দাও কেবল এই কারণে যে সে অসুস্থ— সে আপনার যৌবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি তোমারি সেবায় উৎসর্গ করে দিয়েছে আর যার স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার জন্য তুমি দায়ী···আমি তো ভাবতেও পারছি না···'

মোহনের দু চোখে জল ভরে এল।

অচলার কে জানে কী হয়েছে। তার ভিতরের অনেক বছর ধরে দমিত কোনো ভাবনা বাইরে এসে গিয়েছিল— 'না, না, মোহনজী', সে বলল, 'ও ঠিক হয়ে যাবে'— আর একেবারে মোহনের কাছে গিয়ে নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে মোহনের দু চোখ মুছিয়ে দিল।

মোহন হৃদয়বেদনা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল— 'আচ্ছা— আমি চলি।'

'আর কিছুক্ষণ বসুন', অচলা ফের বলেছিল।

কিন্তু মোহন অস্বীকার করেছিল। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেছিল— 'আমাকে সাড়ে-এগারোটার সময় অজওয়ানী পেপার মিলে যেতে হবে।'

আর মোহন অভিযোগের দৃষ্টিতে অচলার দিকে তাকিয়ে চলে গিয়েছিল।

অচলা উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে মুচকি হাসি হাসছিল। শোবার ঘরে গিয়ে সে নিজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখেছিল। তাকে কেমন দেখাচ্ছে? তাকে নিজের দিদির চেয়ে ভালো দেখাচ্ছিল। তারপর সে চাকরাণীর কাছে গেল।

'তোমার জোহ্‌নী আসে নি?' অচলা বলেছিল।

এই কথার জবাব দেবার বদলে চাকরাণী বলেছিল— 'ঐ সাহেব যিনি এসেছিলেন চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ।' অচলার কথায় গভীর নিশ্চিন্ততা ছিল।

'তুমি জোহ্‌নীর সঙ্গে ছবি দেখতে চলে যাও', অচ্চী বলেছিল— 'তোমার সবকটা মরদ বন্ধুর মধ্যে এক ওকেই ঠিক লোক বলে আমার মনে হয়…'

আর সহসা হঠাৎই খুশি হয়ে গিয়েছিল।

অচ্চীর সঙ্গে মোহনের বোধহয় পাঁচবার বা ছয়বার দেখা হয়েছিল। এখন সে টেলর-মাস্টার আর অন্যান্য লোকদের নজর বাঁচিয়ে মোহনের গাড়িতে এসে বসত আর দুজনে সন্ধ্যায় হাওয়া খেতে বেরিয়ে যেত।

এর মধ্যে মোহন সুমিত্রাকে সপ্তাহে একটা চিঠির বদলে তিন-তিন খানা চিঠি লিখতে শুরু করে দিয়েছিল। এক চিঠিতে তো মজা করে লিখেছিল— 'যদি তুমি ফিরে না আসো তো আমি আর কারুর সঙ্গে প্রেম করে নেব'— আর এ-সব লিখেই সে সুমিত্রাকে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছিল।

এক সন্ধ্যায় পুরেজ হয়ে গাড়ি ব্যাক-বে'র কাছে আঁধারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অচলাও আপত্তি করে নি। আজ সে বাঁ দিকের দরজার

সঙ্গে লেগে বসার বদলে সীটের ঠিক মাঝখানে বসেছিল। মোহন জামের হাত সীটের উপর অচ্চীর চারদিক ঘিরে ছিল আর অচ্চী এক হাতে নিউট্রালে পড়ে-থাকা গীয়ারকে ফার্স্ট আর সেকেণ্ডে লাগাচ্ছিল— যেন সে গাড়ি চালাতে চেষ্টা করছিল।

মোহন অচলার হাত ধরেছিল। সে বারণ করেছিল, একদিকে মোহনের হাত সে সরিয়ে দিয়েছিল। আর দু হাত কিছুক্ষণের জন্য থেমে গিয়েছিল। এইখানে এসে মোহন বলেছিল—

'গদকরী কবে ফিরছে?'

'এই দু-এক দিনের মধ্যে।'

'কনফারেন্স অনেকদিন চলেছে?'

'ভগবান জানেন। এই পুরুষদের কী খবর কে জানে— কোন্ সতীনের সঙ্গে রঙ্গ করছে কে জানে?'

'কী কথা বলছ?' মোহন অচ্চীর হাত সরিয়ে দিয়ে বলেছিল— 'এ তো তোমার জন্যে ভগবান রাম··· '

'ভগবান রাম হলে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যেত না?'

মোহন হেসে বলেছিল— 'এখন সীতা কনফারেন্সে যায় না।'

তারপর মোহন অচ্চীর বগলে হাত দিয়ে তাকে নিজের দিকে টেনেছিল। অচ্চী সামান্য আপত্তি করেছিল, কিন্তু নিজেই নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। তার এমনি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, কারণ যখন থেকে গাড়ি ব্যাক-বে'তে এসে আঁধারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তখন থেকেই সে ভিতরে ভিতরে কাঁপতে শুরু করেছিল। তার শিরায় শিরায় কোনো সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। সে চোখ বন্ধ করে মোহনের বুকের উপর নিজের মাথা রেখেছিল।

মোহন অচলাকে আদর করছিল। এমন সময় একটা লোক গাড়ির কাছে এসে বলল— 'নারকেলের জল।'

'চাই না।' মোহন অচলার থেকে সরে গিয়ে বলেছিল। কিন্তু নারকেলঅলা এমনি এমনি সেখানে দাঁড়িয়ে রেগে চেঁচিয়ে উঠেছিল— 'আবে, বল না— চাই না···'

মোহন ফের বলেছিল 'যাবি কিনা··· ' মোহন তাকে মারবার জন্যে তার পিছনে দৌড়েছিল।

অচলা তাকে পিছন থেকে ধরে ফেলেছিল— 'কী করছ?' কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে আর নিজের শাড়ি ঠিকঠাক করতে করতে বলেছিল— 'দেখছ না ওর হাতে ছুরি আছে?'

'থাকতে পারে', মোহন বেপরোয়াভাবে বলেছিল।

নারকেলঅলা নিজের মালাবারী ভাষায় কিছু বলে চলে গিয়েছিল। কিছু দূরে পাথরের দেয়ালের উপর বসে একটা লোক চেঁচিয়ে বলেছিল— 'মজাকরা বাবু··· মজাকরা।'

মোহন কিছু দূরে সরে গিয়ে অচলাকে বলেছিল— 'ঘরে ফিরে যাবে?'

'কার ঘরে?'

'আমার··· তোমার··· ঝি কি এখন ওখানেই আছে?'

'না— সে ছবি দেখতে গেছে তার জোহনীর সঙ্গে···'

'তা হলে তো ঠিক আছে···

'না না,' সে বলল— 'ঘরে আমাদের কী করবার আছে?'

আসলে ঘরে ঐ কাঁচের ক্যাবিনেট আর তাতে ঝুলানো ছবিগুলির কথা অচলার মনে পড়ে যায়। সে তো আপন পতির সঙ্গেও প্রেম করবার আগে দরজা বন্ধ করে নেয়। তার পরে পাথরের দেয়ালের উপর বসে-থাকা মাস্তানদের উপস্থিতির অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করে যখন মোহন অচলার মুখ চুম্বন করল তখন প্রথমে অচলার মধ্যে আত্মসমর্পণ ছিল না। 'না, না', সে কিছুটা মৃদুভাবে বলেছিল— তার মধ্যে আপত্তি ছিল আবার ছিলও না। অবশ্য যখন মোহন হাত বাড়িয়ে অচলার ছোটবড় গোপন বিষয় জানবার চেষ্টা করছিল তখন সে রাগ করে সরে বসেছিল। মোহনের খারাপ লেগেছিল। সে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর আবার পুরোপুরি হামলা করেছিল, কিন্তু অচলা নিজেকে খুব মজবুত দুর্গের মধ্যে বন্দী করে বসেছিল। সে অনুযোগের সুরে বলেছিল— 'না, না এই যথেষ্ট হয়েছে।'

'বোকা হোয়ো না অচ্চী', মোহন কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিল—'নইলে তুমিও দেবীর মতো পশ্‌তাবে।'

'না মোহন,' অচলা বড় ভালোবাসার সঙ্গে রাগ করে বলেছিল—'প্রেমের মধ্যে এই-সব মতলব থাকে না।'

'কী থাকে তা বুঝিয়ে দাও।'

'কেন ? ভাই-বোনের ভালোবাসা হতে পারে না ?'

'হবে না কেন ?' মোহন আপন পুরুষালি অসন্তোষ গোপন করে বলেছিল আর তার নিজের বোন রাধার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল,—সে তো পারেলে থাকে।

'এই সম্পর্ক তো আমরা সবসময় রাখতে পারব না.' অচ্চী বলল—'দু-এক দিনের মধ্যে ও এসে যাবে—একমাস দেড়মাসের মধ্যে সুমিত্রা-বোন ফিরে আসবে।'

'হুঁ।'

'ভাই-বোনের ভালোবাসা এমনি যার মধ্যে কোনো ভয় নেই ডর নেই…'

'ঠিক আছে,' মোহন নিজের কপাল থেকে ঘাম মুছে নিয়ে বলল—'আজ থেকে আমি তোমাকে বোন বলে ডাকব'—তারপর খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে দিল।

অচ্চী খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে দু হাত দিয়ে মোহনের বাম বাহু চেপে ধরে কাঁধের উপর তার কেশের সুন্দর মুকুট রেখে বলেছিল— 'তুমি রাগ করেছ।'

'রাগ কেন করব ?' মোহন বলল—'ভাই কি বোনের উপর রাগ করতে পারে ?'

অচলা এক ঝটকায় মোহনের কাঁধের উপর থেকে মাথা সরিয়ে নিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি 'সত্য সদনে'র সামনে দাঁড়িয়েছিল। আজ দরজা খুলে দেবার মোহন একটুও চেষ্টা করে নি। অচলা অনিচ্ছার সঙ্গে নেমে গিয়েছিল। সামনের টেলর মাস্টার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের

দেখেছিল, আশপাশের লোকেরাও দেখেছিল। কিন্তু অচলার কোনো ভয় লাগে নি। সে আজ মোহনকে ধন্যবাদও জানায় নি। সে গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল। এমন সংশয় আর ভয় তার হৃদয়ের মধ্যে দেখা দিয়েছিল যে তা সে নিজেও জানত না। তার ভয় একটা ছিল না, হাজারটা ছিল— যার মধ্যে একটাকে অপরের থেকে আলাদা করে দেখা আর চেনা সম্ভব ছিল না।

'তুমি আর আসবে?' সে শুধিয়েছিল।

'আসব। আসব না কেন?' মোহন বলেছিল আর খিলখিল করে হেসেছিল— যেমন করে লোকে বাচ্চাকে ভয় পাইয়ে দেয়, কিন্তু তা একটা সীমা পর্যন্তই। তারপর মোহন 'টা-টা' বলে চলে গিয়েছিল। অচলা যখন ঘরে ফিরে এসেছিল তখন তার মাথা থেকে একটা বোঝা নেমে গিয়েছিল।

পরদিন গদকরী ফিরে এসেছিল।

অচ্চী তাকে আনবার জন্য স্টেশনে গিয়েছিল। সে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল যে তার পতি গোঁফ রেখেছে।

'এ কি ব্যাপার', অচলা শুধাল।

'এমনিই', তার পতি হেসেছিল আর প্রেমের দৃষ্টিতে আপন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল— 'মনের খেয়াল।'

কুলির মাথায় সুটকেস চাপিয়ে দিয়ে অচ্চীর কাছে এসে বলেছিল, 'খারাপ দেখাচ্ছে?'

'না, খারাপ দেখাচ্ছে না কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে হাঁটছি?' অচলা মুচকি হেসে বলেছিল।

রাম গদকরী খোঁচা দিয়েছিল— 'একই জীবনে দুইজন পুরুষ দেখতে পেলে ভালো হয়, না?'

সে ভেবেছিল অচ্চী হাসবে আর এই ঠাট্টার মজা পুরোপুরি উপভোগ করবে অথবা ধপ্ করে পিঠে চড় মেরে বলবে— 'লজ্জা করে না…' কিন্তু অচলা কিছুই বলল না। উল্টে যেন কোনো চিন্তার ছায়া তার মুখের উপর দিয়ে চলে গেল। এক সন্ধানী দৃষ্টিতে সে

রামের মুখের দিকে তাকাল। সে মুখ গোঁফের জন্যে আগের চেয়েও বেশি বোকা দেখাচ্ছে। অচলার বিশ্বাস হল যে কোনো বাজে কথা নয়, এখন সে ভালোবাসার কথাই বলছে, কিন্তু— কিন্তু রাম গদকরী কন্‌ফারেন্সের ঝগড়াঝাঁটির গল্প শুরু করল।

ঘরে পৌঁছে অচ্চী আপন পতিকে জিনিসপত্রও ঠিকমতো রাখতে দেয় নি। সে বাচ্চা মেয়ের মতো উছলে উঠেছিল আর তার হাত ধরে টানতে টানতে অন্দরে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁ-ফুঁ করে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিল। রাম গদকরী অবাক হয়ে থমকে গিয়েছিল।— 'আরে মোটে এগারো দিন তো লেগেছে।'

কিন্তু অচ্চী কাঁদছিল আর হাত-পা ছুঁড়ছিল। তাকে আলিঙ্গন করে সান্ত্বনা দিয়ে শেষে রাম বলল— 'আমি কী করে জানব যে তুমি এতই ভয় পাবে।'

'আমি এই সব ভয়ের চোটে করছি?' অচলা একদম দূরে চলে গিয়ে বলল।

'না, প্রেমের তাড়নায়', রাম গদকরী হেসে ফেলেছিল। এগিয়ে গিয়ে ফের অচ্চীকে কোলের মধ্যে নিয়ে বলেছিল— 'আমি জানতাম অচ্চু আমিও তোমায় এতই ভালোবাসি।'

'বাস্।'

'এর চেয়েও বেশি।'

'মিথ্যুক কোথাকার। আমাকে ভালোবাসলে কি এই গোঁফ রাখতে?'

অচলার খেয়াল ছিল যে রাম গোঁফ রেখেছে কোনো মেয়েকে ঘাবড়ে দেবার জন্যে। রাম বুঝে গিয়েছিল। সে অচলার ভাবনার চেয়ে বেশি নিজে বুঝে নেবার ফলে খুশি ছিল। প্রেমের সঙ্গে সে মুখ এগিয়ে দিয়েছিল আর অচলা মুখ পিছন দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছিল। তাতে রাম শপথ করেছিল যে পরের দিনই সে গোঁফ-টোঁফ সব কামিয়ে ফেলবে। কেবল নিজের নয়— যারই দেখা যাবে তারও।

দু-একদিনের পরে শপথ অনুসারে মোহন্‌জাম এসেছিল। প্রথমে

অচ্চী চমকে উঠেছিল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সে আপন পতি রাম গদকরীর কাছে দৌড়ে গিয়ে বলেছিল— 'জী, আমি আপনাকে বলি নি। আমি আমার এক ভাই বানিয়েছি।'

'ভাই? বানিয়েছ?'

'হাঁ' অচলা বলতে থাকে— 'কেন ভাই হতে পারে না?'

তারপর রাম গদকরীকে ধরে অচলা মোহন জামের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্যে ড্রইং রুমে নিয়ে এসেছিল। দুটি পুরুষ একে অপরের সঙ্গে এমনভাবে আলাপ করেছিল যেন তারা অর্থহীনভাবে আলাপ করছে। রাম গদকরী ঠিকভাবে মোহন জামকে বসায়-টসায় নি অথবা ঠিকমতো তার খাতির-টাতির করে নি এমন নয়। সে সব-কিছুই করেছিল কিন্তু তা এমনভাবে যাতে লোকে কিছু না খেয়াল করেই করে যেতে থাকে। মুচকি হাসি ছিল কৃত্রিম। উচ্চ হাসি ছিল কৃত্রিম।

আর অচলা খুব খুশি হয়ে গিয়েছিল। একবার ভাই বলে ডাকার পর যেন তার মুক্তি হয়ে গেছে। সে কেবল চা খাটাই ইত্যাদি সামনে রাখে নি পরন্তু ঝিকেও কিছু নোনতা খাবার আনতে বাজারে পাঠিয়েছিল। রাম গদকরী এই-সব বরদাস্ত করেছিল কিন্তু একটা বিষয় সে বুঝতে পারে নি। সেটা এই যে, মোহন জাম এলে পরে অচলা তাকেও (গদকরীকে) ভুলে যায়— যে তার পতি, তার ভাইয়ের ভগ্নীপতি। আর রাম গদকরী দেখছিল যে এইরকম করায় অচলা কতই বিবশ হয়ে পড়ে।

যখন কিছু জিনিস আনার জন্যে অচলা অন্দরে আসছিল তখন দুটি পুরুষ একে অপরের সঙ্গে যেমন-তেমন ভাবে ফর্মালিটির ঢঙে দু-একটা বাক্য বলছিল। রাম গদকরী কনফারেন্সের 'রোয়াব' দেখাবার সুযোগ পেয়েছিল আর মোহন জাম সেই শিপমেন্ট-এর উল্লেখ করেছিল যা জাপান থেকে সদ্য সদ্য সে চেয়ে পাঠিয়েছে। দুজনের চিন্তার মাঝখানে ছেদ পড়ে যাচ্ছিল।

অচ্চী অন্দর থেকে এসেছিল। এর মধ্যে সে শাড়ি বদলেছিল,

সামনের চুলে ফের মুকুট বানিয়েছিল আর তার সঙ্গেই সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল।

'ভাইসাহেব, বউদি আসেন নি— ?' অচলা জিজ্ঞাসা করেছিল। ফের রাম গদকরীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল— 'ও কাশ্মীর গিয়েছে। আমার সঙ্গে তো তার দেখা হয় নি, কিন্তু শুনেছি খুব ভালো মেয়ে।'

'ভালোই হবে'— রাম একমত হয়েছিল।

তারপর রাম বিস্ময়ের দৃষ্টিতে মোহন জামের দিকে তাকিয়ে ছিল।

সব-কিছু খাওয়ার পর, হাতে হাত মেলাবার পর মোহন জাম উঠে রওনা দিয়েছিল। 'আমি আসছি' বলে অচলা দরজা পর্যন্ত তাকে বিদায় দিতে গিয়েছিল। আবার কোনো কথা ভেবে সে দরজা থেকে বেরিয়ে ল্যান্ডিং ছাড়িয়ে নীচে চলে গিয়েছিল যদিও তার পতি অতিথিকে বিদায় করার জন্যে কেবল ফর্মালিটির খাতিরে উঠে দাঁড়িয়েছিল এমনই শালা-ভগ্নীপতির মধ্যে শালার সম্পর্ক ছোট হয়।

নীচের পথে নামার আগে মোহন জামের হৃদয় চেয়েছিল সে অচলাকে আদর করে। অচ্চীকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। সে কেবল তার হাত ধরতে পেরেছিল। আদরের সঙ্গে হাতটা টিপে মোহন বলেছিল—

'অচ্চী, তুমিও একদিন আমার ওখানে এসো-না।'

'আসব' অচ্চী বলেছিল। সে ফের বলেছিল— 'ওকেও নিয়ে যাব।'

তারপর অচলা গাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল। মোহন জাম চলে যাবার সময় অচলা আর মোহন দুজনেরই চোখ জলে ভরে এসেছিল।

অচলা তেমনি দ্রুতপদে উপরে চলে এসেছিল।

রাম গদকরীকে চিন্তা করবার সুযোগ অচলা দেয় নি। সে বলতেই থাকে— 'আমার ভাইসাহেবকে দেখলে ?— খুব ভালো লোক, লাখে একটাই পাওয়া যায়।'

রাম মাথা নেড়েছিল, যদিও তার কপালে কুঞ্চনরেখা দেখা দিয়েছিল। তাদের দুজনের মাঝে খামাখা ভাই এসে গেল। এর দরকার কী ছিল? সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। তবু সে অচ্চীকে বলেছিল— 'যদি সত্যিসত্যি তোমাদের ভাই-বোন সম্পর্ক হয় তবে ফের কেন ভাইসাহেব বলছ? ভাইয়াজী বলছ না কেন?'

'নাও, এ আবার একটা কথা হ'ল?'

আর অচলা সেইভাবেই মোহনের গুণ গাইতে থাকে। সে যখন দেবীর সঙ্গে বেড়াচ্ছিল, তখন কয়েকটা মাওয়ালী (নীচু চাকরশ্রেণীর লোক) তাদের পিছনে লাগে। যদি মোহন জাম সেখানে এসে না পড়ত তা হলে না জানি কী হত। তাদের ঐ সম্পর্ককে ভালো আর নির্মল দেখাবার জন্যে অচলাকে আরো অনেক অপ্রয়োজনীয় মিথ্যা কথা বলতে হয়েছিল। কারণ সম্পর্ক বানিয়ে থাকে মানুষই, ভগবান নয়।

তারপরে দু-একবার মোহন জাম এসেছে আর অচলা ঐরকম বিবশতা ও আত্মবিভোরতার সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করেছে। মোহন জাম চলে যাবার পর রাম গদকরী অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকেছে। এখানকার এই নৈঃশব্দ্যে তার নিজেরই ভালো না-লাগার অনুভূতি হতে থাকে। সামনের তাকে ট্রান্‌জিস্টার ছিল। সেটার চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে রাম অচ্চীকে বলল—

'জানো ট্রান্‌জিস্টার কাকে বলে?'

,এই যা সামনে রয়েছে!'

'না', কিছুটা রাগ আর কিছুটা মুচকি হাসি মিশিয়ে বলল— ,সিস্টার বলে বোনকে আর ট্রান্‌জিস্টার বলে সেই বোনকে যে আপন নয়···এইভাবেই ভাড়া নিয়ে বানানো হয়···এইকারণে তুমি হৈ-চৈ লাগিয়ে দাও···'

অচলার খুব রাগ হল—'মতলবটা কী?···আপনি ভাই আর বোনের সম্পর্ক সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করছেন? তা নিয়ে ঠাট্টা করছেন?'

'আমার বলবার উদ্দেশ্য হল...'

'আমি সব জানি', অচ্চী হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—'তোমরা পুরুষরা সব হতচ্ছাড়া বদমাশ। তোমাদের দৃষ্টিতে পুরোপুরি ময়লা ভরা আছে...দুনিয়াতে কি সকলেই মন্দ-মেয়েমানুষ পতি-পত্নী হয়ে মেলামেশা করতে পারে? সংসারে কি...' বলতে বলতে অচ্চীর গলা ভরে এল আর সে কাঁদতে কাঁদতে ক্যাবিনেটের সামনে ভগবানের ছবির কাছে হাঁটু গেড়ে বসে দোহাই পাড়তে লাগল—'আমি যদি কোনো পাপ করে থাকি ভগবান, আমার শরীরে যেন পোকা পড়ে... কুষ্ঠ হয়ে যায়...'

রাম এবারে পস্তাতে থাকে। ভগবানের প্রশংসাপত্র তারও তো আছে। সে পিছন দিক থেকে এসে অচলার দু'কাঁধ ধরে তুলল, কিন্তু অচলা তাকে এমন জোরে ধাক্কা দিল যে রাম দেয়ালে গিয়ে পড়েছিল। মাথায় সামান্য চোটও লেগেছিল। অচলা এতই স্বাস্থ্যবতী ছিল যে রাম গদকরীর মতো একহারা চেহারার পুরুষের পক্ষে তাকে সামলানো মুশকিল ছিল। তারপর অচলা ঘরে গিয়ে নিজের বিছানায় পড়ে জোরে জোরে কাঁদতে থাকে।

রাম এখন খুব অনুতাপ করছিল। আপনারা জানেন যে অনুতাপকারী পুরুষের কী হাল হয়? রাম সারা সন্ধ্যা অচ্চীর মান ভাঙানোর চেষ্টা করেছিল যদিও তার 'বিরলা মুতোশ্রী সভা ঘর'-এ বিলায়েত হুসেনের সেতার শুনতে যাবার কথা ছিল আর অচলার জন্যে টিকিট কিনে নিয়ে এসেছিল। এখন তার সুন্দরী কিন্তু ক্রুদ্ধা বিবির সামনে তা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তারপর সে ঐ বিছানায় পড়ে ঘরের সেতারের কোমরে হাত রেখে তার তারগুলি দুরুস্ত করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে ওস্তাদ লোক ছিল না, এ কারণে একটা সুরও ঠিকমতো বাজে নি। শেষ পর্যন্ত সে এইটুকুই বলেছিল—'অচ্চু, আমি তোমার প্রতি এতটুকু সন্দেহ করি তো গোরু খাই। আমি তো কেবল এ কথাই বলেছি যে তোমার আপন ভাই তো আছে...'

'কোথায় আছে?' অচলা বলেছিল—'এক তো কোলকাতায় রয়েছে...আর দ্বিতীয় জন আছে বিজয়ওয়াড়াতে।'

'কাছে কোনো ভাই থাকা এতই জরুরি?'

'হাঁ, জরুরি', অচ্চী খুব জোরে মাথা নেড়ে বলেছিল—'কেউ তো থাকবে তোমার খোঁজ করার জন্যে···' রাম গদকরী আবারও কথা বুঝতে পারে নি।

খুব সুরেলা কণ্ঠে সে বলেছিল—'তোমার মর্জি, কিন্তু আমি তো বুঝি এর কোনো দরকার নেই।'

'আমাকে রাখার কি তোমার কোনো দরকার আছে?'

একমাস-দেড়মাস বাদে সুমিত্রা ফিরে এল।

সুমিত্রাকে এখন আগের চেয়ে যথার্থই ভালো দেখাচ্ছিল। বাচ্চা-দের স্বাস্থ্যও আগের চেয়ে ভালো হয়েছিল। তারা কাশ্মীরী ভাষায় কিছু শব্দ শিখে এসেছিল। ভুলচুকসুদ্ধ সেগুলি ব্যবহার করত। সুমিত্রা বারবার তাদের ধরে ধরে বলত, ড্যাডিকে এটা শুনিয়ে দাও, ড্যাডিকে ওটা শোনাও; কিন্তু বদমাশরা ঐ মুখস্থ করা বাক্য বারবার আওড়াত। পরে জানা গেল, সেগুলি কাশ্মীরী ভাষায় খারাপ গালাগালি।

মোহন জাম অচলার মতো বেকুবী করে নি। সুমিত্রার সঙ্গে অচলার দেখা করিয়ে দেবার অনেক আগে থেকেই সে বলেছিল—সে এক বোন পাতিয়েছে।

সুমিত্রা শুনেছিল। মোহনের উপর তার পুরোপুরি ভরসা ছিল। না...সে সেই-সব রমণীদের মধ্যেই ছিল যারা পুরুষের উদ্দামতা আর বে-পরোয়ার সঙ্গে প্রেম করত। তার স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার ফলে সে প্রেমের চাহিদা পুরো মেটাতে পারত না আর জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় মৃত্যুর চেয়ে বড়ো বলে এমন কিছুর চিন্তা করত, আর বলত—'কিছু করছ না তো না করলে।' ফের বলত···'ভগবানের জবাব সে দেবে, আমি দেব না।'

শেষে রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে এমনি আওয়াজে কাঁদতে থাকে

যার শব্দ সে নিজেকেই শুনতে দেয় না।

সুমিত্রা কেবল এ কথাই বলেছিল—'দরকার কী ছিল? তোমার আপন বোনই তো আছে। তার উপরেই নিজের ভালোবাসা ঢেলে দাও।...ভালোবাসার কি এমনিই কোনো বন্যা এসেছে?'

'হাঁ', মোহন কিছুটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল।

সুমিত্রা বসে পড়েছিল। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার ব্যাপার তো ছিল। এখন থেকেই তা শুরু হয় কেন? সে জবাবের আন্দাজে বলেছিল—'রাধা কেমন আছে?'

'আমি তো ওর সঙ্গে দেখা করি নি।'

'হায় রাম! যখন থেকে আমি গিয়েছি নিজের বোনের সঙ্গে দেখা করো নি... ?'

'সময় পাই নি।'

'আর সে নিজেও আসে নি। রাধা আর কৈলাসপতি?'

'এসেছিল তিন-চারবার···কিন্তু আমি তো বাড়িতে ছিলাম না।'

সুমিত্রা বলতে চাইছিল—কার সঙ্গে তুমি দেখা করতে? রাধা তো আপন বোন। পাতানো বোন নয়। কিন্তু সে তাকে কিছুই বলল না। তার স্বাস্থ্য এখন খুব ভালো ছিল না।

মোহন জাম ফের বলেছিল—

'চব্বিশ তারিখে রাখী-বন্ধনের উৎসব আছে, যাব আর দেখা করে আসব।'

রাখী-বন্ধনের দিন মোহন জাম পারেলে নিজের বোন রাধার ওখানে পৌঁচেছিল। সঙ্গে সুমিত্রাও ছিল। রাধা এমনভাবে ছুটে এসেছিল যেন অনেক বছর বাদে দেখা হয়েছে। তার এই অনুভূতিও ছিল না যে সে মেয়েমানুষ। আর মোহনের খেয়াল ছিল না যে সে পুরুষ হতে পারে না। মোহন রাধার গালে চুমু খেয়েছিল, কপালে আদরের সঙ্গে হাত বুলিয়েছিল আর বোনের দু চোখ থেকে অভিযোগের অশ্রু মুছে নিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে রাধা খুব খুশির সঙ্গে উঠে ঝুড়ি থেকে মিঠাইয়ের

থালা তুলে নিয়েছিল। সামনে জলচৌকিতে ভাইকে বসিয়েছিল। তার মুখ পূর্বদিকে করে দিয়েছিল। মোহনের ছেলে জাজু অন্য চৌকিতে এমনভাবে বসেছিল যেন আট বছরের ছেলে।

'আরে!' রাধা জাজুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল— 'গোড়ায় তুই রাখী বাঁধিয়ে নিবি?'

'হাঁ,' জাজু ঘড়ার মতো মাথা হেলিয়েছিল। 'আগে আমি আমার ভায়ের হাতে বাঁধব।'

'না, আগে আমার হাতে বাঁধো।'

'এইরকমভাবে হুকুম চালাচ্ছিস্,' রাধা স্নেহের সঙ্গে বলল—'তুই ভগবানকে বল্ তোকেও এক ছোট্ট বোন এনে দেয়। সেই তোকে প্রতি বছরে রাখী বেঁধে দেবে।'

আর এভাবে বলায় জাজু, মোহন আর কৈলাসপতি তিনজনে সুমিত্রার দিকে তাকাল সে লজ্জা পেয়ে শাড়িতে মুখ ঢেকে ফেলেছিল।

রাধা মোহন-ভাইয়ের কব্জিতে শাদা সূতোর রাখী বেঁধে দিয়েছিল। মুখে এক টুকরো মিঠাই দিয়েছিল। মোহন পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বার করে রাধার হাতের চেটোয় রেখেছিল। রাধা ঐ নোট তার দু চোখে ছুঁইয়েছিল। আর প্রার্থনা করেছিল—

'ভগবান, প্রত্যেক বোনের জন্য এই দিন বারবার ফিরে আসুক।'

তার দু চোখে ভালোবাসা আর বিশ্বাসের অশ্রু ছিল।

সুমিত্রার আর বাচ্চাদের ঘরে নামিয়ে দিয়ে মোহন জাম অচলার ওখানে যাবার জন্যে বেরিয়েছিল। সে সুমিত্রাকে পরে কখনো নিয়ে যেতে চেয়েছিল, ঐ দিন নয়। তার কোনো বিশেষ কারণ ছিল। মেয়েরা কোনো কোনো কথায় পুরুষদের খামাখা থামিয়ে দেয়— 'এটা করো, ওটা কোরো না···' যেমন মেয়েদের অনেক কথাই পুরুষদের বুদ্ধিতে ধরা দেয় না, তেমনি পুরুষদের অনেক কথা মেয়েরা কিছু বুঝতে পারে না।

মোহন বাজারের একটা কাপড়ের দোকানে গেল। অনেক কাপড়

ওলট-পালট করার পর এক বেনারসী শাড়ী সে পেল— যার উপরে সোনালি কারুকাজ করা ছিল। শেষ পর্যন্ত ঐ শাড়ির দাম সওয়া তিনশো ধার্য হয়েছিল। মোহন টাকা দিয়েছিল। একটা সুন্দর গিফ্‌ট-পেপারে শাড়িটাকে বাঁধিয়ে নিয়েছিল আর 'কজ-ওয়ে'তে ,সত্য সদন'এর উদ্দেশে যাত্রা করেছিল।

অচলা নিজের ঘরে বসে কাঁচি হাতে নিয়ে কাটাছেঁড়া রিফু করছিল। সকাল থেকে সে কাজ শেষ হচ্ছিল না। রাম গদকরী জানলায় দাঁড়িয়ে বাজারের লোকজন দেখছিল আর নীচে টেলর-মাস্টারের দোকানে আসা-যাওয়া করছিল যে-সব লোক তাদের প্রত্যেকের মাথার উপর নিজের সিগারেটের ছাই ঝাড়বার চেষ্টা করছিল। সে সময় তার সামনে মোহন জামের গাড়ি এসে দাঁড়াল।

পিছু হটে রাম গদকরী চীৎকার করল—

'অচ্চী!'

'জী', অচ্চী খুব মিহি গলায় জবাব দিল।

'সে এসেছে।'

'সে কে? ··· ভাইয়াজী?'

'ভাইয়াজী না ··· মচলা।'

'মচলা?'

'হাঁ— তুমি তো অচলা, আর সে মচলা—'

এই সময়ে মোহন দরজার কাছে এসেছিল। ঘণ্টা বেজে উঠেছিল। ঝি দরজা খুলেছিল।

রাম গদকরীর ধারণা ছিল যে ঐদিন মোহন আসবে না। যদি সে রাখী বাঁধবার জন্যে এসে যায় তো কোনো গোলমাল করতে পারবে না। আর সবই তো ঠিক আছে। মোহন এসে গিয়েছিল। তারজন্য অচ্চী ভোর থেকেই কলাবত্তু, ঝলমল আর কে জানে কী কী সব জিনিস দিয়ে এক সুন্দর রাখী বানাচ্ছিল। রাধার গরিবী মৌলীর রাখী মোহন খুলে নিয়ে কোথায় ফেলে দিয়েছিল; এখন তার কব্‌জিতে কিছুই ছিল না। মোহনের আগমনে অচলা বরাবরের

মতো উছলে উঠেছিল আর দৌড়ে ড্রইং-রুমে চলে এসেছিল। আর তাকে এমন খাতির করেছিল যেমন কোনো রাজাকে করা হয়।

রাম গদকরী বরাবরের মতোই কিছু বুঝেছিল আর কিছু বোঝেনি।

কিছুক্ষণ পরে মোহন জাম পূর্বদিকে মুখ করে পিঁড়ির উপর বসল। গদকরী দূরে বসে নিস্পৃহ হয়ে এই দৃশ্য দেখছিল।

তারপর অচলা এল। সে চুস্ত কামীজ আর শালোয়ার পরেছিল। গলায় পেঁয়াজের খোসার রঙের এক দুপাট্টা ছিল। তা অচ্চীর গলায় আর বুকের ছাতিতে স্বাস্থ্যের আভা দিয়েছিল। কামীজ ছ তি, কোমর আর নিম্নাংশকে খুব সুন্দরভাবে আঁটসাঁটভাবে ধরে রেখেছিল। তার হাতে ছিল থালা। তাতে রাখা ছিল মিঠাই।—তার উপর সোনার কারুকাজ চকচক করছিল আর তার একদিকে ছিল রাখী—তার ঝলমল সুতোয় কয়েকটি সাঁচ্চা মোতি লাগানো ছিল।

মোহন খুব সাহসের সঙ্গে হাত বাড়িয়েছিল। অচলা যখন মোহনের কব্জিতে রাখী বাঁধতে শুরু করেছিল তখন রাম গদকরী দেখছিল ঐ হাত খুশিতে কাঁপছে। ফের মোহন মিঠাই-টুকরোর জন্য হাঁ করেছিল আর অচলা তার মুখে কালাকাঁদ দিয়েছিল। তখন মোহন গিফট-পেপার খুলেছিল। তার থেকে শাড়ি বার করেছিল। তার উপর এক শ' টাকার নোট রেখেছিল আর জিনিস দুটি অচলার দিকে বাড়িয়ে ধরেছিল।

রাম গদকরীর দু চোখ কিছুক্ষণের জন্য বড় বড় হয়ে গিয়েছিল, তারপর যেমন ছিল তেমনি হয়ে গিয়েছিল।

রাখী-বন্ধনের এই প্রথা পালনের সময় অচলা আর মোহন দুজনেই চুপ করে ছিল। দুজনের শরীরে হঠাৎ কারুর হাত ঠেকে গেলে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর অচলা মৃদুকণ্ঠে বলেছিল—

'ভগবান, এই দিন বারবার আসুক।'— মোহন যখন অচলার চোখের দিকে তাকিয়েছিল তখন তাতে ছিল লজ্জার গাঢ় লাল রঙ…

কিছুক্ষণ এটা-ওটা কথা বলবার পর মোহন রামগদকরীর হাতে হাত মিলিয়েছিল। অচলাকে নমস্কার করে রওনা হয়েছিল। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলতে শুরু করেছিল।

অচলা বরাবরের মতোই তাকে নিচে বিদায় দিতে যেতে চাইছিল, কিন্তু আজ তার পা চলতে চাইল না।

'তোমার খুশি হওয়া চাই', রাম বলেছিল—'ভাইয়ের হাতে রাখী বেঁধেছ।'

'হাঁ', অচ্চী বলেছিল— 'কিন্তু আজ সকাল থেকেই আমার শরীরটা একটু··· '

'সকাল থেকেই তো তুমি এই-সব বানাচ্ছ, সব-কিছু একত্র করছ।'

অচলা মাথা হেলিয়েছিল। রাম এগিয়ে এসে বলেছিল— 'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি ভাইয়ের শাড়ি পরে আমাকে দেখাবে···'

অচ্চী কোনো জবাব দেয় নি। তার দু চোখ বন্ধ হতে দেখে রাম গদকরী এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে খুব প্রেমের সঙ্গে বলেছিল— 'আমার অচ্চীর কী হয়েছে?'

'কিছু না', অচ্চী মৃদুকণ্ঠে বলে নিজের দুহাত দিয়ে রামকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল — 'আমাকে আদর করো··· '

রাম অচ্চীকে বুকে টেনে নিয়ে সজোরে জড়িয়ে ধরেছিল।

'আরো জোরে', অচ্চী বলেছিল।

তারপরে অচ্চীর দুচোখ বন্ধ আর মুখ খোলা ছিল··· তখন অচলা আর রাম গদকরীর চিন্তা থেকে মোহন জাম দূরে চলে গিয়েছিল।

ইস্মত চুগ্‌তাই

একটি সামান্য কথা

'কী? ভালো করে বুঝেছ তো? একটি সামান্য কথা'··· উকিল সাহেব সামনে ঝুঁকে পড়ে রোগা পাতলা চেহারা ছেলেটাকে শুধালেন।

গোপাল সিংহের কেতাবী মুখের উপর হলুদ ছড়িয়ে পড়ল। বেড়ে-ওঠা বয়সের লাল্‌চে দাড়ি সরষে দানার মতো মুখের উপর ফুটে উঠেছে। কানপাটা থেকে লম্বা লম্বা ধারায় ঘাম নেমে যাচ্ছে। সে বারবার হাতের চেটো দিয়ে তা মুছে ফেলছে। সে তার শ্রান্ত আঁখি দুটি কয়েক মন ভারী বোঝার মতো উপর দিকে তুলল।

তার চোখদুটি দেখে উকীল সাহেব থতমত খেয়ে গেলেন। সোনালি হাতের চেটো রাগে কাঁপছে··· যেন দুধে-ভরা বাটিতে সোনালি তারের ফুল ভাসছে। দয়াময় ঈশ্বর কত রাত জেগে জেগে এই চোখদুটি বানিয়েছেন।

'না, উকিল সাহেব', গোপাল মুমূর্ষুর মতো শ্বাস ফেলল। তার মাথা আরো ঝুঁকে পড়ল। বসে-যাওয়া চোখের পাতা যেন ছল্‌কে-ওঠা বাটিতে ভারী পর্দা ফেলে দিল।

'আরে ভাই, এ কথাটা আর বুঝলে না। রক্‌খীর সঙ্গে তোমার অন্যায় সম্বন্ধ ছিল। তোমরা দুজনে রাতে···'

'না', গোপাল সিংহ অসম্মতি জানিয়ে এদিক-ওদিক মাথা নাড়তে লাগল— যেন সে কোনো অজানা ফাঁদ থেকে নিজের গর্দান ছাড়াতে চাইছিল— 'এমন কথা বোলো না উকিল সাহেব··· বোলো না···'

'সরদারজী,' উকিল সাহেব খুব জোরে টেবিলের উপর ঘুঁষি মারলেন— 'কেন আমার সময় নষ্ট করছ? তোমার ছেলে মরতেই চায়। কোনো উকিল তার প্রাণ বাঁচাতে পারবে না···'

'উকিল সাহেব,' গোপাল সিংহের বুড়ো বাবা অস্ফুট আর্তনাদ করে পাশ ফিরে বসল— 'আমার একটাই ছেলে, উকিল সাহেব··· এর প্রাণ বাঁচিয়ে দাও···'

'এতে আমার কী দোষ আছে সরদারজী, যে আপনার একটাই ছেলে আর ফাঁসিতে ঝুলে পড়ার সিদ্ধান্ত সে করেই ফেলেছে।'

'যদি এর ফাঁসি হয়ে যায় তো···' বুড়ো সরদার কেঁদে ফেলল।

'আমি যেমন বলছি তেমন বয়ান যদি আদালতে এ বলতে পারে তবে ফাঁসি হবে না।'

'এই কথাটা আর এর মাথায় ঢুকছে না। এর মাথায় তো গোবর ভরা আছে। রক্খীর সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল। জোগীন্দর একে হাতে হাতে ধরে ফেলেছিল। ওর মাথায় খুন চড়ে গিয়েছিল। সে গঁড়াসা (ধারালো অস্ত্র) নিয়ে দুজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টানা-টানিতে গঁড়াসা উল্‌টে জোগীন্দরকেই আঘাত করেছিল আর সেখানেই সে খতম হয়ে গিয়েছিল···'

'এ মিথ্যে কথা। গঁড়াসা আমার হাতে ছিল। আমি জোগীন্দরকে মারতে গিয়েছিলাম···'

'আবার মুর্গীর সেই এক ঠ্যাং— সরদারজী। তোমার ছেলে এক নম্বরের ঐ আছে···'

'গোপিয়া। আমার দিকে দেখ রে বেটা।' বুড়ো সরদার বলল।

ছেলে বিব্রত হয়ে মাথা নিচু করল। সে জানত যে বুড়ো বাপের চোখদুটি গাঢ় থকথকে জমির মতো তার মনকে আটকে ফেলবে। আর কখনোই তাকে ছাড়বে না।

উকিল সাহেব দু হাতে মাথা চেপে ধরলেন। এইরকম বিব্রত অবস্থার সংস্পর্শে তিনি আজ পর্যন্ত আসেন নি। তিনি বড় রূঢ়, উদাসীন আর কারবারী ঢঙের লোক। কে জানে কত ডাকাত, খুনে আর পাগলামি-ভরা রোগীকে ফাঁসিকাঠ থেকে নামিয়ে এনেছেন। কোনো মোকদ্দমায় তিনি কখনো ভাবুকতাকে প্রশ্রয় দেন নি। কিন্তু এই বুড়ো সরদার আর রোগা-পাতলা ছেলেটাকে দেখে কে জানে কোথায় হৃদয়ের এমন বে-জায়গায় চোট লেগেছে যে বেচারী বিবশ হয়ে গেছেন। ইয়া আল্লাহ্! হতভাগাটা কী সুন্দর চেহারা পেয়েছে··· দেখে মনে হয় চন্দনের গাছ সোঁদা-সোঁদা মাটি থেকে লাফ

দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'গোপাল সিংহ··· কখনো ফাঁসি দেখছ?'

'না জী···'

'বাচ্চা তুমি কি জানো, ফাঁসি কত ভয়ানক হয়? চোখ ঠিকরে গালের উপর বেরিয়ে আসে। জিভ বাইরে বেরিয়ে পড়ে। গলা টেনে এক হাত লম্বা হয়ে যায়।' উকিল সাহেব একেবারে ভয়-দেখানোর আর গাম্ভীর্যের কণ্ঠে গোপালকে এমনি ভয় দেখালেন যে একেবারে নিজের পিঠের উপর যেন কেন্নো হাঁটতে থাকে। দুধের বাটিতে ভাসমান সোনালি তারের ফুলের কুঁড়িগুলি উথাল-পাথাল হয়ে গেল।

'তুমি রক্‌খীকে ছেলেবেলা থেকেই চেন?' উকিল সাহেব কথা ঘুরিয়ে নিলেন।

'হাঁ জী। এ আর সে খেলা করে বেড়াত··' বুড়ো সরদারজী হাত দিয়ে মাটি থেকে কয়েক ফুট উচ্চতা মেপে দেখালেন।

গোপালের মুখের উপর নরম-নরম ছেলেমানুষি ভাব দেখা গেল। উকিল সাহেবের ফের খোদার কৌশলের কথা মনে এল। কে জানে দেবদূতেরা কত মুখের সরলতা চুরি করে নিয়ে এই ছোকরার মুখের উপর লাগিয়ে দিয়েছে।

'এর মানে হল তোমরা ছেলেবেলা থেকেই একে অপরকে চাইতে।'

'বাচ্চারা তো বাঁদরের মতো হয়। চাওয়া-বাহানা-করা যেরকম। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভাব আর ঝগড়া। এই গলায় গলায় হয়ে সবুজ-সবুজ ঘাসে বীরবৌটি খুঁজে বেড়াচ্ছে, আবার কিছুক্ষণ পরে একে অপরের চুল ধরে টানাটানি করছে। আর রক্‌খীটা তো পুরো ধানী লংকা। কারুর সঙ্গে তার দু ঘড়ি বনত না। এক গোপালই তার নাদিরশাহী সহ্য করত। বুড়ো বয়সের সন্তান তো। ছেলের দিল খুব ধীরস্থির। রক্‌খী ধুৎ করত তো মুখ ঘুরিয়ে মার কনুইয়ের সঙ্গে লেগে বসে থাকত। আবার যখন তার মন চাইত আর চেঁচিয়ে ডাকত তখন দৌড়ে-দৌড়ে তার কাছে পৌঁছে যেত···'

আরো কিছুটা বড়ো হয়ে গেলে অন্যান্য মেয়েদের দলে মাথায় মাথায় লাগিয়ে কে জানে কী-না-কী কথা বলত। রক্‌খী গোপালের থেকে একেবারে দূরে চলে গেল।

'ছোকরারা খুব খারাপ হয়ে থাকে, ওদের মনে বদ ভাব থাকে'— রক্‌খী গোপালকে এ কথা বুঝিয়েছিল আর সে বুঝে গিয়েছিল। ফের তার মনের মধ্যে বদ্‌ভাব চুলবুল্‌ করতে লাগল। এর পরে রক্‌খীরও বদ্‌ভাবে আসক্তি দেখা গেল। কখনো মনে করত, কখনো নিজের থেকেই ভাব করত।

'দেখ্‌রে গোপী— যদি তুই কোনোদিন আমার সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করিস তো ভালো হবে না। চাচীকে বলে দিয়ে তোকে এত জুতা-পিটি খাওয়াব যে পাগড়ি ঢিলে হয়ে যাবে— '

'যা রে পেত্নী, আমায় কি পাগলা কুকুরে কামড়েছে যে তোর সঙ্গে প্রেম করব ?' গোপাল রেগে যেত।

'কেন রে পাজী, আমার মধ্যে কী দোষ আছে ? আমি কি কালা-কুষ্টি ? না কানা-খোঁড়া যে আমার সঙ্গে প্রেম করবি না— বল্‌'— সে লড়ে যেত।

'ব্যস, আমার মর্জি হয়তো করব, মর্জি হয়তো না করব', গোপাল দৃঢ়ভাবে বলত।

'আহা হা হা হা— কী আমার এলেন মর্জির দাস ! যা ! চুলোয় যা', সে রেগে যেত আর কয়েক দিন নাক উঁচু করে থাকত। গোপালের ছুনিয়া আঁধার হয়ে যেত। সে উদাস-উদাস মুখ করে এদিকে-ওদিকে ঘুরত। আবার কে জানে রক্‌খীর কোন্‌ তারে ঘা লাগত, সে একেবারে নরম হয়ে যেত।

'হায় গোপী, তোকে ছেড়ে কী করে বাঁচব। আমি তো বিষ খেয়ে শুয়ে থাকব।'

গোপালের মুখের উপর চমক এসে যেত। চোখ দপ্‌ করে জ্বলে উঠত, আর রক্‌খী একেবারে ফণা তুলে ধরত।

'কেন রে, তুই কী বুঝেছিস রে ? খবরদার, যে মিঠি-মিঠি চোখে

তাকিয়েছিস ঐ চোখ গেলে দেব বলছি।' সে আর কিছু না বলেও দৌড়ে পালিয়ে যেত।

খুদা নারী আর পুরুষের মাঝে কী অদ্ভুত তুফান লাগিয়ে দিয়েছেন! এক ঢোঁক অমৃত তো এক ঢোঁক বিষ। কখনো ক্রোধে প্রেম, কখনো প্রেমে ক্রোধ, আর দুয়ে মিলে এক স্বাদ। দুয়ের মধ্যে দুঃখ।

'গোপী রে— আমি এখানে নাইছি, তুই অন্য দিকে মুখ করে বোস্। আর যে এদিকে দেখে গুরুর দিব্যি তার চোখ গেলে দে…'

কিন্তু যদি গোপাল ইমানদারীর সঙ্গে মুখ একেবারেই না ফেরায়, বরং উঠে গিয়ে পাথরের আড়ালে চলে যায়, তাহলে রক্‌খী খারাপ মনে করে।

আর যদি রক্‌খীর চীৎকার শুনে সে তাকে বাঁচানোর জন্যে জলে লাফ দিয়ে পড়ে তা হলে ঝোপের কাঁটা হয়ে যায়। তার সারা মুখ খিম্‌চে দেয়। খুব গালি দেয়। তার চুল ধরে ঝুলে পড়ে। বেচারা নিজেই ডুবতে ডুবতে বেঁচে যায়।

'তাতে তোর কী? আমাকে ডুবতে দে! শুয়ার, আমি তোর কে?' গোপালের আপত্তিতে সে উল্টে বিদ্রূপ করতে থাকে, কিন্তু যখন সে রেগে চলে যায় তখন রক্‌খী নরম হয়ে যায়।

'চল জন্ম-পোড়া। এখন তো তুই আমাকে দেখেই ফেলেছিস আর তোর কাপড়ও ভিজে গিয়েছে। ওদিকে পাথরের উপর শুকোবার জন্য ছড়িয়ে দে আর তুইও চান করে নে। তোর গা থেকে বড় পচা গন্ধ আসছে। কিন্তু খবরদার এদিকে আসবি না। ধারের দিকে নাইবি, হাঁ।'

কিন্তু অপরদিকে কে থাকে— আর কোনো কোনো দূরত্ব বড় বিপজ্জনক হয়। বেশি নৈকট্যে বেপর্দার বিপদও কম হয়ে যায়। শবরাতী জলের বাইরে কিছুটা দূরে ছিল। সে দেখেছিল আর খুব হৈ-চৈ হয়েছিল। রক্‌খীর বাবা গিয়ে নালিশ ঠুকে দিল…

খুব গোলমাল হ'ল। যদিও গোপাল কেবল নিজের চুলের ঝুঁটিতে আটকে-থাকা রক্‌খীর নথ ছাড়িয়ে নিচ্ছিল কিন্তু শবরাতী যে হৈ-চৈ

লাগিয়েছিল তাতে রক্‌খীর নাক কাটতে-কাটতে বেঁচে গিয়েছিল। সারা গাঁয়ে হুল্লোড় লেগে গিয়েছিল। রক্‌খীর মাতাল বাপ তাকে চার চড় লাগিয়ে দিয়েছিল। চুল ধরে সারা আঙিনায় ঘষড়েছিল। তারপর কিছু খেতে না দিয়ে কুঠরিতে বন্ধ করে দিয়েছিল।

গোপাল সিংহের এমনি সংঘটন হল যে তার প্রবল জ্বর এসে গেল। পরদিন থেকে যদি টাইফয়েডে তার প্রাণসংশয় না হত তা হলে ভান সিংহ গঁড়াসা দিয়ে তার গলা কেটে ফেলত।

দুমাস ধরে সে মৃত্যুর সঙ্গে লড়েছিল। যেদিন জোগীন্দরের সঙ্গে রক্‌খীর বিয়ে হল সেদিন বৈদ্যজী গোপালের প্রাণের আশা নেই বলে জবাব দিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক দিন পর যখন সে ধীরে-ধীরে হেঁটে রোদে গিয়ে বসবার সামর্থ্য লাভ করেছিল তখন লোকে তালাও-এর ঘটনা ভুলে গিয়েছিল। গাঁয়ের ইতিহাসে এ ঘটনা এমন কিছু বে-নজীর আর ভয়ানক ছিল না।

'অসুখ থেকে ভাল হয়ে যাবার পর তুমি রক্‌খীর বিয়ের ব্যাপারে আফসোস করেছিলে?' উকিল সাহেব শুধালেন। গোপাল চিন্তায় পড়ে গেল। অসুখ থেকে উঠে তো অনেকদিন পর্যন্ত খাবার জন্যে লালায়িত ছিল। বৈদ্যজী বলেছিলেন কেবল পাতলা ডাল দাও, আর গোপালের প্রাণ চাইছিল যে সারা দুনিয়াকে গিলে ফেলে। তারপর কিছুটা সবল হবার পর সে কাজে বেরিয়েছিল। রক্‌খী সাজ-শৃঙ্গার করে সখীদের সঙ্গে ঠাট্টা করছিল, গয়নায় চমক তুলে ঘুরছিল। দেখে সে রেগে গেল— 'মেয়েছেলের জাত নীচু হয়।'—

এ কথা ভেবে তার কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। 'গয়না কাপড় দিয়ে দাও আর সেবাদাসী বানিয়ে নাও—'

'মেরে তো গিরধর গোপাল দূসরা ন কোঈ।'

ঐ মেয়েরা জোরে জোরে গাইছিল— 'হায় গোপিয়ে তেরে বিনা কৈসে জীউঙ্গী'-- আর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জীবনকে জ্বালিয়ে জেগে রইল।

'যা, যা, তুই কোথা থেকে গিরিধারী হয়ে বসেছিস ! মূর্খ, তুই তো একেবারে গোপাল— আরে ভাই, তুই ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই…'

সে (রক্‌খী) একদিন ক্ষুদ চাইতে এসে গোপালকে খোঁচা দিয়েছিল। কে জানে কেন গোপালের চোখ ছলছল করে এসেছিল। সে ঠাট্টার ছলে হাসতে শুরু করেছিল।

'হায়, আমি তো মরে গেছি। হায়, পুরুষমানুষ কখনো কাঁদে ? পুরুষ তো কাঁদায়…'

'জোগীন্দর তোকে প্রাণ ভরে কাঁদাবে', সে শাসিয়েছিল।

'কাঁদাবে তো কাঁদব, হাসাবে তো হাসব, সে তো আমার স্বামী।'

গোপালের প্রাণ চাইছিল যে রক্‌খীর মুখের উপর এমন জোরে থাপ্পড় মারে যে তার ছোট-ছোট সাদা দাঁত চালের মতো ছড়িয়ে যায়, কিন্তু মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলতে সে শেখে নি। সে উঠে চলে যাচ্ছিল ; তখন রক্‌খী লজ্জায় পড়ল।

'আরে গোপালজী নারাজ হয়ে গেল ? না জী। রাগ কোরো না', সে তার পায়ে পড়ে গেল— 'হায় জী, তুমি সত্যি সত্যি মান করলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। আরে, আমার বেণী পাক্‌ড়িয়ে তুই থাপ্পড় মারো কিন্তু রাগ কোরো না গোপিয়া ··তুই তো আমার সব…' সে ভরা কণ্ঠে বলেছিল— 'বিয়ে হওয়া তো আলাদা কথা, ইয়ার… তোর-আমার সম্পর্ক তো জন্ম ধরে… তুই আমার গিরিধারী গোপাল না তো আর কে ? দেখ গোপিয়া, যদি কোনোদিন কোনো বিপদে পড়ি তো আমি তোকেই ডাকব। তখন তুই আমাকে রক্ষা করার জন্যে তোর আপন চক্র ঘোরাতে আসবি। আসবি না ? কথা দে।'

গোপাল তাকে ঠেলে দিয়ে উপরের কুঠরিতে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। সে রক্‌খীকে কোনো কথা দেয় নি। কিন্তু কথা দেওয়া না-দেওয়া কি তার আয়ত্তের মধ্যে ছিল ?

সে যখনি আসত আপন পতির গুণগান করত— 'হায় রাম… সে আমাকে কত যে ভালবাসে তা কী বলব', দুই চোখের তারা নাচিয়ে

সে বলত আর তখন গোপালের নাক ফুলে উঠত দেখে খুব হাসত।

'আরে গোপাল, তুই আমার পোষাক দেখে জ্বলে যাচ্ছিস', সে খোঁচা দিত।

'আরে তোকে যখন জুতো মারে তখন··· ?'

'হাঁ মারে কিন্তু কেমন আদরও করে', সে নষ্ট মেয়েছেলের মতো চোখ টিপে বলত— 'সব পতি নিজ নিজ পত্নীদের ধরে মারে। তোর বিয়ে হলে তুই কি ছেড়ে দিতিস ? তুইও মারতিস।···'

'আমি মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলি না।'

'সত্যি কখনো ভালবাসাতেও মারিস না ?'

কিন্তু রক্‌খীর এই হাসি অল্প কিছুদিনেরই ছিল। বছর ঘুরে যাবার আগেই জোগীন্দর কোনো কোনো দিন ঘর থেকে অন্তর্ধান করত। নেশায় চুর হয়ে এসে এমন খারাপভাবে তাকে মারত যে সারা মোহল্লা জেগে উঠত। চারতরফে গালি পড়ত, তারপর সবাই চুপ করে যেত। তৃতীয়-চতুর্থ দিন আবার ঐ একই তামাশা হ'ত। তারপর এই রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। এদিকে আধেক রাত পেরিয়েছে আর ওদিকে রক্‌খীর চীৎকার শোনা যেত। মোহল্লার লোকেরাও কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে গেল। খুব গোলমাল হলে কিছুটা চমকাত। কিন্তু গোপালের কানে রক্‌খীর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তপ্ত শলাকার মতো ঢুকে যেত। রক্‌খীর গয়নাগাঁটি আস্তে-আস্তে তার গা থেকে অন্তর্হিত হতে থাকল— জোগীন্দর সপ্তাহের পর সপ্তাহ অন্তর্ধান করতে লাগল। তার চাকরিও কিছু বদলে গিয়েছিল। রক্‌খী খুব অসুখে পড়েছিল। গর্ভপাত হবার পর মেয়েছেলের যে-সব বিপদ ঘটে তা এসে গিয়েছিল। সে এখন ঘর থেকে বেরোনোই কমিয়ে দিয়েছিল।

যখন কোনো পতি তার পত্নীকে মারে বা তার অনাদার করে তখন লোকে স্ত্রীকেই দোষী বলে ভাবে। রক্‌খীরও অনেক দোষ আবিষ্কৃত হল। লোকে মুখের উপর শুনিয়ে দিত। একদিন সে পুকুর থেকে জল ভরে নিয়ে ফিরছিল এমন সময় গোপালের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল। তার (রক্‌খীর) পরনের কাপড় ছিল ময়লা আর ছেঁড়া।

সে যখন বালতি তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, তার পা ঠিকমত পড়ছিল না। গোপালের খুন চড়ে গেল। সে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'গোপী', বড় অহংকারের সঙ্গে সে বলেছিল— 'আমার পথ থেকে সরে যা।' তার বুকে দম ভরে উঠেছিল কিন্তু সে বাল্‌তি ছাড়ে নি।

'কাল রাতে তোর পতির আদরের বড় জোরদার আওয়াজ আসছিল…' গোপাল বিদ্রূপ করল।

'তাতে তোর কী রে ·· তুই কে?'

'রক্‌খী, আমি তোর কেউ নই?'

'না', রক্‌খী উদ্গত অশ্রু লুকোবার চেষ্টায় ঘাড় ঘুরিয়ে নিল।

'না গিরিধারী, না গোপাল… ?'

'গোপিয়া, আমায় যেতে দাও…'

'আমার কাছে লুকোচ্ছ?'

'বলে কী লাভ? ওর তুমি কী করতে পার?'

'আমি ঐ হারামীর গলা টিপে দিতে পারি…'

'হায় মা! তুই আমাকে বিধবা করে দিবি?'

'হাঁ, তা হলে তোর আর্তনাদ আমায় আর শুনতে হবে না।'

'তুই তোর কানে তুলো গুঁজে দে…'

'আমি ওর গলায় কৃপাণ ঢুকিয়ে দেব,' গোপাল রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল।

'হায় রাম, আচ্ছা, এখন থেকে আমি আর আর্তনাদ করব না! আমি তালা লাগিয়ে নেব…'

'তবুও আমি তোর আর্তনাদ শুনতে পাব—'

'আমি ডাকি না ডাকি গোপালের চক্র নিয়ে আসতেই হবে?' সে পাথরের উপর বসে পড়ে হাসতে থাকে। তারপর বিষণ্ণ হয়ে যায়। 'ও বেচারী কী করে? সে বেশ্যাটা নির্দয়। বিরক্ত হয়ে গেলে তো ওকে বার করে দিয়ে দরজায় শিকল লাগিয়ে দিত। তারপর পুরুষ মানুষ আপন ক্রোধ কার উপর ঝাড়বে… ?'

'ফের যদি সে তোকে মারে আমি ওকে শেষ করে দেব।'

সে সক্রোধে উঠে চলে যেতে চাইলে রক্‌খী তার পায়ে হাত দেয়। তার শরীরের সব শক্তি নেমে গিয়ে জল হয়ে যায়।

'গোপী।' সে মৃদুকণ্ঠে বলে, গোপালের হৃদয় ধক্‌ধক্ করে ওঠে।

'কী হয়েছে?' সে বিরক্ত হয়ে বলে।

'তোর রূপ দেখে প্রাণ ভরে না', (রক্‌খী) ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকে দেখে বলে।

'আমাকে যেতে দাও রক্‌খী,' গোপাল মিনতি করে।

'আর এখন তুই পালিয়ে কোথায় যাবি গোপিয়া?' সে পা ছেড়ে দেয়, হাত নিজের শূন্য কোলে রাখে— যে কোল কিছুদিন আগে আগুনে ভরে গিয়েছিল। 'তোর-আমার সম্পর্ক হাত-পায়ের সম্পর্ক নয় যে ভেঙে যাবে, তোর মন থেকে চলে যাস্ তো আমার মন থেকে কোথায় পালাবি?'

গোপাল সিংহ সামনে ঝুঁকে এদিক-ওদিক মাথা ঝাঁকায় যেন সে কোনো সংকীর্ণ গর্তের মধ্যে আটকে গেছে।

'মুন্সীজী! যদি কান চুলকানো থেকে ফুর্সৎ হয়ে থাকে তো পেশ-করা মামলার ফাইল এদিকে সরিয়ে দিন।' উকিল সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'সরদারজী, আপনার ছেলে আমার কথায় কান না দিতে বদ্ধপরিকর। কোনো সংশয় নেই যে রক্‌খী একে ফাঁসিয়ে রেখেছিল।'

'না, উকিল সাহেব, না,' গোপাল শ্রান্ত হয়ে গেছিল।

'আরে ভাই, কত মরদ মদ খায় আর আপন আপন বউকে মারে, কিন্তু কারুর তো ঘুম নষ্ট হয় না…'

'কিন্তু ওর আর্তনাদ আমাকে পাগল করে দিত, উকিল সাহেব, তবেই না আমি কসম খেয়েছিলাম যে আমি জোগীন্দরকে খতম করে দেব… কিন্তু প্রমাণ হল আমি বড় ভীতু,' গোপাল সিংহ দুহাতে নিজের মাথা ধরেছিল।

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ কালো কুৎসিত রাতগুলিকে তচনচ করে দিত। লোকে সারাদিন মেহনত করে শ্রান্ত হয়ে নেশায় চুর বেহুঁশ হয়ে পড়ত। কিন্তু এক দুর্ভাগা জেগে থাকত।

সে দরজার শিকল খটখট করেছিল। দরজা খুলেছিল আর সে দেখেছিল রক্‌খী জোগীন্দরের চারপাইয়ের চারদিকে দৌড়াচ্ছে। রক্‌খীর শরীরে এক গাছি তারও ছিল না। তার চন্দনের মতো শরীর নীল হয়ে গিয়েছিল— যেন সাপে ফণা তুলে ধরেছে। গোপালকে দেখে জোগীন্দর চোখ মিট্‌মিট্‌ করতে লাগল।

'তুমি কে ভাই ?' সে খুব আদরের সঙ্গে বলেছিল।

'একে মেরো না', গোপাল ওকালতি করল।

'কেন?' এ কথা সে অপছন্দ করেছিল— 'তুই কে রে ? এর ইয়ার ?'

'না।'

'আরে তুই এর ইয়ার নোস ? কেন ? ভাই, তুই এর ইয়ার নোস কেন ? আমিও এর ইয়ার নই। এর গা থেকে মুতের গন্ধ আসছে। একটুও 'খুশ্‌বু' নয়। একটু শুঁকে দেখ। আরে, আমি বলছি, শুঁকে দেখ।'

'জোগীন্দর তুমি নেশার ঘোরে আছ—'

'আচ্ছা, একে চুমু খা··· বিল্‌কুল পচা গন্ধ আসছে। আরে তুই আমার ভাই। তুই একে চুমু খা। আমি যা বলছি···'

'বাজে কথা বন্ধ করো,' গোপালের খুন চড়ে গেল। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে জোগীন্দরের গলাবন্ধ ধরে ফেলে ঝট্‌কা দিয়েছিল। কিন্তু সে এক ইঞ্চিও নড়ে নি। পাথরের চটানের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে হাসছিল আর গোপাল মাছির মতো ভন্‌ভন্‌ করছিল। তারপর জোগীন্দর আস্তে করে মাছিকে দূরে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। ফের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ উঠেছিল আর গোপালের মাথায় হাতুড়ির পর হাতুড়ি পড়ছিল।

এই সময়ে গোপালের জন্যে ইন্দোর থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। সে তার পিতার সঙ্গে নিজের পাত্রী দেখতে গিয়েছিল। সেখানে

নির্মলের মুচ্‌কি হাসি ছিল আর রক্‌খীর আর্তনাদ ছিল না। আশীর্বাদের পর সে যখন ফিরে এল সবাই তাকে অভিনন্দন জানাতে এল। রক্‌খী তো ঐ দিনগুলিতে নেচে বেড়াচ্ছিল।

তাকে খুশি দেখে গোপালও খুশি হয়েছিল।

'কেমন লাগল?' সবাই যখন এদিকে ওদিকে চলে গেল তখন রক্‌খী গোপালকে শুধিয়েছিল।

'ভালো লাগল।'

'নির্মলরানীর ভাগ্য— মোটা তো নয়?'

'না, ঠিক আছে।'

'লম্বা না বেঁটে?'

'আমার চিবুক পর্যন্ত হবে।'

'এ হে! হাত-পা? ফর্সা-ফর্সা? ছোট-ছোট?'

'খুব ফর্সা নয়…হাঁ ছোট-ছোট তো হবে।'

'আর কোমর? কোমর তো সরু হবে?'

'আমি এখন কী করে বলি? কোমর সরু না মোটা…আমি কি মেপে দেখেছি…'

'আরে ভোলানাথ…কোমরেরই ত সারা খেলা…এবার যখন যাবি সারা শরীর মেপে নিবি, হাঁ…'

'তুই তোর পতিকে মেপেছিলি…?

'এটা কি এই সময়ের কথা?' সে বিগড়ে গিয়েছিল—'তুই নিজেরটা বল… তোকে পছন্দ করেছে?'

গোপাল মাথা নেড়ে মুচকি হাসল।

'হাঁ, মজা হয়েছে মনে হয়। আমার পতি যখন আদর করে তখন সারা প্রাণ ঠোঁটের উপর এসে যায়…'

'আর যখন আদর করে না?' গোপাল খোঁচা দিল।

'যেতে দে ও-কথা। আমি জন্ম-দুঃখিনী…' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

'গোপালসিংহ, রক্খা কোর্টে এ কথা বলতে রাজি আছে যে তোমার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল—' উকিল সাহেব ফের বললেন।

'হতচ্ছাড়ী শূয়ারের বাচ্চী,' গোপাল রেগে উঠল— 'মিথ্যুক হারামজাদী,' সে ঐ সময় রক্খীকে গালি দিতে থাকল যে তার আপন রক্খীর গায়ে এত বড় পাপের ছাপ লাগিয়েছে।

ঐ আর্তনাদ আগের চেয়ে আরো ভয়ানক হয়ে উঠেছিল। রাতের নিস্তব্ধতাকে চিরে দিয়ে পেত্নীর মতো তা জেগে উঠত আবার ফোঁপানিতে ডুবে যেত, আবার জেগে উঠত। গোপালের ঘুমোতেও ভয় হত। সে যখনি চোখ বন্ধ করত আর্তনাদ জেগে উঠত, ফের ঘুম ভেঙে যেত। কখনো-কখনো সে ভোর পর্যন্ত আর্তনাদের প্রতীক্ষায় জেগে থাকত। না আসত আর্তনাদ না আসত ঘুম।

ঐ রাতে সে খুব ধীরে-সুস্থে গঁড়াসা মাচা থেকে নামিয়ে পুলের পাথরের উপর ঘিস্-ঘিস্ করে ঘষে ধার তুলেছিল।

অর্ধেকের বেশী রাত কেটে গেছে, কিন্তু আর্তনাদ শোনা যায় নি। বোধহয় জোগীন্দরের বেশ্যা দয়া করেছিল। গোপালসিংহের ঢুল এসেছিল, সে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

যখন প্রথম আর্তনাদ তার কানে পৌঁছল তখন সে ভেবেছিল তার ভ্রম হয়েছে। কোনো চলে-যাওয়া পুরানো আর্তনাদের অনুগুঞ্জন। কিন্তু বিরতিহীন আধঘণ্টা ধরে রক্খীর আর্তনাদ গোপালের মাথা করাতের মতো চিরে দিচ্ছিল। হায়, ঐ গঁড়াসা দিয়ে সে নিজের মাথাই কাটতে পারত। তা হলে তো আর্তনাদ থেকে রেহাই পাওয়া যেত!

তারপর কী হল কিছু মনে নেই। কেবল এ কথাই তার মনে আছে যে জোগীন্দর রক্খীর চুল ধরে পুরনো ফাটা কাপড়ের মধ্যে ঝাঁকাচ্ছিল। রক্ষীর শরীরের উপর চামড়া ফেটে ফেটে তৈরি খাল ছাড়া আর কিছু ছিল না। যা ফেটে গিয়ে ঘন রক্ত বুকের উঁচু-নীচু গভীরতা থেকে বয়ে গিয়ে হাঁটু পর্যন্ত গড়িয়ে পড়ছিল। —আর যেখানে আগে

নিখুঁত চেহারা ছিল সেখানে মাংসের লাল লাল ঢ্যাবলা দেখা যাচ্ছিল। জোগীন্দর খাটের পায়ায় তার মাথাটা ঠুকে দিচ্ছিল।

রক্‌খীর ডান হাতের হাড় ভেঙে গিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল। যখনি আশ্রয়ের জন্য সে মাটি ধরতে যাচ্ছিল তখনি তার ঝুলে-পড়া হাত পিছন দিকে মুড়ে যাচ্ছিল আর কাঁচা মাটির মেঝেতে হাড় ঢুকে যাচ্ছিল।

ঐ কাঁচা মাটির মেঝে ছিল গোপালের ধক-ধক করে ওঠা বুকের ছাতি।

তার চোখের মণি এই শেষ ছবি সাপটে নিল। ফাঁসির পরে চিতাও ঐ প্রতিচ্ছবি ভস্ম করতে পারবে না।

তার হাতের দশ আঙুল অসংখ্য গঁড়াসা (ধারালো অস্ত্র) হয়ে গেল। জোগীন্দরের মুণ্ডুটা ছিল গণ্ডারের। তা গর্দান থেকে পাকা পেয়ারার মতো টপ্ করে চারপাইয়ের নীচে গড়িয়ে গেল। লাথি মেরে গোপাল ঐ মুণ্ডুটাকে বাইরে ফেলে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।

গোপালের নিশ্বাস তার পাঁজরের মধ্যে আটকে গিয়েছিল। দুধ-ছলকে-পড়া বাটিতে কালো কালো ফিতে নড়াচড়া করছিল। সোনালি তারের ফুলগুলি নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল।

'আমি জোগীন্দরকে খুন করেছি···আর জন্ম জন্ম তাকে খুন করতে থাকব···'

উকিল সাহেবের চোখদুটি বড় বড় হয়ে নীচে ঝুঁকে পড়ল।

বুড়ো সরদারজীর বয়সের বিশটা বছর শুকনো পাতার মত ঝরে গেল। বুকের ছাতি চওড়া হয়ে গেল।

'উকিল সাহেব,' বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে বিশ্বাস ধ্বনিত হচ্ছিল— 'আমার ছেলে গোড়ায় যে বয়ান দিয়েছে তাকে বদ্‌লাবার কোনো প্রয়োজন নেই···'

চতুর্থীর জোড়া

সেহদরীর[1] চৌকির উপর আজ সাফ-সুতরো চাদর বিছানো হয়েছে। ভাঙা খাপরার ছেঁদা দিয়ে রোদের তেরছা-আড়া কিরণ পুরো দালানে ছড়িয়ে পড়েছে। মোহল্লা-টোলার বউ-ঝিরা নির্বাক আর সংকুচিত হয়ে বসে আছে, যেন একটা বড় ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। মায়েরা বাচ্চাদের বুকে জড়িয়ে নিয়েছে। কখনো-কখনো কোনো বড্ড দুব্‌লা-পাত্‌লা চিড়বিড়ে বাচ্চা খাবার কম হওয়ার দোহাই দিয়ে রেগে উঠছে।

'না··· না মেরে লাল।'

দুর্বল ক্ষীণদেহা মা তাকে হাঁটুর উপর শুইয়ে এমনভাবে দোলাচ্ছে যেন কুলো ধানের সঙ্গে মেশানো চাল আলাদা করছে। বাচ্চারা এক এক হুংকারে চুপ হয়ে যাচ্ছে।

আজ কত আশা-ভরা দৃষ্টি কুব্রার মায়ের চিন্তায় ডুবে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সরু বহরের জালি-কাপড় দুই ভাঁজে জুড়ে নেওয়া হয়েছে কিন্তু এখনো শাদা গজীর নিশান মাপ[2] করে নেবার সাহস কারুর নেই। কাট-ছাঁটের ব্যাপারে কুব্রার মায়ের স্থান ছিল অনেক উঁচুতে। কে জানে তার শুকনো-শুকনো হাত কত পোষাক তৈরি করেছিল। কত ষষ্ঠীর কাপড় তৈরি করেছিল আর কত কফন[3] মেপে কেটে দিয়েছিল। মোহল্লায় যেখানেই যে-কোনো কাজে কাপড় কম পড়ে যেত আর লাখ যত্নেও মাপ ঠিকমত বসত না, কুব্রার মায়ের কাছে কেস্ নিয়ে আসত। কুব্রার মা কান[4] বার করে নিত, কলফ কাটত, কখনো ত্রিকোণ বানাত, কখনো চৌকোণ করত আর মনে মনেই কাঁচি চালিয়ে চোখে চোখে মাপ করে নিয়ে মুচকি হাসি হাসত।

"বাহুর মাপের কাপড় আর ঘের তো বেরিয়ে আসবে। গলার মাপের জন্যে ছাঁট কাপড় আমার বোঁচকা থেকে নিয়ে নাও"—

আর মুশকিল-আসান হয়ে যেত। কাপড় কেটে ঐ ছাঁট-কাপড়ের স্তূপ বানিয়ে দিয়ে দিত। কিন্তু আজ তো শাদা-গজীর টুকরো খুবই ছোট ছিল আর সকলের বিশ্বাস ছিল যে আজ তো কুব্রার মা মাপজোখের হিসাবে হেরে যাবে— এ কথা ভেবে সকলেই রুদ্ধশ্বাসে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। কুব্রার মার ধৈর্য-ভরা মুখের উপর চিন্তার কোনো চিহ্ন ছিল না। চার গিরে গজীর টুকরোকে সে নজরেই মেপে নিয়ে কাটছিল। লাল রেশমের জালির ছায়া তার হাল্‌কা নীলচে বিবর্ণ মুখের উপর উষার মতো ফুটে উঠেছিল আর গভীর বিষাদের রেখা আঁধারের গুহার মতো খুব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল— ঐ ঘন জঙ্গলে আগুন ঝলকে উঠেছিল আর সে মুচকি হেসে কাঁচি হাতে তুলে নিয়েছিল।

মোহল্লার মেয়েদের ভীড়ের থেকে নিশ্চিন্ততার এক দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। কোলের বাচ্চাদের তারা থামিয়ে দিয়েছিল। চিলের মতো খরদৃষ্টি কুমারী মেয়েরা তাড়াতাড়ি ছুঁচের ফুটোয় সূতো ঢুকিয়ে দিয়েছিল। নববিবাহিতা বউরা নিজ নিজ আঙুলে ছল্লা (আঙুল-টুপি) পরে নিয়েছিল। কুব্রার মায়ের কাঁচি চলতে শুরু করেছিল। সেহদরীর শেষ কোনায় ছোট পালংকের উপর হামীদা পা গুটিয়ে হাতের চেটোয় চিবুক রেখে কিছু ভাবছিল।

দুপুরের খানা শেষ করে বী আম্মা সেহদরীর চৌকিতে গিয়ে বসেছিলেন আর বোঁচকা খুলে রঙ-বেরঙের কাপড়ের জাল বিছিয়ে দিয়েছিলেন। নালির ধারে বসে বাসন মাজতে মাজতে কুব্রা আড় চোখে ঐ-সব লাল-লাল কাপড় দেখছিল আর এক গাঢ় লালরঙ ঝপ করে তার বিবর্ণ মেটে রঙের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। মা যখন রুপোলি বাক্স থেকে জাল পুরো খুলে আপন উরুর উপর ছড়িয়ে দিয়েছিল তখন তার মলিন মুখের উপর আজব আধ-ভরা আলো চকমকিয়ে উঠছিল। গভীর খাদের মতো কুঞ্চিত রেখার উপর বাক্সের ছায়ার ছোট ছোট মশালের মতো আলো ঝলমল করে উঠছিল। প্রত্যেক ফোঁড়ে জরির কাজ নড়ে উঠত আর যেন মশালের আলো

কেঁপে কেঁপে উঠত।

মনে নেই ঐ কোমল চকমকে দুপাট্টার আগে আরো কত দুপাট্টা সেলাই করে বানানো হয়েছিল আর কাঠের ভারী সিন্দুকে তাদের কবর দেওয়া হয়েছিল— সিন্দুকের তলায় তারা ডুবে গিয়েছিল। বাক্সের জাল ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। গঙ্গা-যমুনার পাড় জ্বলে গিয়েছিল। যখন এক জোড়া পুরানো হয়ে যেত তখন তাকে চালের জোড়া বলে সযত্নে রেখে দেওয়া হত। ফের এক নতুন জোড়ার সঙ্গে এক নতুন আশার সূত্রপাত হয়ে যেত। নতুন করে খোঁজখবর নেওয়ার সঙ্গে নতুন নক্‌শা ছাঁটকাট করা হত। সেহদরীর চৌকির উপর সাফ-সুতরো চাদর বিছানো হত। মোহল্লার মেয়েরা মুখে পান আর বগলে বাচ্চা নিয়ে কাঁকন বাজাতে বাজাতে এসে পৌঁছত।

'ছোট কাপড়ের ধাঁচা তো বেরিয়ে আসবে কিন্তু ধারের কাপড় বেরোবে না।'

'নাও তো পিসি, আর শোনো কী করে খোঁড়া মেরে জালির রিফুকাজ সেরে দেওয়া যায়··· ?'

আর সকলের মুখের ভাব চিন্তিত দেখাত। কুব্রার মা শেষকালে চোখ দিয়েই ফিতের কাপড়ের লম্বাই-চৌড়াই মেপে নিত। আর বিবিরা নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট কাপড়ের বিষয়ে ফুসুর-ফাসুর করে ঠা-ঠা করে হাসত। এমনিই কোনো চঞ্চল মেয়ে বিয়ের গানের ধুয়া ছেড়ে দিত। আর কোনো চতুরা মেয়ে আরো এগিয়ে ভাবী কাল্পনিক বেয়াইকে গালি দিতে থাকে। বেহায়া নোংরা ঠাট্টা আর শয়তানি শুরু হয়ে যায়। এই-সব অবকাশে কুমারী মেয়েদের সেহদরীর থেকে দূরে মাথা ঢেকে বসবার হুকুম দেওয়া হত আর যখন কোনো নতুন উচ্চ হাসি সেহদরী থেকে উছলে পড়ত তখন ঐ বেচারীরা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বসে থাকত। "আল্লাহ্, এই ঠা-ঠা করে হাসবার অবকাশ ওদের ভাগ্যে কবে হবে ?"

ঐ শয়তানিভরা ঠাট্টা থেকে দূরে থেকে কুব্রা লজ্জায় মশা-ভর্তি কুঠরিতে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকত। এই সময়ে মাপ-কাটছাঁট বড়

সংকটমুহূর্তে পৌঁছে যেত। কেউ কেউ কব্‌জি উল্‌টে কাপড় কেটে যেত আর তার সঙ্গে বিবিদের মতামতও কাটা পড়ত। কুব্রা সংকুচিত হয়ে দরজার আড়ালে ঝুঁকে পড়ত।

মুশকিল ছিল এই যে কখনো কখনো জোড়া দৈবদুর্বিপাকে ভাল করে সেলাই হত না। যে কব্‌জি উল্‌টে যেত সে জেনে নিত যে নতুন আনা বিয়ের সম্বন্ধের কথায় নিশ্চয় কোনো বাধা পড়বে। হয় বরের কোনো রক্ষিতা আছে জানা যাবে, নয় তার মা ভরাট লোহার কড়ার[৫] আগল বাঁধবে ; গোটে কাজ হয়ে যাবে কিম্বা কন্যাপণ সম্পর্কে কথা ভেঙে যাবে কিম্বা ভর্‌তের পায়ার[৬] পালংকে ঝগড়া হবে। চতুর্থীর মুহূর্ত বড়ো দুর্বল মুহূর্ত। বী আম্মার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা আর তার সাজানো শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন থেকে যেত। কে জানে ঠিক সময়ে কী হয়ে গিয়ে তুচ্ছ কথা শেষ হয়ে যেত। বিস্‌মিল্লাহ্‌র[৭] দিন থেকে ভালো যা যৌতুকের জিনিস জোগাড় করতে শুরু করে দিত। একটুখানি ছাঁট কাপড় যদি বাঁচত তো তিলদানী অথবা আতরের শিশি মুড়ে মুড়ে ধনুক[৮] গোখরু থেকে সযত্নে আলাদা করে রেখে দিত। মেয়েদের আর কী, শশা-কাঁকুড়ের মতো বাড়তে থাকে। যখন বরযাত্রা আসবে তখন তো এই জিনিসটা কাজে লাগবে।

আর যখন বাবা মারা গেলেন এই গুণ আর ঢঙ শেষ হয়ে গেল। হামীদার তো একবারে নিজের বাবার কথা মনে পড়ে যায়। তিনি কত রোগাটে ছিলেন। লম্বা যেন মোহ্‌ররমের ঝাণ্ডা। ঝুঁকে পড়লে সোজা হয়ে দাঁড়ানো মুশকিল হত। ভোর থাকতে উঠে নিমের দাঁতন ভেঙে নিতেন আর হামীদাকে হাঁটুর উপর বসিয়ে কে জানে কী ভাবতেন। ভাবতে ভাবতে নিজেরদাঁতনের কোনো কুচি গলায় চলে যেত আর তিনি কাশতে শুরু করতেন। হামীদা বিগড়ে গিয়ে তার কোল থেকে নেমে পড়ত। কাশির ধাক্কায় এইরকম হলে পড়া তার একেবারে অপছন্দ ছিল। তার রাগ দেখে তিনি আরো হাসতেন আর কাশি বুকের ভেতর থেকে কেবলই উঠে আসত যেন গলা-কাটা কবুতর ধড়ফড় করছে। তারপর বী আম্মা এসে

তাঁকে সাহায্য করতেন। পিঠে ধপ্‌-ধপ্‌ করে মারতেন।

'তোবা··· তোবা, এমনভাবে কেন হাসছ?'

অচ্ছার হাতের চাপে লাল লাল চোখ তুলে বাবা উদাসীন হয়ে মুচকি হাসতেন। কাশি তো থেমে যেত কিন্তু উনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাঁফাতেন।

'কিছু ওষুধপত্র খাচ্ছ না কেন, কতবার তোমায় বলেছি ···'

'বড় হাসপাতালের ডাক্তার বলে সুঁই লাগাও। রোজ তিন পোয়া দুধ আর আধ ছটাক মাখন খাও···'

'মুখে ছাই পড়ে ঐ ডাক্তারের। কেবল এক তো কাশি, ওপর থেকে চেক্‌নাই। কফ হতে দেবে না। কোনো হাকিমকে দেখাও···'

'দেখাব।'

বাবা হুঁকা টানতে থাকেন, অচ্ছা ফের বলে—

'আগুন লাগুক হুঁকোর মুখে। ঐটাই তো এই কাশি লাগিয়েছে। জোয়ান মেয়ের দিকেও চোখ তুলে দেখে···'

আর এখন বাবা কুব্রার যৌবনের দিকে করুণাভিক্ষাকামী দৃষ্টিতে তাকান। কুব্রা কি যুবতী ছিল? কে বলে যুবতী ছিল? সে তো বিসমিল্লাহ্‌র দিন থেকেই তার যুবতী হওয়ার কথা শুনে থমকে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কে জানে কী করে যৌবন এসেছিল— তার চোখের তারায় পরী নাচে নি, তার গালে অলকচূর্ণ নড়ে ওঠে নি, তার বুকে ঢেউ ওঠে নি। সে কখনো শ্রাবণ-ভাদ্রের কাজরী উৎসবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে প্রীতম বা সাজনকে চায় নি। ঝুঁকে-ঝুঁকে, সসংকোচে, কে জানে কবে হাঁটু গেড়ে গুঁড়ি মেরে যৌবন তার উপর এসে বসেছিল, আবার ঐভাবেই চুপচাপ কে জানে কোথায় চলে গেল। মিষ্টি যৌবন স্বাদু হয়েছিল তারপর তার স্বাদ চলে গিয়েছিল।

বাবা একদিন চৌকাঠের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন; তাঁকে সুস্থ করবার জন্য কোনো হাকিম বা ডাক্তারের ওষুধ এল না। হামীদা মিষ্টি রুটির জন্য জিদ করা ছেড়ে দিল আর কুব্রার পয়গাম[৩] কে জানে কোথায় রাস্তা ভুলে চলে গেল; কারুর এটা খেয়ালই ছিল

না যে ঐ আড়ালে পর্দার পিছনে কারুর যৌবন শেষবারের মতো ফুঁপিয়ে উঠছে আর অন্য এক নতুন যৌবন সাপের ফণার মতো জেগে উঠছে। কিন্তু বী আম্মার দস্তুরে ব্যাঘাত পড়ে নি। তিনি আগের মতোই রোজ দুপুরে সেহদরীতে রঙ-বেরঙের কাপড় ছড়িয়ে পুতুল খেলা খেলতেন। তিনি কোথা-না-কোথা থেকে কুড়িয়ে-বুড়িয়ে পয়সা জমা করে শব্‌রাতের মাসে ক্রেপে দুপাট্টা সাড়ে সাত টাকায় কিনেই ফেললেন। কথাটা হল যে খরিদ করা ছাড়া উপায় ছিল না, সেজো মামুর টেলিগ্রাম এল যে তার বড় ছেলে রাহত পুলিশ-ট্রেনিঙের জন্য আসছে। বী আম্মা তো একেবারে বেশি রকম ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। যেন রাহত নয়, দরজার গোড়ায় বরযাত্রীদল এসে দাঁড়িয়েছে আর এখনো কনের সিঁথির অফশা[10] তৈরি হয়ে ওঠে নি। উদ্‌বেগে তার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। ঝট্‌ করে পাতানো-বোন বঁদোর মা-কে ডেকে পাঠালেন।

'বোন আমার, যদি তুমি এক্ষুনি না আসো তবে আমার মরা মুখ দেখো।'

তারপর দুজনের মধ্যে ফুসুর-ফাসুর হয়েছিল। মাঝখানে দুজনে এক নজরে কুব্রাকে দেখেছিলেন—সে দালানে বসে চাল ঝাড়ছিল। সে ঐ কানে কানে কথা ভালো মতোই বুঝত। ঐ সময় বী আম্মা কানের চার মাশা ওজনের লবঙ্গ-ফুলদুটি খুলে পাতানো বোনের জিম্মায় দিয়ে বলেছিলেন যেমন করে পার সন্ধের মধ্যে এক তোলা গোখরু, ছয় মাশা সলমা-চুমকি আর ঘেরের জন্য পোয়া গজ জালি কাপড় এনে দাও। বাইরের দিকের কামরা ঝাড়-পোঁছ করে ঠিক-ঠাক করা হয়েছিল। অল্পপরিমাণ চুন চেয়ে নিয়ে এসে কুব্রা নিজের হাতে কামরা চুনকাম করেছিল। কামরা তো সাফ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার হাতের চেটোর নুনছাল উঠে গিয়েছিল আর যখন সন্ধ্যা-বেলা মশলা বাটতে বসেছিল তখন সে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল।

সারারাত এপাশ-ওপাশ করেই কেটেছিল। এক কারণ তো হাতের চেটোর জ্বালা, দ্বিতীয় কারণ ভোরের গাড়িতে রাহত আসছে।

'আল্লাহ্··· আমার আল্লাহ্ মিঞা··· এবার যেন আমার বোনের ভাগ্য খুলে যায়··· আমার আল্লাহ্, আমি এক শ রকতাত[11] নফল[12] তোমার দরগায় পড়ব।' হামীদা ভোর থেকেই নামাজ পড়ে দোয়া প্রার্থনা করছিল।

সকালে যখন রাহত ভাই এল তখন কুব্রা গোড়া থেকেই মশাভর্তি কুঠুরিতে গিয়ে লুকিয়েছিল। যখন সিমাই-এর পায়েস আর পরোটার নাশ্তা (জলযোগ) করে রাহত বৈঠকখানায় চলে গেল তখন ধীরে ধীরে নববধূর মতো পা ফেলে কুব্রা কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে এঁটো বাসন তুলে নিল।

'রেখে দাও, আমি ধুয়ে দেব দিদি।' হামীদা শয়তানি করে বলেছিল।

'না···' সে লজ্জায় ঝুঁকে পড়েছিল।

হামীদা তাকে খোঁচা দিয়েছিল। বী আম্মা মুচকি হাসি হাসছিলেন আর ক্রেপের দুপাট্টার উপর আঁচলা সেলাই করছিলেন। যে পথে কানের 'লবঙ্গ' ফুল গিয়েছিল সেই পথে 'ফুল-পাতা' আর রুপোর পাঁয়জোড়ও চলে গেল আর কেবল দু হাতে দুই দুই চুড়ি রইল। মেজো মামু তার বৈধব্যের পর ওগুলি খুলতে দেন নি। নিজে রুক্ষ শুকনো খেয়ে পরের দিনগুলিতে রাহতের জন্যে তিনি পরোটা ভেজে দিতেন, কোফ্তা বানাতেন, সুগন্ধ পোলাও করতেন। নিজের জন্য জল থেকে শাকপাতা তুলে আনতেন আর ভাবী জামাইকে মাংসের মচ্ছা[13] খাওয়াতেন।

'দিনকাল খারাপ হয়ে গেছে বেটি', তিনি হামীদাকে মুখ ফোলাতে দেখে বললেন। আর সে ভাবল—

'আমরা না খেয়ে জামাইকে খাওয়াচ্ছি। দিদি খুব ভোরে উঠে জাদুর মেশিনের মতো কাজে লেগে যায়, বাসি-মুখে জল ঘেঁটে রাহতের জন্যে পরোটা ভাজে, দুধ ফোটায় যাতে ঘন সর পড়ে। ওর সামর্থ্যে ছিল না যে সে নিজের শরীরের চর্বি বার করে ঐ পরোটায় ভরে দেয়। আর কেনই বা ভরবে না? শেষ-পর্যন্ত সে তো ওরই

হবে। যা-কিছু উপার্জন করবে তারই হাতের চেটোয় রাখবে। যে গাছ ফল দেয় তার গোড়ায় কে না জল দেয়? তারপর যখন একদিন ফুল ফুটবে আর ফলে ভরা ডাল ঝুঁকে পড়বে তখন বিদ্রূপকারীদের মুখের উপর কেমন জুতো পড়বে।' আর এই চিন্তায় তার মলিন মুখের উপর অনুরাগ প্রকাশ পেত। কানে বেজে উঠত সানাইয়ের ধ্বনি, আর রাহত ভাইয়ের কামরা ঝাড়পোঁছ করত, সযত্নে তার জামা-কাপড় ভাঁজ করে রাখত, তার দুর্গন্ধ ইঁদুরের মতো ময়লা ধুতি বিশ্রী গন্ধযুক্ত বেনিয়ান আর নাক-পোঁছা রুমাল সাফ করত। তার তেলে চিপ্‌চিপে তাকিয়ার ওয়াড়ের উপর ছুঁচসূতো দিয়ে 'সুইট ড্রীম' লিখে দিত। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক খাপে খাপে বসছিল না। রাহত সকালবেলায় পরোটা ডিমভাজা খেয়ে বেরোত, সন্ধেবেলায় ফিরে এসে কোফতা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত— আর বী-আম্মার পাতানো বোন খুসুর-ফুসুর করত।

'বেচারা বড়ো লাজুক।' বী আম্মা কথা চেপে দিয়ে বলত।

'হাঁ, তা তো ঠিকই, কিন্তু ভাবগতিক থেকে বা চোখের ইশারা থেকে কিছু তো বোঝা যাবে।'

'ইয়া আল্লা। খোদা না করুন, আমার মেয়ে যেন চোখের ইশারা না করে। তার আঁচল পর্যন্ত কেউ কখনো দেখে নি। বী আম্মা গর্ব করে বললেন।

'মাসি, এখন আমার প্রাণ তো বাঁচুক।'

'হায় মাসি! আমি কী করব?'

'অকল-খরী,[14] রাহত মিঞার সঙ্গে কথা বলিস্ না কেন?'

'ভাই, আমার তো লজ্জা হয়, তা ছাড়া ওকে আমার ভয় লাগে।'

'এঃ হে···সে তোকে ফেড়ে ফেলে খেয়ে নেবে না তো।' বী আম্মা বিরক্ত হয়ে বললেন।

'না তো, কিন্তু...' সে নিরুত্তর হয়ে যেত।

তারপর খুব ভাবনা-চিন্তার পর ভগ্নীপতির সঙ্গে রঙ্গ করবার জন্যে সরষের খোলের কাবাব বানানো হল।

[হামীদার কথা]

ঐদিন দিদিও কয়েকবার মুচকি হাসি হাসলেন।

চুপি চুপি বললেন— 'দেখো হেসে ফেলো না। তা হলে সব মজা নষ্ট হয়ে যাবে।'

'হাসব না।' আমি শপথ করেছি।

'খানা খেয়ে নিন।' আমি চৌকির উপর সুজনি বিছিয়ে দিতে দিতে বললাম।

খাটের পাটির নীচে রাখা লোটায় হাত ধোবার সময় রাহত আমার দিকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখল। আমি ঝটপট সেখান থেকে পালালাম। আমার বুক ধড়ফড় করে উঠেছিল।

'আল্লাহ্ তোবা··· হতচ্ছাড়ার চোখদুটো কত বদমায়েশী-ভরা···'

'মর নেংড়ি! আরে দেখ তো ও কেমন মুখভঙ্গি করে। তুই সারা মজা নষ্ট করে দিলি।'

বী আম্মা মন্তব্য করলেও আমি একচুল নড়লাম না।

দিদি একবার আমার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে ছিল অনুরোধ, ছিল ফিরে-আসা বিয়ের তত্ত্বের আক্রোশ, আর সে-দৃষ্টি চতুর্থার পুরানো জোড়ার মতো নিষ্প্রাণ। আমি মাথা ঝুঁকিয়ে থামের সঙ্গে লেগে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রাহত চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিল। আমার দিকে তাকায় নি। খোলের কাবাব খাচ্ছে দেখে আমার উচিত ছিল যে মজা করব, ঠা-ঠা করে হাসব আর বলব··· 'বা রে বা, দুলাভাই। খোল খাচ্ছ।'

কিন্তু কে জানে কে আমার গলা টিপে ধরল।

বী আম্মা জ্বলে উঠে আমাকে ডেকে নিলেন আর মুখের ভঙ্গিতে তিরস্কার করলেন। এখন আমি তাকে কী বলতে পারি— সে তো আরাম করে খাচ্ছে। বদমাশ আমাকেই না খেয়ে ফেলে।

'রাহত ভাই, কোফ্তা পছন্দ হয়েছে?'

বী-আম্মার শেখানো-মতো জিজ্ঞাসা করতে হল।

কোনো জবাব নেই।

'বলুন-না।'

'আরে ঠিকমত জিজ্ঞাসা কর্।' বী আম্মা খোঁচা দিল।

'আপনি এনে দিয়েছেন, আমি খেয়ে নিয়েছি। মজাদারই হয়েছে।' সে বলল।

'আরে বা রে জংলী।' বী আম্মা না থাকলে বলে উঠতাম। 'তুমি জানতেও পারো নি। কী মজার সঙ্গে খোলের কাবাব খেয়ে নিলে?'

'খোলের? তা হলে রোজ কিসের কাবাব তৈরী হয়? আমি তো অভ্যস্ত হয়ে গেছি— খোল আর ভুষি খেতে...' রাহত ধীরে ধীরে বলল।

বী আম্মার মুখে আঁধার নেমে এল। দিদির ঝুঁকেপড়া চোখের পাতা আর উঠল না। পরদিন দিদি প্রত্যহের চেয়ে দ্বিগুণ সেলাই করল। সন্ধ্যাবেলায় আমি খানা দিয়ে গেলাম।

'বলুন আজ কী এনেছেন? আজ তো কাঠের গুঁড়োর দিন।'

'কেন, আমার হাতের খানা কি আপনার পছন্দ হয় না?' আমি জ্বলে উঠে বললাম।

'এ কথা নয়, আজব-কিছু মনে হচ্ছে। কখনো সরষের খোলের কাবাব, আর কখনো ভুষির তরকারী।'

আমার সারা শরীরে আগুন লেগে গেল। আমি শুকনো রুটি খেয়ে ওকে হাতির খোরাক দিচ্ছি, ঘি-ঝরানো পরোটা খাওয়াচ্ছি, আমার দিদির শুকনো রুটিও জুটছে না, আর ওকে দুধ-মালাই গেলাচ্ছি। আমি বিরক্ত হয়ে চলে এলাম।

বী-আম্মার পাতানো বোনের ব্যবস্থাপত্র কাজে এল। রাহত দিনের বেশির ভাগ ঘরেই কাটাতে লাগল। দিদি তো চুলোর উপরে ঝুঁকে থাকত। বী আম্মা চতুর্থীর জোড়া সেলাই করতেন আর রাহতের ময়লা চোখদুটি তীর হয়ে আমার হৃদয়ে খোঁচা দিত। কথা-বে-কথায় সে খোঁচা দিত। খানা খাবার সময় কখনো জল, কখনো-বা লবণের অছিলায় ডেকে পাঠাত আর সঙ্গে সঙ্গে জুলুমবাজী। রাগ

করে আমি দিদির কাছে গিয়ে বসতাম। প্রাণ চাইত সাফ বলে দিই কার বক্‌রী আর কে দেয় ঘাস। আরে ভাই আমি তোমার বলদের নাকে দড়ি দিতে পারব না। কিন্তু দিদির এলোমেলো চুলের ছাই উড়ে বসে···না···না··· আমার কল্‌জে ধক্ করে উঠল। আমি তার শাদা চুল তলায় ঠেলে দিলাম। 'ঐ বদমাশ হাড়-জ্বালানে খতম হয়ে যাক। বেচারীর চুল পাকতে শুরু হয়ে গেল।'

রাহত ফের বাহানা করে ডাকতে লাগল।

'উহুঁ'— আমি জ্বলে উঠলাম। কিন্তু দিদি কাটা মুর্গীর মতো উল্টে পড়ে আমাকে দেখল, কাজেই আমাকে যেতেই হল।

'দিদি আমার উপর রেগে গেল।' রাহত জলের বাটি সমেত আমার কব্জি ধরে ফেলল। আমার দম বেরিয়ে গেল; ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে পালালাম।

'কী বলছে রে?' দিদি লজ্জা-জড়ানো কণ্ঠে বলল। আমি চুপ-চাপ তার মুখ দেখতে লাগলাম। কী বলছে?

'বলছে যে এই রান্না কে করেছে···বাহ্ বাহ্···প্রাণ চায় খেয়েই চলি···যে রান্না করেছে তার হাত খেয়ে ফেলি···ওঃ···না···খেয়ে ফেলব না···পরন্তু চুমু খাব।' আমি বলতে শুরু করে দিলাম আর দিদির কর্কশ হলুদ-ধনে-বাটা ক্ষয়ে-যাওয়া হাত নিজের গালে টেনে নিলাম। আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

'এই হাত।' আমি ভাবলাম— 'যা সকাল-সন্ধ্যা খেটে যায়, তার বেগার ঠেলা কবে শেষ হবে? তার কোনো খরিদ্দার আসবে না? কেউ কোনোদিন প্রেমভরে ঐ হাতে চুমু খাবে না? ও হাতে কোনো-দিন মেহেদী রঙ লাগবে না? ওতে কোনোদিন সোহাগের আতর লাগানো হবে না?'

প্রাণ চাইছিল চেঁচিয়ে কাঁদি।

'আর কী বলছিল রে?'

দিদির হাত তো এত কর্কশ, কিন্তু তার গলার আওয়াজ এত কোমল আর মিষ্টি ছিল যে রাহতের যদি শোনবার কান থাকত

তো... কিন্তু রাহতের না ছিল কান, না ছিল নাক, ছিল কেবল নরকের মত বিরাট পেট।

'আর বলছিল··· আপনার দিদিকে বলবেন এত কাজ যেন না করে আর শুকনোপোড়া না খায়···'

'যা মিথ্যুক···'

'আরে বা, মিথ্যা হবে তোমার সে···'

'চুপ কর মড়া।' সে আমার মুখ চেপে ধরেছিল।

'দেখ্ তো সোয়েটার বোনা হয়ে গেছে। ওকে দিয়ে দাও। আর দেখ্, আমার কসম, আমার নাম করবি না।'

'না দিদি, ওকে সোয়েটার দিয়ো না··· তোমার এই সামান্য ক'টা হাড়ের পক্ষে সোয়েটার কত জরুরি।' আমি বলতে চাইলাম কিন্তু বলতে পারলাম না।

'দিদি' তুমি নিজে কী পরবে?'

'আরে আমার কিসের দরকার? উনানের পাশে বসে তো ঝলসে যাই।'

সোয়েটার দেখে রাহত নিজের ভ্রূ শয়তানির ঢঙে টান করে বলল—

'এই সোয়েটার আপনি বুনেছেন?'

'না তো।'

'তা হলে ভাই আমি পরব না।'

আমার প্রাণ চাইছিল ওর মুখ আঁচড়ে দিই— বদমাশ্ মাটির তাল! এই সোয়েটার সেই দু হাতে বুনেছে যা জীবনে মরণে দামী হয়ে আছে। সোয়েটারের এক-এক ঘরে পোড়া ভাগ্যের আকাঙ্ক্ষার গলা ফেঁসে আছে। এই সোয়েটার সেই দু হাত বুনেছে যা পালংকে ঝুলাবার জন্যে জন্ম নিয়েছে। ভাঙা বোতাম আর ছেঁড়া জামার সামনের দিক রিফু করার জন্য তা তৈরি হয়েছে। আরে বোকা, ওকে তুমি নিয়ে নাও। এই দুই দাঁড় বড় বড় তুফানের আক্রমণ থেকে তোমার জীবনের নৌকাকে বাঁচিয়ে পারে নিয়ে যাবে। এই দুই হাত সেতার বাজাতে পারবে না, মণিপুরী আর ভরতনাট্যের মুদ্রা দেখাতে পারবে

না। এ দুটিকে পিয়ানোর উপর নেচে বেড়াতে শেখানো হয় নি। ফুলের সঙ্গে খেলা করার ভাগ্য ওদের হয় নি। কিন্তু এই দুটি হাত তোমার শরীরে চর্বি জমিয়ে দেবার জন্য সকাল-সন্ধে সেলাই করে চলেছে। সাবান আর সোডায় বারবার ডুবছে। উনানের আঁচ সহ্য করছে। তোমার ময়লা কাপড় ধুয়ে দিচ্ছে তার ফলেই তুমি শাদা ধপ্‌ধপে বক-ধার্মিক সেজে থাকো। মেহনতকে তারা ঘা দিয়েছে। ঐ দু হাতে কখনো চুড়ি ঝনক-ঝনক করে না। তাদের কেউ কখনো ভালবেসে ধরে নি।

কিন্তু আমি চুপ করে ছিলাম। বী আম্মা বলতেন, আমার মাথা আমার নতুন-নতুন সখীরা খারাপ করে দিয়েছে— 'আমি কীরকম নতুন নতুন কথা বলি, কেমন ভয়ংকর মৃত্যুর কথা, ক্ষুধা আর দুর্দিনের কথা বলি। ধক্ ধক্ করে-ওঠা হৃদয়কে একদম চুপ করিয়ে দেবার মতো কথা।'

'এই সোয়েটার আপনিই পরে ফেলুন··· দেখুন-না, আপনার জামা কত পাতলা।'

ইচ্ছে করে জংলী বিড়ালের মতো আমি ওর মুখ, নাক, গলা খিম্‌চে আর চুল টেনে দিয়ে নিজের পালংকে ধড়াস্ করে শুয়ে পড়ি।

দিদি অবশিষ্ট রুটি রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে নিল আর আঁচলে হাত মুছে আমার কাছে এসে বসল।

'কী বলল ?' সে নিজেকে আর সামলাতে পারল না, কম্পিত হৃদয়ে শুধাল।

'দিদি, এই রাহত ভাই খুব খারাপ লোক।'

আমি ভাবলাম আজ সব কিছু বলে দেব।

'কেন ?' সে মুচকি হাসল।

'আমার ভালো লাগে না··· এই দেখ··· আমার সব চুড়ি ভেঙে গেছে।' আমি কেঁপে উঠে বললাম।

'বড় বদমাশ !' সে রোম্যান্টিক কণ্ঠে লজ্জা পেয়ে বলল।

'দিদি,—শোনো দিদি, এই রাহত ভালো লোক নয়।' আমি

জ্বলে উঠে বললাম— 'আজ বী আম্মাকে বলে দেব।'

'কী হয়েছে?' বী আম্মা জা নামাজের মাদুর বিছাতে বিছাতে শুধালেন।

'বী আম্মা, আমার চুড়িগুলি দেখুন।'

'রাহত ভেঙে দিয়েছে?' বী আম্মা খুশি-খুশি হয়ে বললেন।

'হাঁ।'

'বেশ করেছে। তুই ওকে খুব বিরক্ত করিস... এঃ হে, তোর দম কেন বেরিয়ে গেল? বড়ো মোমের তৈরি তুই! একটু হাত লেগেছে কি গলে গেছ।' আবার সস্নেহে বললেন··· 'আচ্ছা, তুইও চতুর্থীতে প্রতিশোধ নিবি····মিঞাজী মনে পড়ে, এই নাও বদলা···'

এ কথা বলে তিনি মতলব ভেঁজে নিলেন।

পাতানো বোনের সঙ্গে ফের কনফারেন্স হয়েছিল আর মামলাকে আশার পথে এগোতে দেখে খুব খুশি হয়ে ঠাট্টা করেছিলেন।

'এঃ হে, তুই তো বড়ো শক্ত আছিস্। আমি হতাম তো, খোদার কসম, আপন ভগ্নীপতির প্রাণ বার করে দিতাম!' পাতানো বোন বলল।

আর সে আমাকে ভগ্নীপতিদের ফাঁদে ফেলার কায়দা-কানুনের বিবরণ দিতে লাগল— কী ভাবে সে কায়দা করে নিভুল নিশানায়, ঠিক ঠিক কৌশল অনুযায়ী তার দু বোনের বিয়ে দিয়ে দিল— যাদের নৌকা পারে আসার সব সুযোগ হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাদের একজন ছিলেন হাফিমজী। যে বেচারীকে মেয়েরা খোঁচা দিলে লজ্জা পেত আর লজ্জায় একেবারে কুঁকড়ে যেত, একদিন সেই লোকই মামু সাহেবকে বলল যে আমাকে গোলামী দিয়ে দিন।

দ্বিতীয় জন ছিল ভাইসরয়ের দফতরে ক্লার্ক। যখনি শুনেছে কি বাইরে থেকে এসেছে, তখনি মেয়েরা তার পিছনে লেগে গেল।

কখনো পানের খিলিতে লঙ্কা ভরে পাঠিয়ে দিত, কখনো সিমাইয়ের মধ্যে নুন মিশিয়ে খাইয়ে দিত।

'এই দেখ ও তো রোজ আসতে শুরু করেছে। আঁধি হোক,

বৃষ্টি হোক কে তাকে আটকায়। শেষে একদিন সে বলিয়ে দিল। নিজের এক চেনাশুনো লোককে বলল, 'এখানেই শাদি করিয়ে দাও', সে শুধাল, 'ভাই, কার সঙ্গে ?'

উত্তরে বলল— 'যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে করিয়ে দাও।— আর খুদা যদি মিথ্যা না বলান তো বড়ো বোনের চেহারা এমনি ছিল যে দেখলে মনে হত যেন পেত্নী। ছোট বোন তো লক্ষ্মীটেরা— এক চোখ পুব দিকে তো অন্য চোখ পশ্চিম দিকে। বাপ পনেরো তোলা সোনা দিয়েছিল আর বড়ো সাহেবের দফতরে চাকরিও দিয়েছিল।'

'হাঁ ভাই, যার কাছে পনেরো তোলা সোনা আছে আর বড়ো সাহেবের দফতরে চাকরি আছে, তার ছেলে পেতে কি দেরি হয়।'— বী আম্মা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন।

'বোন, এ কথা নয়। আজকালকার ছেলেদের দিল্ যেন থালার উপর বেগুন। যেদিকে ঝুঁকিয়ে দেবে সেদিকেই গড়িয়ে যাবে।'

'কিন্তু রাহত তো বেগুন নয়, আচ্ছা খাসা পাহাড়— থালা তো আমি ঝুঁকিয়ে দেব কিন্তু আমি না পিষে যাই।'

আমি ফের দিদির দিকে তাকালাম। সে চুপ করে দেউড়ির উপর বসে আটা মাখছিল আর সব-কিছু শুনছিল। তার সাধ্য থাকলে মাটির বুক চিরে নিন্দাসমেত আপন কৌমার্য নিয়ে তার মধ্যে ঢুকে যায়।

আমার দিদি কি পুরুষের জন্য তৃষার্ত হয়ে উঠেছিল ? না, ওই ক্ষুধার আবেদনে সে গোড়াতেই জব্দ হয়ে গিয়েছিল। পুরুষের কল্পনা তার মাথায় উন্মাদনায় ভরা ছিল না, বরং রুটি-কাপড়ের চিন্তা তার মাথায় চেপে বসেছিল। সে এক বিধবার বুকের বোঝা। ঐ বোঝাকে নামাতেই হবে।

কিন্তু ইশারা আর গোপন কথা সত্ত্বেও রাহত মিঞা না নিজেই মুখ ফুটে বলল, না তার ঘর থেকে প্রস্তাব এল। শ্রান্ত পরাজিত বী আম্মা পায়ের তোড়া বাঁধা রেখে পীর 'মুশকিল কুশা'র ভেটপূজা পাঠালেন। সারা দুপুর মোহল্লার মেয়েরা আঙিনায় লাফালাফি

করেছিল। দিদি লজ্জায় পড়ে মশা-ভর্তি কুঠুরিতে বসে আপন রক্তের শেষবিন্দু মশাদের চুষে নিতে দিয়েছিল। বী আম্মা সেহদরীতে নিজের চৌকির উপর বসে চতুর্থীর জোড়ে শেষ ফোঁড় দিচ্ছিলেন। আজ তার মুখের উপর গন্তব্যস্থলের নিশানা ছিল। আজ মুশকিল আসান হবে। ব্যস, আখেরি[15] সেলাইটা বাকি ছিল। তাও শেষ হল। আজ তার মুখের কুঞ্চনরেখার উপর ফের মশালের আলো কাঁপছিল। দিদির সখীরা ওকে খোঁচাচ্ছিল আর সে রক্তের অবশিষ্ট বিন্দুতে উত্তাপ দিচ্ছিল। আজ কয়েকদিন ধরে তার জ্বর হয় নি। শ্রান্ত হেরে-যাওয়া প্রদীপের মতো তার মুখ একবার টিম টিম করছিল আবার নিভে আসছিল। ইশারায় সে আমাকে তার কাছে ডেকে নিল। আপন আঁচল তুলে 'মুশকিল কুশা'র অর্পণপাত্র আমাকে ছুঁইয়ে দিল।

'এর উপর মৌলবী সাহেব দম[16] পড়ে দিয়েছেন।' জ্বরের চেয়ে বেশি গরম গরম নিশ্বাসের ঝলক আমার কানের উপর এসে পড়ছিল।

পাত্র নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম—'মৌলবী সাহেব দম পড়ে দিয়েছেন। এই পবিত্র মলীদা এখন রাহতের তন্দূরে ফেলে দেওয়া হবে। ঐ তন্দূর ছ' মাস ধরে আমাদের রক্তের ছিটেয় গরম রাখা হয়েছে। এই মন্ত্র-পড়া মলীদা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে।' আমার কানে বিয়ের বাজনা বাজতে লাগল। আমি দৌড়ে-দৌড়ে ছাদের উপর থেকে বরযাত্রীদের দেখতে যাচ্ছি। বরের মুখের উপর লম্বা সেহ্‌রা ঝুলছে, তা ঘোড়ার চুলকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। চতুর্থীর বাদশাহী চুড়ি পরে, ফুলে ফুলে ভরা হয়ে, লজ্জায় নিঢাল আস্তে আস্তে পা ফেলে দিদি আসছে। চতুর্থীর সোনালী তারের জোড়া ঝলমল করছে। বী আম্মার মুখ ফুলের মতো ফুটে উঠেছে। দিদির লজ্জায় আনত দৃষ্টি এক-একবার উঠছে। কৃতজ্ঞতার অশ্রু চোখের পাতার কোণে কোণে কুমকুমের মতো জড়িয়ে যাচ্ছে।

'এই সবই তোর প্রেমের ফল।' দিদির নৈঃশব্দ্য যেন বলছে…

হামীদার গলা ভরে এল।

'যাও-না আমার লক্ষ্মী।' দিদি ওকে জাগিয়ে দিল। আর সে চমকে উঠে ওড়নার আঁচল দিয়ে অশ্রু মুছে নিয়ে দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

'এই ··· এই মলীদা।' সে উছলে ওঠা হৃদয়কে সংযত করে বলল। তার পা কাঁপছিল। যেন সাপের গর্তে পা দিয়েছে আর পাহাড় ধসে গেছে। রাহত মুখ খুলেছিল।

সে একেবারে পিছু হটে গিয়েছিল। কিন্তু দূরে কোথাও বিয়ের সানাই আর্তনাদ করে উঠেছিল। যেন কেউ তার গলা টিপে ধরেছে। কম্পিত হাতে পবিত্র মলীদা ভাঁজ করে সে রাহতের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এক ঝটকায় তার হাত পাহাড়ের গুহায় ডুবে গিয়েছিল··· নিচে··· অনেক নিচে··· আঁধারের অতল গভীরতায়। এক বড় চটান পাথর তার আর্তনাদকে থামিয়ে দিল।

পূজার মলীদার রেকাবি হাত থেকে পড়ে লণ্ঠনের উপর পড়েছিল আর লণ্ঠন মাটির উপর পড়ে গিয়ে দুচার-বার দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল। বাইরের আঙিনায় মোহল্লার বউ-ঝিরা 'মুশকিল কুশ'-এর প্রশংসায় গান গাইছিল।

সকালের গাড়িতে রাহত অতিথি সৎকারের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছিল। তার বিয়ের তারিখ স্থির হয়ে গেছে আর তার তাড়া ছিল। তারপর ঐ ঘরে আর ডিম ভাজা হয় নি, পরোটা বানানো হয় নি, সোয়েটার বোনা হয় নি। অনেকদিন রোগ দিদিকে লক্ষ্য করে চুপি চুপি পিছনে আসছিল, আজ তা এক লাফে তার উপর চড়ে বসে গলা টিপে ধরেছিল আর সে মাথা ঝুঁকিয়ে আপন আশাহত অস্তিত্ব তারই কোলে সঁপে দিয়েছিল।

আবার ঐ সেহ্‌দরীতে চৌকির উপর সাফ-সুতরো চাদর পাতা হয়েছিল। মোহল্লার বউ-ঝিরা একত্র হয়েছিল। কফনের শাদা থান মৃত্যুর আঁচলের মতো আম্মার সামনে ছড়িয়ে পড়েছিল। দুঃখ সহ্য করার বোঝার ভারে তার মুখ কাঁপছিল। বাঁদিকের ভ্রূ লাফিয়ে

উঠছিল। গালের ছোট ছোট কুঞ্চিত রেখা জাগছিল মিলিয়ে যাচ্ছিল। তার মুখের উপর ভয়ানক শান্তি আর মৃত্যু-ভরা সান্ত্বনা ছিল।

কফনের থানের কান বার করে সে চারবার ভাঁজ করেছিল; তার হৃদয়ে অসংখ্য কাঁচি চলেছিল। আজ তার মুখের উপর ভয়ানক শান্তি আর মৃত্যুভরা সান্ত্বনা ছিল, যেন তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে আরো সব জোড়ার মত চতুর্থীর এই জোড়া ব্যর্থ হবে না।

সেহ্‌দরীতে বসে মেয়েরা ময়নার মতো কল্‌কল্ করছিল। হামীদা বিগত দিনগুলি এক ঝট্‌কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে মিশে গেল। লাল জালির উপর শাদা গজীর নিশান। না-জানি তার গাঢ় লাল রঙে কত অসহায় নববধূর আকাঙ্ক্ষা রচিত হয়েছিল আর শাদারঙে কত ব্যর্থ-আশ কুমারীর শববস্ত্রের শাদা রঙ ডুবে গিয়ে ভেসে উঠেছিল। ফের সকলে একেবারে চুপ হয়ে গেল। বী আম্মা শেষ ফোঁড় দিয়ে সূতা ছিঁড়ে নিল। দুটি মোটা মোটা অশ্রুবিন্দু তার তুলোর মতো নরম গালের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে গেল। তার মুখের ভাঁজগুলিতে আলোর কিরণ ফুটে বেরুল, তিনি মুচকি হাসলেন— যেন আজ ভরসা হয়েছে যে কুব্রার জোড়া তৈরি হয়ে গেছে, আর কিছুক্ষণ পরেই সানাই বেজে উঠবে।

---

[1] তিন দরজাওলা বারান্দা— যা প্রায়শই হারেমে থাকে।

[2] কাপড়ের কাট-ছাঁটে ঐ হিসাবকে বলে, যা ছাড়া কাপড় কাটা নিরর্থক হয়ে যেত— যে-মাপে নিজের দরকার-মতো কাটছাঁট করে কাপড় বার করে নিত।

[3] শবাচ্ছাদন-বস্ত্র।

[4] কাপড় সেলাই করলে কোণে তেরছা হয়ে যায়। তাকে হাত দিয়ে টেনে সোজা করে দেওয়াকে বলে কান বার করে দেওয়া।

[5] সেই কাঠ যা দিয়ে গাড়ির ঘোড়াকে জুতে দৌড় করানো হয় আর এইভাবে তাকে গাড়িতে জোতায়:অভ্যস্ত করে তোলা হয়।

[6] কাঠ দিয়ে বানানো পায়া।

[7] কোনো কাজের শুরু করাকে বলে। এ এক সংস্কার— লেখাপড়া শুরু করার সময় এই সংস্কারের ব্যবহার হয়।

[8] গোটা, সলমা চুমকির সঙ্গে লাগানো হয় এমন ফুল।

[9] মুসলমানদের ঘরে বিয়ের প্রস্তাব পাত্রপক্ষ মেয়েপক্ষের কাছে পাঠায়। একেই বলে পয়গাম।

[10] সিঁথিতে দেবার জন্য সোনালি-রুপোলি জরি।

[1] নামাজের এক সম্পূর্ণ বিধি।

[12] ধন্যবাদ দেবার নামাজ— শুকৃরিয়ার নামাজ।

[13] উৎকৃষ্ট মাংসের টুকরো।

[14] রুক্ষ কথা যে ব্যবহার করে।

[15] কষ্ট আর দুঃখের শেষ মঞ্জিল।

[16] বরফতের জন্যে পাঠ করা মন্ত্র।

অমর লতা

বড় মামির কফন ময়লা হতে না হতেই সারা পরিবার শুজাঅত মামুর দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ের চিন্তায় ব্যাপৃত হল। উঠতে-বসতে বউ খোঁজায় লেগে গেল। খানা-পিনা শেষ করে বউ-ঝিরা যখন ছেলেদের বা মেয়েদের জামাকাপড় সেলাই করতে বসত তখন মামুর জন্যে নোতুন বউয়ের খোঁজখবর করা হত।

'আরে, আপন চাকরানী ফাতিমা কেমন করে থাকবে?'

'এঃ হে ঠাকরুন, ঘাস তো খাও না! চাকরানী ফাতিমার শাশুড়ি শুনতে পেলে মহা মুশকিল করে ফেলবে। জোয়ান ছেলের বিয়ে ঠিক হলে সে বউয়ের চারদিকে কাঁটা দিয়ে বসে যাবে। সেদিন আর আজকের দিন দেউড়ি থেকে পা তুলে নিয়েছে। হারামজাদীর বাপের বাড়িতে কেউ মরে-বাঁচে তো বোধ হয় কখনো আসা-যাওয়া হতে পারে।'

'আরে ভাই, শুজ্জন ভাইয়ার কি কুমারী মেয়ে জুটবে না যে এঁটো পাতা চাটবে। লোকে থালায় সাজিয়ে মেয়ে নিয়ে দেবার জন্যে তৈরি আছে। চল্লিশ বছর বয়স বলে মনেই হয় না…' অসগরী বেগম বলল।

'উই! খুদা ভালো রাখুন। দিদি পুরো দশ বছর কমিয়ে দিল। আল্লাহ রাখলে খালীর[1] মাসে পঞ্চাশ পূর্ণ হবে…।'

'আল্লাহ্'— বেচারী ইমতিয়াজী পিসি তো বলে ফেলে পস্তাচ্ছিল। শুজাঅত মামুর পাঁচ বোন এক দলে আর ঐ হারামজাদী আলাদা দলে, আর আল্লার কিরা, পাঁচ বোনের মুখে লাগাম ছিল না। তা এক এক গজের কাঁচির মতো চলত। কেউ বিরোধিতা করত তো ব্যস্ পাঁচ বোনে একদম দল বেঁধে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কার সাধ্যি আছে যে কোনো মুগলানী, পাঠানীর মতো ময়দানে লড়াই করে। বেচারী শেখানীরা, সৈয়দানীরা— তাদের কথা আর

শুধিয়ো না— বড়ো বড়ো দিলওয়ালীদের সাহসিনীদের হুঁশ ঠিক করে দিত।

কিন্তু ইমতিয়াজী পিসীও ঐ পঞ্চ পাণ্ডবের উপর কৌরবের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত। তার সব চেয়ে বিপজ্জনক হাতিয়ার ছিল তার চিন্ চিন্ করে ওঠা 'বর্শা'র ডগার মতো সুতীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ। বলতে শুরু করলে মনে হ'ত যেন মেশিনগানের গুলি এক কান দিয়ে ঢুকছে আর অপর কান দিয়ে শন্ শন্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে কারুর ঝগড়া শুরু হলে সারা মোহল্লায় খবর পৌঁছে যেত যে ইমতিয়াজী ঠাকরুন কারুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে আর বউ-ঝিরা কোঠাঘর পেরিয়ে ছাত পেরিয়ে দঙ্গলের দিকে দৌড়ত।

পাঁচ বোন ইমতিয়াজী ফুফুকে দুরস্ত করতে গিয়ে নিজেরাই বোকা বনে যেত। তার মেজো মেয়ে গোরী খানম এখন পর্যন্ত কুমারী, সে ঘরেই ছিল। ছত্রিশটা বছর বুকের উপর শুয়ে আছে কিন্তু ভাগ্য খুলবার কোনো লক্ষণ নজরে আসছিল না। কুমার পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না, বিবাহিতেরা বিপত্নীক হচ্ছিল না। আগেকার যুগে প্রত্যেক মরদ তিন-চারটেকে মেরে ফেলত, কিন্তু যেদিন থেকে হাসপাতাল ও ডাক্তারের আবির্ভাব হয়েছে বউরা যেন মরবার শপথ নিয়ে বসে আছে। তাদের দেখে মনে হয় তারা পরলোকের জন্য বিছানা বাঁধতে কৃতসংকল্প হয়েছে। বড় মামির অসুস্থতার দিনগুলিতেই ইমতিয়াজী পিসি হিসাব করতে শুরু করেছিল, কিন্তু তার ফেরিস্তা-দেরও জানা ছিল না যে যৌতুকের জন্য অনেক মেহনত করতে হবে।

শুজাঅত মামুর বয়সের হিসাব এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কমর আরা আর নূর মাসির জন্যে এখনো ছেলে ছিল, এইজন্যে তারা খুব উদ্‌বেগের সঙ্গে বছরের হিসেবে বারবার গণ্ডগোল করে ফেলছিল, কারণ তার বয়সের হিসেব করা হলে মাসিরাও বয়সের প্যাঁচে পড়ে যায়। এই কারণে পাঁচ বোন বিলকুল আলাদা আলাদা ভাবে হামলা শুরু করে দিয়েছিল। তারা চটপট ইমতিয়াজী পিসির

নাতজামাইয়ের বিষয়ে কথা শুরু করল— তার হাল পিসিকে দুঃখ দিত কারণ নাতজামাই তার নাতনীর উপর সতীন এনেছিল।

কিন্তু আমাদের পিসি ছিল খাস মুগলানী— তার বাবা বাদশাহী ফৌজে বরকন্দাজ ছিল— সে মারখানেঅলাদের মধ্যে ছিল না। সে তাদের পাঁয়তারা ব্যর্থ করে দিল আর শাহজাদী বেগমের নাতনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল— সে সরাসরি পরিবারের নাক কেটে দিচ্ছিল কেননা সে রোজ পাল্‌কিতে চড়ে ধনকোটের স্কুলে পড়তে যেত। ঐ যুগে স্কুলে যাওয়া ততটাই সাংঘাতিক কথা ছিল যতটা আজকাল ফিল্‌মে নাচগান করাকে সাংঘাতিক মনে করা হয়।

শুজাঅত মামু বড় ঠিকঠাক লোক ছিলেন। একেবারে সাফ্-সুতরো চেহারা। ছিপ্‌ছিপে শরীর। মাঝারি উচ্চতা। ইমতিয়াজী পিসি সব জায়গায় বলে বেড়াত যে মামু চুলে কলপ লাগায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তার মাথায় সাদা চুল দেখে নি। এই কারণে অনুমান করা মুশকিল ছিল যে সে কবে থেকে কলপ লাগাতে শুরু করেছিল। এমনিতে দেখলে মামুকে একদম যুবক বলে মনে হয়। যথার্থই চল্লিশের ওপরে ওঠে না। যখন তারপর ঘটকদের প্রস্তাবের খুব জোর বর্ষণ হল তখন সে বিরক্ত হয়ে তার মামলা বোনদের হাতে সোপর্দ করে দিল। কেবল এটুকু বলে দিল যে পাত্রী যেন এত কমবয়সী না হয় যাকে দেখে তার মেয়ে বলে মনে হয়, আর যেন এত বেশীবয়সী না হয় যাকে দেখে তার মা বলে মনে হয়।

খুব খোঁজখবর করা হল। শেষ পর্যন্ত রুখ্‌সানা বেগমের নামে পাশা পড়ল।

'আরে! এটা যে ভয় পাইয়ে দেবার মতো নাম!' ইমতিয়াজী পিসি যখন কোনো দোষ ধরতে পারল না তখন নামেতেই দোষ ধরল, কিন্তু পাঁচ বোনে এমনি দল বেঁধেছিল যে তার কথা কেউ শুনল না।

'ছুঁড়ির বয়স ষোলোর একদিন কমও না, বেশিও না— যদি তা না

হয় তবে আমাকে সকালে একশো ঘা, সন্ধ্যায় একশো ঘা জুতো মেরো, মাথার উপরে হুঁকোর জল…’

কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। সে নিজের গোরী বেগমের ব্যবস্থা করার জন্য খামাখা ঝগড়া করতে লাগল।

রুখ্সানা বেগম এমনই দেখতে যে যদি কেউ একবার তাকে দেখে তো দেখতেই থাকত। যেন প্রতিপদের কোমল লজ্জানম্র চন্দ্রলেখা—কেউ যেন তাকে মাটিতে নামিয়ে এনেছিল। চেহারা রূপ দেখে কিন্তু প্রাণ ভরে না। ওজন করলে পাঁচ ছেড়ে ছয় ফুলের দরকার হত না। রঙ এমনিই ছিল যেন উজ্জ্বল সোনা। শরীরে হাড়ের নামগন্ধ ছিল না, যেন ঠাসা ময়দার লেচির গায়ে মাখন ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। নারীত্ব এমন অদ্ভুত ছিল যেন এক ডজন মেয়ের সার নিংড়ে তার মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। যেন উত্তপ্ত অগ্নিশিখা জ্বলে উঠছিল। বোধহয় পিসির কথানুযায়ী ষোলো বছরেরই হবে, কিন্তু যৌবন ছিল উনিশ-বিশের। পাঁচ বোনে বলেছিল মামুর বয়স পঁচিশ, তাতে তার কিছুটা সংকোচ হয়েছিল কিন্তু সামলে গেছিল। বয়স কম হওয়া তো কোনো বড় অপরাধ নয়।

সবচেয়ে খারাপ কথা এই যে সে ছিল এক গরিব ঘরের বোঝা। দু তরফের খরচই মামুকে বহন করতে হয়েছিল। যখন রুখসানা মামি বিয়ের পর এলেন তখন তাকে দেখে মামুর ঘাম বেরিয়ে গিয়েছিল।

“দিদি, এ তো একেবারে বাচ্চা।” সে বিরক্ত হয়ে বলেছিল।

‘আরে, খুদা ভালো করবেন। তেল দেখো তো তেলের রাগ দেখো। মরদ ষাট বছরের হলেও জোয়ান পাঁঠা। বিবি বিশ বছরের হলেও বুড়ী। দু-চারটে ছেলে হয়েছে কি সব কলাই নষ্ট হয়ে যাবে। গু-মুত পরিষ্কার করতে করতে না থাকবে সব সাজশৃঙ্গার, না থাকবে রঙ আর কান্তি। না থাকবে বালার মতো সরু কোমর, না থাকবে বাহুর ভঙ্গিমা। যদি আর সকলের মতো না দেখায় তো আমার যেন চোরের হাল হয়। আমি তো বলছি দশ বছরের মধ্যে বড়ো

ভাবীজানের মতো হয়ে যাবে।'

'আমরা আমাদের ভাইয়ের জন্য আবার সাড়ে বারো বছরের মেয়ে আনব।' নূর মাসি বলে উঠল।

'হু-শ্-শ্-শ্', মামু লজ্জা পেল।

'দ্বিতীয় বিবি বাঁধে না বলেই তৃতীয় বিবি।' শবীহ বেগম বলল।

'কী বাজে কথা বলছ?'

'হাঁ মিঞা। বুড়ীদের কাছে শুনেছি যে দ্বিতীয়া তো তৃতীয়ার জন্যে বলি হয়ে যায়। এই কারণে পুরনো কালে লোকে পুতুলের সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে দিত, তারপর যে নববধূ আসত সে হত তৃতীয়…'

বোনেরা বুঝিয়েছিল আর মামু বুঝেছিল। তারপর শীঘ্রই রুখসানা বেগমও সমঝে দিয়েছিল। দু-তিন বছরের মধ্যে ভালো খাওয়া-পরা আর প্রেমিক পতির সাহচর্যের ফলে সে জাদুবলে প্রতিপদের চাঁদ থেকে চতুর্দশীর চাঁদ হয়ে উঠেছিল। সেই ছড়িয়ে-পড়া চাঁদের আলোয় দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে যেত। ঘাটে ঘাটে চাঁদের আলো বিচ্ছুরিত হত। সুজাঅত মামুর এমন নেশা হয়েছিল যে সে একেবারে চুর হয়ে গিয়েছিল। খুদাকে ধন্যবাদ যে সে অচিরেই পেনশনভোগী হবে, না হলে ঐ দিনগুলিতে সে অবশ্যই দফতর থেকে ডুব মারত।

বোনদের সব দিয়ে থুয়ে এক ভাই ছিল। বড়মামির বধূকালেই তার উপর থেকে মন চলে গিয়েছিল। সে কখনো ভ্রূ টানার সুযোগ পায় নি। যতদিন বেঁচেছিল স্বামীর দর্শনের জন্য লালায়িত ছিল। খুদা তাকে সন্তান দেয় নি, না হলে ওদিকে মন যেত। মিঞা বোনদের প্রিয় ভাই ছিল— তাকে না দেখলে তাদের ভাত হজম হত না। দফতর থেকে সোজা কোনো বোনের ওখানে গিয়ে পৌঁছুত, রাতের খানা সেখানেই খেয়ে আসত। আর বড়মামি রোজ খাবার-দাবার সাজিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত পথের দিকে তাকিয়ে থাকত। দৈবাৎ যদি কোনো রাতে মামু খেয়ে নিত তো তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যেত। এইসব দিনে বোনেরা এখানে হাঙ্গামা করত।

শয়তান ননদেরা কখনো বউদিকেও ডেকে নিত। কিন্তু সে বেচারীর কি এখানে কি ওখানে উটকো লাগত। সবাই ডাকা ছেড়ে দিয়েছিল। সুজাঅত মামুকে কখনো কখনো জন চারেক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করতে হত বা নাচগানের মহফিল বসাতে হত। কিন্তু সেখানে বিবির দেখা পাওয়া যেত না। বোনেরাই সব বন্দোবস্ত করত। সে তাদের হাতেই টাকা দিয়ে দিত।

কেউ কেউ মামিকে পরামর্শ দিয়েছিল যে মিঞাকে কাবু করার একটাই কায়দা আছে। একে খুব খানা খাওয়াও যাতে অন্য কারুর ঘরের গ্রাস মুখে না রোচে। ব্যস, মামি পাক-প্রণালী-পুস্তক চেয়ে এনেছিলেন, রসুনের খীর আর বাদামের গুলগুল দম্-এ-মুর্গ আর মাছের কাবাব রান্না করলেন, যা খেয়ে মামু সিদ্ধান্ত করেছিলেন সে তাকে বিষ দিয়ে মারতে চায়।

মামি রক্তবমি করে মরে গেল।

কিন্তু নতুন-বউয়ের জাদু, আসা মাত্রই মামুর মাথায় চড়ে গেল। না কেউ আমার রইল, না কেউ যাওয়ার। না কারুর আসা ভালো। কেবল মিঞা আর বিবি। কেমন চিরসবুজের রাজ্য! মুহূর্তের মধ্যেই ছিলা-টানা তীরের মতো নির্মম আর উদাসীন হয়ে যায়। দুনিয়া উজাড় হয়ে যায়। নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরেছে। গোরী বেগমের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলে তো ভাই পর হয়ে যেত না।

'এ ভাবি! ভাইকে কতদিন আঁচলে বেঁধে রাখবে? পুরুষ জাত তো দোলনা নয় যে হরদম তাতে কনুই লাগিয়ে বসে থাকবে…'

লাখ লাখ বিদ্রূপ করা হলেও দুলহা-বেগম খি-খি করে হাসে আর মিঞা কাঠপেঁচার মতো আওয়াজ করে— নিজের বউ, কোনো পড়শীর তো নয় যে কেবল বাজার-যাওয়া লোকের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে… ।

মামু আর সে মামু ছিল না। আজ কোথায় কাওয়ালী, কোথায় গানের মুজরো! ব্যস, বউয়ের ইশারায় সে নাচছিল। নিজেই

নাচছিল।

'এ তো অল্প-দিনের জন্য হৈ চৈ। গর্ভসঞ্চার হতে না হতেই সারা নতুন-বিবিগিরি খতম। কোনো-না-কোনো দিন তো ভায়ের টানে ভাঁটা আসবে...' বোনেরা নিজেদের মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিল।

আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে রুখসানা বেগম পোয়াতি হয়েছিল তো আল্লাহ্ তোবা... না হল বমি, না হল শরীর খারাপ। মুখের কান্তি আরো বেড়ে গেল। কী শক্তি— একটুও আলস্য দেখা গেল না। সেই চাঞ্চল্য, সেই প্রেমিকার হাবভাব যা নববধূরাই দেখিয়ে থাকে ...আর মামুকে তো নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তাকে তুলে নিয়ে পলকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। সে হৃদয় বার করে পায়ে-পায়ে দিয়ে দেয়। বুক থেকে নামার বদলে সে তো মাথায় চড়ে বসেছিল।

গর্ভকালের সারা সময়টাতে রুখসানা মামির সৌন্দর্যে কোনো গ্রহণ লাগল না। শরীর ফুলে গেল কিন্তু কান্তি চমকাচ্ছিল। না পা ফুলে গেল, না চোখের কোলে কালি পড়ল। চলাফেরায় না কোনো অসুবিধা। প্রসবের পর তাড়াতাড়ি খাড়া হয়ে গেল। কোমরের কী অধিকার যে চুলপ্রমাণ মোটা হয়ে যায়! কোমর সেই কৌমার্যের দিনের মতোই ভঙ্গিমাময়। প্রসবের পর বিবিদের মাথার চুল ঝরে যায়। কিন্তু তার চুল এত ঘন হয়ে গেল মাথা ধোওয়াই মুশকিল।

হাঁ, বিবির বদলে মামু কিছুটা ঝরে গেল। সে-ই যেন বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। অল্প একটু ভুঁড়ি বেরিয়ে এল। গালে লম্বা লম্বা রেখা গভীর হয়ে দেখা দিল। মাথার চুল আগের চেয়েও বেশি শাদা হয়ে গেল। আর যদি দাড়ি না থাকত তো মুখের উপর শাদা-শাদা পোকার ডিম ফুটে বেরুত।

দু বছর পরে যখন মেয়ে হল তখন মামুর ভুঁড়ি আরো বেড়ে গেল। চোখের নিচে চামড়া ঝুলে গেল। নিচের পাটির দাঁতের বেদনা যখন সহ্যের বাইরে চলে গেল তখন নাচার হয়ে তা ফেলিয়ে দিতে হল। এক ইঁট সরে গেল তো সারা ইমারত ধসে পড়ল।

ঐ সময়ে মামির আক্কেল দাঁত বেরিয়েছিল।

শুজাঅত মামুর বাঁধানো দাঁতের পাটি আসল দাঁতের চেয়ে দেখতে সুন্দর ছিল। বয়সের কথা থাক, ঠাণ্ডায় তা কনকন করছে।

ইমতিয়াজী পিসির হিসেবে রুখসানা মামির ছাব্বিশ বছর বয়স হয়েছিল, যদিও কখনো কখনো বাচ্চাদের সঙ্গে লাফালাফি করার খেয়াল এসে গেলে সে ষোলো বছরেই থমকে দাঁড়াত। কয়েক বছর ধরে তার বয়স বাড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল যে বয়স গোঁয়ার টাট্টুর মতো এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছিল আর এগোবার নামও করছিল না। ননদদের হৃদয়ে করাত চলত। যখন নিজ নিজ হাত-পা শ্রান্তিতে এলে পড়ে তখন নওজোয়ানের চাঞ্চল্য ঘোড়ের চাঁটির মতো কলিজাতে এসে আঘাত করে অনেকটা এমনি হয়েছিল। আর মামি সাফ-সাফ মজুত সঞ্চয় থেকেই খরচা করে যাচ্ছিল। ভদ্রতা আর ভালমানুষির দাবিমতো সে স্বামীকে আপন ঈশ্বর বলে মানত। ভাল-মন্দ মিলিয়ে তাকে সঙ্গ দিত এইজন্যে নয় যে তারা শ্রান্ত হয়ে বসে গেছিল আর বেগম বেদম হয়ে মুর্গির পিছনে দৌড়চ্ছিল।

'এ বউদি, খুদা তোমায় সদ্‌বুদ্ধি দিন, না আছে মাথার খবর না পায়ের খবর, হুড়োহুড়ি করে মুর্গীর পিছনে দৌড়চ্ছ…'

'তা কী করব মাসি, আমি তো বেড়াল…'

'ঐ নাও, ঐ শোনো, এই বিবি, আমি কবে থেকে তোমার মাসি হয়ে গেলাম? শুজ্জন ভাই আমার থেকে চার বছরের বড়ো। ইয়া আল্লা, বড় ভাই বাপের মতো, তুমিও আমার বড়। খবরদার, তুমি যদি আর কখনো আমাকে মাসি বলেছ…

'জী, বহুৎ আচ্ছা'… বিয়ের আগে রুখসানা মামির মা ওদের পাতানো-বোন বলে ডাকত।

যে রূপ আর কচি বয়স একদিন শুজাঅত মামুকে গোলাম বানিয়েছিল, তা আজ তার ভাল লাগত না। খোঁড়া বাচ্চা যখন অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে দৌড়ে পারে না তখন চেঁচিয়ে অভিযোগ করে যে

তোমরা বেইমানী করছ। মামি তাকে ধোঁকা দিয়েছিল। কখনো-কখনো তো সে ঐ বাচ্চা মেয়েদের মতো হাসত আর দৌড়ত; তা দেখে মামুর হৃদয়ে খোঁচা লাগত, সে জ্বলে গিয়ে কালো হয়ে যেত।

'ছোঁড়াদের লুব্ধ করার জন্যেই কি টান-টান হয়ে হাঁটছ...' সে বিষ উগরে দিতে থাকে—'হা, এখন কোনো জোয়ান পাঁঠা খুঁজে নাও।'

মামি গোড়ায় গোড়ায় হেসে উড়িয়ে দিত, তারপর লজ্জায় লাল হয়ে যেত। এতে মামু আরো খেপে যেত, আরো অনেক দোষারোপ করত।

'অমুকের সঙ্গে চোখ মারামারি করেছিলে... অমুকের সঙ্গে তোমার গোপন সম্বন্ধ আছে...'

শুনে মামি অবাক হয়ে যেত। তার চোখে মোটা মোটা অশ্রু দেখা দিত। কাপড় ঝুলবার দড়ি থেকে দুপাট্টা টেনে সে আপন শরীর ঢেকে মাথা ঝুঁকিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যেত। মামুর কলিজায় চোট লাগত। তার পায়ের তলায় মাটি সরে যেত। সে তার পা চাটত। তার পায়ে মাথা খুঁড়ত, তার সামনে মাটিতে নাক ঘষত... কাঁদত...

'আমি নীচ... আমি হারামজাদা... যত চাও তত বার আমাকে জুতোপেটা করো... মেরী জান, মেরী রুখী, মেরী মলকা... মেরী শাহজাদী...'

তখন রুখসানা মামি আপন রুপোলি হাতে তার গলা জড়িয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদত।

'মেরী জান, আমি তোমার বিমুগ্ধ প্রেমিক। ঈর্ষা আর দ্বেষে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি। তুমি যখন বাচ্চাদের কোলে নাও তখন আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে... প্রাণ চায় শালাদের গলা টিপে দিই... আমাকে মাফ করো, মেরী জান...'

সে তক্ষুনি মাফ করে দিত। এত মাফ করে দিত যে শুজাআত মামুর চোখের পাতা আরো ভিজে যেত আর অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে

শ্রান্ত খচ্চরের মতো হাঁফাত।

তারপর এমন দিন এসেছিল যখন সে মাফ চাইতে পারে নি। কোনো কোনো দিন সে রুষ্ট হয়ে যেত। বোনদের আশা বেড়ে যেত। 'ভাইয়াজান ভাবিকে বিরক্ত করে করে মারছে। আর কিছুদিন যাক, এই মেয়ে আরো কত খেলা দেখাবে!'

মামি লুকিয়ে-লুকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদত। অশ্রুভরা চোখে লাল রেখা আরো মোটা হল। শুয়ে-থাকা বিবর্ণ চেহারা— যেন কোনো বেইমান স্যাকরা সোনার সঙ্গে বেশি করে রুপো মিশিয়ে দিয়েছে। শুকনো-শুকনো ঠোঁট। মাথার উপরে উল্টো করে ছড়ানো বেণী। যারা দেখবে তারা নিজেদের সংবরণ করতে পারবে না। ঐ প্রাণান্তক সৌন্দর্য দেখে মামুর দুকাঁধ আরো ঝুলে পড়ল। চোখের তলে চামড়া আরো ঝুলে গেল।

একরকম লতা আছে— অমর লতা। সবুজ সবুজ সাপের মতো পাতাবিহীন লতা। শিকড় হয় না। এই সবুজ লতা অন্য কোনো সবুজ গাছের উপর রেখে দেওয়া হলে লতা তার রস চুষে চুষে ছড়িয়ে যেতে থাকে। এই লতা যতই ছড়িয়ে যায় ততই ঐ গাছ শুকিয়ে যেতে থাকে।

যেমন যেমন রুখসানা বেগমের যৌবনোদ্যান শোভিত হতে থাকে তেমনি মামু শুকিয়ে যেতে থাকে। বোনেরা মাথায় মাথায় মাথা লাগিয়ে ফুসুর-ফাসুর করে। ভাইয়ের দিনের পর দিন ভেঙে-পড়া স্বাস্থ্য দেখে তাদের প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছিল। ভাই একেবারে বুড়ো হয়ে গেছে। বাতের বেদনা তো ছিলই, সেইসঙ্গে সর্দি প্রাণ বার করে দিচ্ছিল। ডাক্তাররা বলেছিল, কলপ একেবারেই আপনার সহ্য হয় না। নাচার হয়ে চুলে মেহদী লাগাতে থাকে।

বেচারী রুখসানা একটা একটা করে চুল সাদা করে ফেলার ব্যবস্থাপত্র শুধিয়ে বেড়াচ্ছিল। কেউ বলেছিল যদি সুগন্ধি তেল মাখো তো তাড়াতাড়ি সব চুল সাদা হয়ে যাবে। বেচারী মাথায় আতর ঢেলে দিয়েছিল। মামুর নাকে ঐ উন্মাদ করে দেওয়া সুগন্ধি

ঢুকতে সে মামির সম্পর্কে এমন অকথ্য অভিযোগ করেছিল যে মামি বাচ্চাদের কথা যদি না ভাবত তো কুয়ায় ঝাঁপ দিত। তার মাথার চুল সাদা হবার বদলে আরো নরম আর চিকণ হয়ে শোভা পাচ্ছিল।

মামির যৌবন ক্ষয় করে দেবার জন্যে মামু য়ুনানী হাকিমদের সবরকম মাজন, পৌষ্টিক খাবার আর তেল ব্যবহার করেছিল। কিছুদিনের জন্যে তার বিদায়ী যৌবন থমকে গিয়েছিল। সৌন্দর্য ফিরে এসেছিল। দুনিয়াদারীর দাঁও-প্যাঁচ মামি কিছুই শেখে নি। সে ছিল আপনা-আপনি গজিয়ে-ওঠা গাছ। কখনো কেউ তাকে চালাকি শেখায় নি। বয়স আঠাশ বছর হয়েছিল, কিন্তু সে ছিল আঠারো বছর বয়সের যুবতীর মতো অনভিজ্ঞ আর চঞ্চল।

মোটর খুব বেশি চালালে ইঞ্জিন পুড়ে যায়। ওষুধের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল। শুজাঅত মামু শুকিয়ে যাচ্ছিল। একদম বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। যদি ঐ শরীর আর মস্তিষ্ক থেকে এত কিছু বেরিয়ে না যেত তা হলে বাষট্টি বছরে সবকিছুই শেষ হয়ে যেত না। এখন তাকে তার বয়সের থেকে অনেক বুড়ো দেখায়।

বোনেরা ফুঁ-ফুঁ করে কাঁদছিল। হাকিম, ডাক্তার জবাব দিয়েছিল। লোকে জোয়ান হবার লক্ষ ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিল। কিন্তু সময়ের আগে বুড়ো হবার কোনো ওষুধ ছিল না যা মামিকে খাইয়ে দেওয়া যায়। নিশ্চয়ই তার উপর কোনো চিরবসন্তের জিন বা পীর-মর্দ সওয়ার হয়েছিল—

তার ফলে তার যৌবনে ভাঁটা পড়ার কোনো লক্ষণই ছিল না। তাবিজ-কবচ হেরে গিয়েছিল। টোটকা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

অমরলতা ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

বটগাছ শুকিয়ে যাচ্ছিল।

ছবি হলে কেউ ছিঁড়ে দিত। মূর্তি হলে ফেলে দিয়ে চুরচুর করে দেওয়া যেত। আল্লার আপন হাতে বানানো মাটির পুতুল, সুন্দর এবং জীবন্ত। তার প্রত্যেক নিঃশ্বাসে যৌবনের উত্তাপ সুরভি ছড়াচ্ছিল, তাকে বশ করা যায় না। তার উঠন্ত সূর্যকে নামিয়ে দেবার

একই বিধি ছিল— তাকে ভাতে মারো। ঘি, মাংস, ডিম, দুধ একেবারে বন্ধ। যখন থেকে সুজাঅত মামুর হজমশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তখন থেকেই মামি কেবল বাচ্চাদের জন্য মাংস ইত্যাদি চেয়ে নিত। কখনো সখনো একটু কিছু নিজে চেখে নিত। এখন তা থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল। সকলে আশা করেছিল যে এইবার, আল্লাহ করুন, নিশ্চয়ই তার উপর বার্ধক্য নেমে আসবে।

'এ বউদি, এ কী ব্যাপার? তুমি ছুকরিদের মতো বাজে সালোয়ার পরো! আরো ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছ।' ননদরা বলেছিল, 'তোমার বয়সের উপযোগী ভারি-সারি পোষাক পরো…'

মামি সেলাই-করা দুপাট্টা আর গরারা পরেছিল।

'কোন্ ইয়ার-বন্ধুর কাছে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছ?' —মামু বিদ্রূপ করেছিল। মামি পোষাক পরতেও ভয় পেল।

'ও ঠাকরুন, এ কীরকম যে এক-আধবার নামাজ পড়ো। পাঁচবার নামাজ পড়ার অভ্যাস করো।'

মামি পাঁচবার নামাজ পড়তে লাগল। যখন থেকে মামুর ঘুম পাতলা আর অল্প হল, তখন থেকে রাতের নামাজের সময়ও জাগতে হত।

'আমার মরে যাওয়ার নামাজ (শুকরিয়া নামাজ) পড়ো।' মামু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

মামি তো এমনিতেই নরমশরীর ছিল, রোজ খিচ্‌খিচানিতে আরো দুর্বল হয়ে গেল। ঘি মাংস থেকে দূরে সরে থাকায় গায়ের রঙ আরো উজ্জ্বল হল। চামড়া এমনই সাফ চিকন হয়ে গেল যে একেবারে যেন আয়নার মতো এদিক থেকে ওদিকে দৃষ্টি চলে যায়। মুখের উপর এক অদ্ভুত আলো দেখা গেল। আগে যারা তাকে দেখত তাদের লালা ঝরত। এখন তার পায়ে মাথা দেবার আকাঙ্ক্ষা জাগল। যখন সকালের নামাজ-এর পর কুরান পাঠ করত তখন তার মুখের উপর হজরত মরিয়মের শুচিতাদায়ী রূপ এবং ফাতিমা ও জোহরার পবিত্রতা ছড়িয়ে পড়ত। তাকে আরো কমবয়সী আর

কুমারী বলে মনে হত।

মামুর কবর আরো কাছে আসতে থাকে আর সে মুখ ভরে অভিযোগ করতে ও গালি দিতে থাকে যে ভাগ্নে-ভাইপো ছাড়া সে জিন আর ফেরিশ্‌তাদের ফুসলে নিয়ে যাচ্ছে। চিল[3] চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে পড়ে জিনকে বশ করে ফেলেছে। সে জাদুর জড়িবুটি চেয়েচিন্তে খায়।

কলপের পরে এখন মেহেদী মামুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। মেহেদী লাগালেই হাঁচি হয়ে সর্দি হয়ে যায়। এতেই তার মেহেদীর প্রতি ঘৃণা হয়ে যায়। রুখসানা মামি তার চুলে মেহেদী লাগিয়ে দিলে সবদিক সামলানো সত্ত্বেও তার হাতে মেহেদীর রঙ দীপাশিখার মতো ঝকমক করে উঠত। তার হাত দেখে শুজাঅত মামুর মনে হত যেন মেহেদী নয় মামি তার হৃদয়ের রক্তে হাত ডুবিয়ে নিয়েছে। এক সময়ে সে ঐ হাতকে চামেলীর কলি বলে চুমু খেত, চোখে ছুঁইয়ে নিত; আজ তা শিক্‌রে বাজের মারাত্মক পাঞ্জার মতো যেন তার চোখের ভিতরে ঢুকে যেতে থাকে।

যতই সে মামিকে মুঁড়ির[4] (জড়ি-বুটি) মতো মাটিতে ফেলে পিষত ততই মামি চন্দনের মতো সুরভি ছড়াত।

বোনেরা নিজ নিজ ঘর থেকে পুষ্টিকর খাবার তৈরি করে ভাইকে খাওয়াবার জন্যে নিয়ে আসত, কারণ বলা তো যায় না বউদি বিষ খাইয়ে না দেয়। তারা আপন হাতে সামনে বসে খাওয়াত কিন্তু ঐ খানা খেয়ে মামুর অবস্থা আরো দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। একশিরার পুরানো রোগ তাকে খুব জোর ধরেছিল— তার যা অবশিষ্ট রক্ত ছিল তা নিংড়ে নিল। এখন ঐ অভাগার কুশ্‌তার[5] আশ্রয় নেওয়া বাকি ছিল— বিখ্যাত হাকিম সাহেবের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কয়েক শ' টাকা দিয়ে তৈরি করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসাপত্র ছিল রাজকীয় ঢঙের। ঐ পোষ্টিক যদি মরামানুষে খেত তাহলে ধড়ফড়িয়ে করে উঠে দাঁড়াত, কিন্তু মামু গোদের মতো ফোড়ায় ফোড়ায় ধরাশায়ী হয়ে গেল।

বেচারী মামি একশ বার ঘি-কে জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে তাতে গন্ধক আর কী কী সব ওষুধ বেটে ছেনে মেশাত। ঐ মলম বারবার লাগিয়ে

দিত। গামলা গামলা নিমপাতা জলে সিদ্ধ করা হত আর সকাল-সন্ধে পুঁজ রক্ত ধুয়ে দিত।

তারপর একদিন তো সব আঁধার হয়ে গেল। মামু খুবই দুর্বল হয়ে পড়ল। বোনেরা বসে বসে বউদির দুর্ভাগ্যে কাঁদছিল; খুদা জানেন কোথা থেকে নিজ্জী বুড়ি এসে মরছে। গোড়ায় তো শুজাঅত মামুকে নানা-জান ভেবে তার সঙ্গে ফ্লার্ট করেছিল। কোন যুগে নানা-জান তার উপর খুব দয়ালু ছিলেন। হতভাগী বুড়ি ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে মরে গিয়েছে। নানা-জানের মৃত্যুর পর বিশ বছর হয়ে গেছে আর সে নিজের পিচুটিভরা চোখে পুরনো স্বপ্ন জাগিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। অনেক দিন পার হবার পরে তাকে মামুর আসল সম্পর্ক বলে বুঝিয়েছিল, তখন মরা মামির জন্য শোক প্রকাশ করতে বসেছিল

'এ হে, বুড়ো বয়সে কী দোয়া দিয়ে গিয়েছেন?' হঠাৎ তার নজর মামির উপর গিয়ে পড়েছিল। মামি আঙিনায় পায়রার জন্য দানা ছড়াচ্ছিল। অদ্ভুত ঢঙে সে গলা ঝুঁকিয়ে বসেছিল যেন ছবি তোলাচ্ছিল। পায়রাগুলি তার কাঁচের মতো চকমকে হাতের চেটোয় শুড়শুড়ি দিচ্ছিল আর সে বিবশ হয়ে হাসছিল।

'হায়, আমি মরে গেলাম।' বুড়ি চাপাটির মতো মুখ করে রুখসানা মামির দিকে তাকিয়ে পরের দোষ নিজের মাথায় নেওয়ার ভঙ্গিতে কানের উপর দশ আঙুল চড়-বড় করে মটকাল।

'আল্লাহ্ মঙ্গলদায়ী, বদ নজর থেকে বাঁচাও, চাঁদের টুকরো আছে, আমি সেই ছেলেবেলা থেকে বছর গুণছি। এ মিঞা—' সে কিছু সলা-পরামর্শ করবার জন্য মামুর কাছে সরে এসেছিল— 'সওদাগরদের মেজো ছেলেটা বিলাত থেকে পাস করে এসেছে··· আল্লার কসম, একেবারে চাঁদ আর সূর্যের জোড়া হবে।'

কোনো যুগে বুড়ি এক নম্বর কুটনী ছিল। এখন তার বাজার বন্ধ হয়ে গেছে। চুলের ঝুঁটি শাদা হয়ে গেছে। হাত-পা বেঁকেচুরে গেছে। রুটির টুকরো চেয়ে চেয়ে দিন কাটায়।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত তো কেউ বুঝতেই পারে নি যে মড়া বুড়ি কী

বক্‌বক্‌ করছে। সওদাগরদের মেজো ছেলে যে বিলাত থেকে পাস দিয়ে এসেছে, সে তো সকলেরই জানা ছিল। কারুর সন্দেহ পর্যন্ত হয় নি যে বদমাশ বুড়ি রুখসানা মামির সঙ্গে সম্পর্ক লাগিয়ে দেবার তালে আছে।

'ইমাম হোসেনের কসম, আমি তো কঙ্কণের জোড়া নেব। কথাবার্তা শুরু করব?'

কথা যেই শুরু হয়েছিল আর মৌচাক ছেড়ে মাছি বেরিয়ে এল। চার তরফ থেকে তোপ দাগতে লাগল।

'এ হেঃ! আমার মতো বজ্জাতের আর কী খবর?' বুড়ি স্লিপার পরতে পরতে বাইরে ছুটে পালাল। পালাতে পালাতে মামির কাঁদো-কাঁদো চেহারার দিকে সে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। মুখের উপর তো সাফ কৌমার্য ঝরে পড়ছে।

ঐদিন শুজাঅত মামু কুরান হাতে নিয়ে সবার সামনে বলে দিয়েছিল যে এই দুই বাচ্চা তার নয়, পড়শীদের মেহেরবানীর ফল— তাদের দিকেই রুখসানা বেগম তাক-ঝাঁক করত।

ঐ রাতে মামু কাঁদছিল, আর্তনাদ করে পাশ ফিরছিল, আগুনের উপর শুয়েছিল। ঐ রাতে তার বড় মামির কথা খুব মনে হয়েছিল। তার মাথার চুল তো সময়ের আগেই পেকে গিয়েছিল। তার যৌবন তার বধূজীবনের অশ্রুতে বহে গিয়েছিল। ভালমানুষি আর সাধুতার প্রতিমা, সতীত্বের প্রতিমা— তার হিস্‌সার বার্ধক্যেও যে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছিল। আর পুণ্যাত্মা বউদের মতো স্বর্গে চলে গিয়েছিল। আজ যদি সে থাকত তবে এই বেদনা, এই জ্বলুনি, এই শাদা জড়িবুটির মতো মেহেদী-লাগানো কেশভার, এই আঘাত দেবার সম্পর্ক, এই নিঃসঙ্গতা অন্য দিকে চলে যেত। বার্ধক্য তাকে বিচলিত করত না। দুজনে একসঙ্গে বুড়ো হয়ে যেত, একে অপরের দুঃখ বুঝত, সাহায্য করত।

অমরলতা দিনে দ্বিগুণ রাতে চারগুণ বাড়তে থাকল। বড় গাছের গুঁড়ি ফোঁপরা হয়ে গেল। শাখাগুলি ঝুলে পড়ল। পাতা ঝরে

গেল ··· লতা আশেপাশের গাছের দিকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেল।

আত্মদাহের কেমন পরিবেশ ছিল। শুজাঅত মামুর শেষ শয্যা আঙিনায় পাতা হয়েছিল, সব সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। বোনেরা পড়ে পড়ে আছাড় খাচ্ছিল। মামু নিজের সব সম্পত্তি বোনদের নামে লিখে দিয়েছিল।

রুখসানা মামি সকলের থেকে আলাদা হয়ে দরজায় চেপে বসেছিল। যারা বলবার তারা বলছিল যে এত সুন্দর আর বিষাদে আচ্ছন্ন বিধবা তারা জীবনে কোনোদিন দেখে নি।

শাদা কাপড়ে তাকে এক অদ্ভুত আকর্ষণীয় স্বপ্নের মতো দেখাচ্ছিল। কেঁদে-কেঁদে চোখ নেশা-ভরা আর বোঝা-ভরা হয়েছিল। বিবর্ণ মুখ পোখরাজ-পাথরের মতো চকমক করে উঠছিল। যারা শোক-প্রকাশ করতে এসেছিল, তারা এ সবকিছু ভুলে কেবল তার দিকেই তাকিয়েছিল। মৃতের সৌভাগ্যে তাদের ঈর্ষা হয়েছিল।

মামির মুখের উপর আশ্রয়হীনতার ঔদাস্য আর মৃত্যুর বিষাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। ভয় আর হতভম্ব ভাবে তার মুখ আরো উদাসীন মনে হচ্ছিল।

দুই বাচ্চা তার আঁচলের সঙ্গে লেগে বসেছিল। তাকে ওদের বড় বোন বলে মনে হচ্ছিল।

সে এমনি চুপচাপ বসেছিল যেন সৃষ্টির সবচেয়ে নিপুণ শিল্পী নিজের অতুলনীয় তুলি দিয়ে কোনো ছবি এঁকে সাজিয়ে রেখেছে।

---

[1] একাদশ চান্দ্রমাস। আরবে এই মাসে লোকে ঘরেই থাকে। কোনো লড়াই বা যুদ্ধে যায় না। নূরজাহান এই মাসের নাম রেখেছিলেন খালী মাস। ভারতে এই খালী মাসের প্রভাব এই হয়েছে যে লোকে এই মাসে বিয়ে শাদী করানোও বন্ধ করে দিয়েছে আর একে বাজে মাস বলে মনে করে।

[2] চল্লিশ দিনের একান্ত সাধনা, যা কোনো মনস্কামনা পূরণের জন্যে কবচ-বেঁধে মন্ত্র পড়ে দেওয়া হয়।

[3] একটা ডাঁটালতা যার শিকড় বেটে লাগানো হয়ে থাকে। এই লতার অগ্রভাগ রক্ত শোধনের জন্য দেওয়া হয়।

[4] পুরুষত্ব লাভের জন্য খাওয়া হয় এমন পোষ্টিক।

দুই হাত

রামঅওতার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসছিল। বুড়ি মেথরানী চিঠি পড়িয়ে নেবার জন্য আব্বা মিঞার কাছে এসেছিল। রামঅওতারের 'ছুটি' হয়ে গেছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল তো! এই কারণে তিন বছর বাদে রামঅওতার ফিরে আসছিল। বুড়ি মেথরানীর চামড়া-ঝুলে-পড়া চোখে অশ্রু দেখা দিয়েছিল। কৃতজ্ঞতাবশতঃ সে দৌড়ে-দৌড়ে সকলের চরণ ছুঁয়েছিল যেন এই সব চরণের মালিকেরাই তার একমাত্র পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জীবিত সুস্থ অবস্থায় ফেরত এনেছিল।

বুড়ির বয়স পঞ্চাশ বছর হবে কিন্তু তাকে সত্তর বছরের মতো দেখায়। দশ-বারোটা ছোট-বড় ছেলের জন্ম দিয়েছিল। তাদের মধ্যে কেবল রামঅওতারই অনেক মানত্-টানত্ করার ফলে বেঁচে ছিল। তার বিয়ে দেবার এক বছর পুরা হয় নি, রামঅওতারের 'ডাক' এসে গিয়েছিল। মেথরানী অনেক ঝামেলা করেছিল কিন্তু কোনো ফল হয় নি। কিন্তু যখন রামঅওতার উর্দী পরে শেষবারের মতো তার চরণ স্পর্শ করতে এসেছিল, তখন তার দাপট দেখে বুড়িরও খুব দাপট হয়েছিল, যেন তার ছেলে কর্নেলই হয়ে গিয়েছে।

পিছনের মহলে চাকর-বাকররা মুচকি হাসি হেসেছিল। রাম-অওতার ফিরে আসার পর যে ড্রামা হবার আশা ছিল, সবাই তার সম্পর্কে উৎসুক হয়ে বসেছিল। যদিও রামঅওতার যুদ্ধক্ষেত্রে কামান-বন্দুক ছুঁড়তে যায় নি, তথাপি সিপাহীদের পায়খানা সাফ করতে করতে তার মধ্যে কিছুটা সিপাহিয়ানা রোয়াব আর ঠাঁট দেখা গিয়েছিল। ধূসর উর্দী পরে সেই পুরনো রামঅওতার তো আর সেই লোক ছিল না। এটা অসম্ভব যে সে গোরীর কার্যকলাপ চুপচাপ শুনবে আর তার তরতাজা খুন বদনামীর উপর খেপে না উঠবে।

বিয়ে করে আসার পর গোরীর যৌবন কত মচ্‌মচে ছিল। রামঅওতার যতদিন ছিল ততদিন তার ঘোমটা এক ফুট লম্বা ছিল আর কেউ তার মুখের রূপ-রঙ দেখতে পায় নি। যখন পতি বিদেশে গেল তখন সে কেমন ভেউ ভেউ করে কেঁদেছিল— যেন তার সিঁথির সিঁদুর চিরকালের মতো মুছে গেছে। কিছুদিন কাঁদো-কাঁদো চোখে মাথা ঝুঁকিয়ে সে পায়খানার টব বহন করত। তারপর ধীরে ধীরে তার ঘোমটার দৈর্ঘ্য কমতে থাকে।

কিছু লোকের ধারণা ছিল যে এই মেয়ে সারা বসন্ত ঋতুর হাত-ধরা। কিছু স্পষ্ট বক্তা বলেছিল গোরী একটা ছিনাল। রাম-অওতার চলে যাওয়ায় আপদ এসে জুটেছে। বদমাশ মেয়ে সবসময় 'হি—হি' করছে, সব সময় যেন মদমত্তা হয়ে হাঁটে। কোমরে পায়খানার টব বসিয়ে কাঁসার কাঁকন ছন্‌-ছন্‌ করে যেদিক দিয়ে সে চলে যায় সেদিকে লোকে বেহুঁশ হয়ে তাকিয়ে থাকে। ধোপার হাত থেকে সাবানের বাটি পিছলে চৌবাচ্চায় পড়ে যেত, বাবুর্চির দৃষ্টি তাওয়ার উপর ফুলে-ওঠা রুটি থেকে চলে যেত। ভিস্তীর ডোল কুয়াতে ডুবে যেত। চাপরাশিদের ব্যাজ লাগানো পাগড়ি হেলে গিয়ে কাঁধে ঝুলতে থাকত। আর যখন এই আপদের প্রতিমা ঘোমটার আড়াল থেকে নয়ন-বাণ ছুঁড়ে চলে যেত তখন সারা পিছন-মহল এক নিষ্প্রাণ দেহের মতো যেমন তেমন পড়ে থাকত। আবার হঠাৎ চমকে উঠে তারা একে অপরের দুর্গতি নিয়ে বিদ্রূপ করত। ধোপানী প্রচণ্ড রাগে মাড়ের কড়াই উল্টে দিত। চাপরাশিনী কোলে-রাখা বুকে-চেপে-রাখা ছেলেকে অকারণে ধমক দিত। বাবুর্চির তৃতীয় পক্ষের বিবির হিস্টিরিয়া হয়ে যেত।

নামে ছিল গোরী কিন্তু বদমাশ মেয়েটা ছিল কালো কুটকুটে— যেন উল্টানো তাওয়ার উপর কোনো নষ্ট মেয়ে পরোটা ভেজে চমকে উঠে রেখে দিয়েছে। চওড়া ফুঁক-দানীর মতো নাক, ছড়ানো ঠোঁট। তার সাত পুরুষে দাঁত মাজার ফ্যাশন ছিল না। চোখে বিস্তর কাজল দেবার পরেও ডান চোখের টেরাভাব ঢাকা যেত না। আবার টেরা

চোখেই কে জানে কেমন করে বিষ-মাখানো তীর ছুঁড়ত আর তা নিশানা ভেদ করত। মোষের চেয়ে চওড়া পা। যে দিক দিয়ে চলে যায় সে দিকে সরষের তেলের পচা গন্ধ ছেড়ে যেত। হাঁ, কণ্ঠস্বর ছিল আশ্চর্যরকমের মধুর। উৎসব-অনুষ্ঠানে যখন ভাবে বিভোর হয়ে কাজরী গাইত তখন তার কণ্ঠস্বর সবচেয়ে চড়ায় চলে যেত।

বুড়ি মেথরানী ওরফে তার শাশুড়ি ছেলে চলে যাওয়ার পর তার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। উঠতে-বসতে তাকে রক্ষার জন্য গালি দিত। তার উপর নজর রাখার জন্য পিছন-পিছন ঘুরত। কিন্তু এখন বুড়ির স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। চল্লিশ বছর পায়খানা বহন করার ফলে তার কোমর চিরকালের মতো এক দিকে বেঁকে গিয়ে ওখানেই থেকে গিয়েছিল। সে ছিল আমাদের পুরনো মেথরানী। আমাদের জন্মের পরে ফুল-নাড়ি ও-ই মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল। মায়ের প্রসববেদনা উঠলে সে এসে চৌকাঠের উপর বসত আর কখনো কখনো লেডি ডাক্তারকেও অনেক দরকারী পরামর্শ দিত। টোটকা চিকিৎসার জন্য মন্ত্রপূত তাবিজও নিয়ে পট্টীতে বেঁধে দিত। মেথরানীদের ঘরে সে একেবারে গুরুগম্ভীর বয়স্কের মর্যাদায় আসীন ছিল।

এমনি জনপ্রিয় মেথরানীর পুত্রবধূ হঠাৎ লোকের চক্ষুশূল হয়ে গেল। চাপরাশিনী আর বাবুর্চিনীর তো আরো অভিযোগ ছিল। আমাদের শান্ত-শিষ্ট বউদিদের মাথা তাকে ঢঙ করতে দেখে থমকে যেত। আর যে কামরায় তাদের স্বামীরা আছে সে কামরা ঝাঁট দিতে যদি সে যেত, তাহলে তারা হড়বড় করে বুক থেকে দুধের বাচ্চাদের মুখ সরিয়ে দিয়ে সেখানে দৌড়ত যাতে ঐ ডাইনী তাদের স্বামীদের উপর টোটকা প্রয়োগ না করে।

গোরী কী ছিল?— সে ছিল একটা মারকুটে লম্বা-লম্বা শিংওলা ষাঁড়— যা এখানে-ওখানে ছুটে বেড়াত। লোকে নিজ নিজ কাঁখের বাসন-গামলা দুই হাতে সামলে বুকে চেপে ধরত। আর যখন সে হাল্কা কোমল চেহারা নিয়ে ঘুরত তখন পিছন-মহলের মহিলাদের

এক হঠাৎ গড়ে-ওঠা প্রতিনিধি-মণ্ডল মায়ের দরবারে হাজির হত। খুব চেঁচামেচি হত, ভাবী বিপদ আর তার সাংঘাতিক ফলাফল নিয়ে তর্কবিতর্ক হত। পতিরক্ষার জন্য এক কমিটি বানানো হল যাতে সব বউদিরা হৈ-চৈ করে ভোট দিয়েছিল। মাকে ওই সমিতির সম্মানিত প্রধানের পদ দেওয়া হয়েছিল। সব মহিলা নিজ নিজ পদের মর্যাদা অনুযায়ী পিঁড়ি আর পালঙ্কের ধারের উপর একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিল। পানের দোনা ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল আর বুড়িকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। বাচ্চাদের মুখে মাই দিয়ে সভায় নিস্তব্ধতা রক্ষা করা হয়েছিল। মোকদ্দমা পেশ করা হয়েছিল। আমাদের মা খুব রোয়াবের কণ্ঠে বলেছিলেন—

'কীরে চুড়েল! তুই বদমাশ বউকে কি এইজন্যে ছেড়ে রেখেছিস যে সে আমাদের বুকের উপরে শিল নোড়া বাটে? তোর মতলবটা কী? মুখে কালি মাখাবি?'

মেথরানীও রেগে উঠেছিল। ফেটে পড়েছিল। বলেছিল—'কী করব বেগম সাহেবান? হারামখোরকে চার লাথি মেরেও ছিলাম। রুটিও খেতে দিই নি ··· কিন্তু রাঁড়ী তো আমার কব্জায় নেই ···'

'আরে ওর কি রুটির কিছু কম্‌তি আছে?' বাবুর্চিনী ঢিল ছুঁড়ল। সাহারানপুরের খানদানী বাবুর্চি ঘরের মেয়ে, আবার তৃতীয় পক্ষের বিবি। আল্লার আশ্রয়, কেমন তেজ আর রাগ ছিল। আবার চাপরাশিনী, মালিনী, ধোপানী—সবাই মোকদ্দমাকে আরো সঙিন করে তুলেছিল। বেচারী মেথরানী বসে বসে সকলের লাথি-ঝাঁটা খাচ্ছিল আর নিজের চুলকানি-ভরা থল্‌থলে গা চুলকাচ্ছিল।

'বেগম সাহেবান, আপনি যেমন বলবেন তেমন করতে দ্বিধা করব না। কিন্তু কী করব, মাগীর গলা টিপে দেব?'

টেঁটিয়াকে শিক্ষা দেবার তীব্র অভিলাষে ঐ মহিলাদের মনে খুশির ঢেউ উঠেছিল। আর সকলেরই মনে বুড়ির প্রতি সীমাহীন দরদ দেখা দিয়েছিল ···

মা রায় দিয়েছিলেন—'মড়াটাকে ধরে বাপের বাড়িতে ছেড়ে দে।'

'এ বেগম সাহেবান, এ কি কখনো হতে পারে?'

মেথরানী জানিয়েছিল যে বউ খালি হাতে আসে নি। সারা জীবনের কামাই পুরো দু'শ ফেলে দেওয়া যায় তো ওই দামাল মাগী হাতে আসবে। এই টাকায় তো দুটো গোরু কেনা যাবে। অনায়াসে কলসী ভরা দুধ দেবে। তখন এই রাঁড়ীকে দুই লাথি দেওয়া যাবে। আর যদি একে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এর বাপ খুব তাড়াতাড়ি একে অন্য মেথরের হাতে বেচে দেবে। সে কেবল ছেলের শয্যা-শোভা তো নয়। দুই হাতওয়ালা মেয়েমানুষ, কিন্তু সে চারটে পুরুষ মানুষের কাজ করে ফেলে। রামঅওতার যাওয়ার পর থেকে বুড়ি এত কাজ সামলাতে পারে না। এই বুড়ো বয়স বউয়ের দুই হাতের সাহায্য নিয়েই চলছে।

মহিলারা কেউ অবুঝ ছিল না। মামলা সামাজিক চালচলন থেকে সরে এসে আর্থিক বাস্তব অবস্থার উপর এসেছিল। সত্যি কথাই, বুড়ির জন্যে বউ থাকাই দরকার। কার এমন দিল আছে দু'শ টাকা ফেলে দেবে। এই দু'শ টাকা ছাড়াও বিয়েতে বেণের কাছ থেকে নিয়ে খরচ করেছে, লোকজন খাইয়েছে। বেরাদরীকে রাজি করিয়েছে। এই সমস্ত খরচ কোথা থেকে আসবে। রাম-অওতার যে বেতন পায় তা তো ধার শুধতেই বেরিয়ে যায়। এমন মোটা-তাজা বউ এখন তো চার শ' টাকার কমে পাওয়া যাবে না। পুরো সাফাইয়ের কাজের পর আশপাশের আরো চার কুঠিতে কাজ করে। মাগী কাজে চৌকস আছে।

মা শেষ সওয়াল দিয়ে দিলেন— 'যদি ঐ লুচ্চীর জল্‌দি-জল্‌দি কোনো ব্যবস্থা না করো তো কুঠির হাতায় থাকতে দেওয়া হবে না…'

বুড়ি অনেক চেঁচামেচি করল আর ফিরে গিয়ে বউকে প্রাণ ভরে অনেক গালি দিল। চুল ধরে মারলও। বউ তার কেনা-বউ। সে পিটতে থাকল, হড়বড় করে বকতে থাকল তারপর একদিন প্রতিশোধ হিসেবে সে সব চাকরদের ঘর তছনছ করে দিল। বাবুর্চি, ভিশ্‌তী, গোপা আর চাপরাশিরা নিজ নিজ বউদের ধরে ধরে খুব পিটল।

এখানে পর্যন্ত বউয়ের মামলায় আমার সভ্যা বউদির দল ও সম্ভ্রান্ত ভাইদের মধ্যে খচাখচি হয়ে গেল আর বউদিদের বাপের বাড়িতে তার পাঠানো হতে থাকল। ফলে বউ প্রতি ঘরে সই-পাখির কাঁটা হয়ে গেল।

কিন্তু দু-চারদিন পরে বুড়ি মেথরানীর দেওরের ছেলে রতীরাম আপন জ্যেঠিমার সঙ্গে দেখা করতে এল আর ওখানেই থেকে গেল। দুটো-চারটে কুঠিতে কাজ যা বেড়ে গিয়েছিল তা সে সামলে দিল। নিজের গাঁয়ে তো নিষ্কর্মা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার বউ এখনো নাবালিকা, একারণে দ্বিরাগমন হয় নি।

রতীরাম আসায় মৌসুম উল্টে-পাল্টে একেবারে বদলে গেল; যেন হাওয়ার ঝোঁকের সঙ্গে ঘন মেঘের দল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। বউকে বলে বলে সবাই চুপ হয়ে গিয়েছিল। কাঁসার কাঁকন মূক হয়ে গিয়েছিল। যেমন বেলুন থেকে হাওয়া বেরিয়ে গেলে সেটা চুপচাপ ঝুলতে থাকে তেমনভাবে বউয়ের ঘোমটা ঝুলতে-ঝুলতে নীচের দিকে বেড়েই গিয়েছিল। এখন সে নাকে দড়ি-না-বাঁধা বলদের বদলে একেবারে লজ্জাবতী বধূ হয়ে গিয়েছিল। পিছন-মহলের সব মহিলা সান্ত্বনার নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। স্টাফ-এর পুরুষরা যদি তাকে খোঁচাও দিত সে লজ্জাবতী লতার মতো লজ্জা পেত, আর যদি কেউ বেশী চোখ মারত তো সে ঘোমটার মধ্যে থেকে অশ্রু-ভেজা চোখের তেরছা নজরে রতীরামের দিকে দেখত, আর সে দৌড়ে এসে বাহু চুলকাতে চুলকাতে সামনে এসে দাঁড়িয়ে যেত।

বুড়ি শান্ত হয়ে দেউড়িতে বসে আধ-খোলা চোখে এই মিলনান্ত নাটক দেখত আর গুড়গুড়িতে টান দিত। চারদিকেই শীতল শান্তি ছেয়ে গিয়েছিল— যেন সব ফোড়া থেকে পুঁজ বেরিয়ে গেছে।

কিন্তু বউয়ের বিরুদ্ধে এক নতুন দল তৈরি হয়েছিল আর তাতে শাগির্দ-পেশার পুরুষেরা যোগ দিয়েছিল। কথায়-অকথায় যে বাবুর্চি একদিন তার পরোটা ভেজে দিত সে পায়খানার টব সাফ না করার জন্যে গালি দিতে থাকে। ধোপার অভিযোগ ছিল যে সে মাড়

লাগিয়ে কাপড় দড়িতে টাঙিয়ে দেয়, আর এই হারামজাদী ধুলো উড়িয়ে চলে যায়। চাপরাশি ময়দানে দশ-দশ বার ঝাড়ু দিত আর সে শয়তানী কান্না কেঁদে বেড়াত। যে ভিশ্‌তী তার হাত ধুইয়ে দেবার জন্য মশক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত আজ তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আঙিনায় জল ছেটাবার জন্যে বলে কিন্তু সে শোনে না, তার ফলে সে শুকনো জমিতে ঝাড়ু দিয়ে দিলে চাপরাশী ধুলো ওড়ানোর জন্যে দোষারোপ করে তাকে গালি দিতে থাকে।

কিন্তু সে মাথা ঝুঁকিয়ে সকলের তিরস্কার-গালি এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দেয়। কে জানে শাশুড়িকে গিয়ে কী বলে দিয়েছিল, ফলে বুড়ি চ্যাঁ-চ্যাঁ করে সকলের মাথা খেয়ে ফেলত। এখন তার দৃষ্টিতে বউ একেবারে শুদ্ধ আর ভালো হয়ে গিয়েছিল।

দাড়িওলা দারোগাজী সব চাকরদের সর্দার ছিল আর বাবাকে আসল পরামর্শদাতা বলে মানত। সে একদিন বাবার কাছে হাজির হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়াল আর ভয়ানক বদমায়েশী আর শয়তানীর কান্না কেঁদে বলল যে বউ আর রতীরাম অনুচিত সম্পর্ক সংস্থাপন করে সারা শাগির্দ-পেশাকে নোংরা করে দিয়েছে। বাবা মামলা সেশনে সোপর্দ করে দিলেন অর্থাৎ মাকে এতে লাগিয়ে দিলেন। মহিলাদের সভা ফের বসল আর বুড়িকে ডেকে আনিয়ে গালাগালি করা হল।

'আরে হারামজাদী, তুই কি জানিস তোর ছিনাল-বউ কী বদমায়েশী করে বেড়াচ্ছে?'

মেথরানী এমনি ঝাপসাভাবে তাকিয়েছিল যেন সে বুঝতেই পারছে না কার সম্পর্কে কথা হচ্ছে। আর যখন তাকে স্পষ্টাস্পষ্টি বলা হয়েছিল যে চোখে-দেখা সাক্ষীদের বক্তব্য এই যে বউ আর রতীরামের মধ্যে সম্পর্ক অশোভনীয় সীমা পর্যন্ত খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, দুজনকে খুবই যাচ্ছেতাই অবস্থায় ধরা হয়েছে, তখন তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ দেওয়াই বুড়ির উচিত ছিল। উল্টে বিগড়ে

গিয়েছিল। ভারি ঝামেলা লাগিয়ে দিয়েছিল যে রামঅওতার আজ যদি এখানে থাকত তো যারা তার নিষ্কলঙ্ক বউয়ের উপর কলঙ্ক লেপন করছে তাদের মজা দেখিয়ে দিত। বউ হারামজাদী তো এখন চুপচাপ রামঅওতারের কথা মনে করে চোখের জল ফেলছে। প্রাণ দিয়ে কাজকম্মও করছে। কারুর কোনো অভিযোগ থাকতে পারে না। ঠাট্টা তো কেউ করছে না। লোকে নিছক তার দুশমন হয়ে গেছে। বুড়ি কাঁদতে শুরু করল। তাকে অনেক বোঝানো হল কিন্তু সে শোক করতে লাগল যেন সারা দুনিয়া তার জান নিতে উদ্যোগী হয়েছে। বুড়ি আর তার নিষ্কলঙ্ক বউ লোকের কী ক্ষতিটা করেছে। সে তো কারুর কোনো-কিছুর মধ্যে নেই। সে তো সকলের সব রহস্য জানে কিন্তু আজ পর্যন্ত তো কারুর হাটে হাঁড়ি ভাঙে নি। তার কী দরকার আছে কারুর ছিদ্র অন্বেষণ করার? কুঠিবাড়িগুলির পিছনে কী না হয়ে থাকে? মেথরানী কারুর ময়লা লুকিয়ে রাখে না। এই দুই বুড়ো হাতে বড় বড় লোকের কত পাপ সে মাটি চাপা দিয়েছে। এই দুই হাত ইচ্ছে করলে রানীর সিংহাসন উল্টে দিতে পারে। কিন্তু না। কারুর সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা নেই। কিন্তু যদি তার গলায় ছুরি চালায় তো তাহলে সব-কিছু গড়বড় হয়ে যাবে, যেমন-তেমন কারো-না-কারো চাপা রহস্য আপন বুড়া কলজে থেকে বার করে দেবার দরকার বোধ করি হবে না।

তার ভ্রূভঙ্গী দেখে শীঘ্রই ছুরি-চালানেওয়ালীদের হাত ঝুলে পড়ল। সব মহিলাই তার পক্ষ নিতে লাগল। বউ যাই করুক-না-কেন তাদের নিজ নিজ কেল্লা সুরক্ষিত আছে তো। তা হলে অভিযোগটা হয় কী করে? আবার কিছুদিনের জন্যে বউয়ের প্রেমটা কম হল। লোকে কিছুটা ভুলে গেল। কিন্তু রহস্যভেদ-কারীরা ধরে নিয়েছিল যে কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে। বউয়ের ভারিসারি শরীরও বেশিদিন গণ্ডগোল লুকিয়ে রাখতে পারল না আর লোকে বুড়ির কাছে খুব হৈ-চৈ লাগিয়ে দিল। কিন্তু এই নতুন মামলায় বুড়ি বিলকুল হাবিজাবি বলতে লাগল। একেবারে

এমনি হয়ে যেত যেন একদম শুনতেই পাচ্ছে না। এখন সে প্রায়ই খাটের উপর শুয়ে থেকে বউ আর রতীরামের উপর হুকুম চালাত। কখনো কাশত, হাঁচত, বাইরে রোদে গিয়ে বসত। তখন ওরা দুজনে বুড়ির এমনই দেখাশুনা করত যেন সে কোন্ পাটরানী।

ভালো ভালো বউঝিরা তাকে অনেক বুঝিয়েছিল। রতীরামের মুখে কালি মাখাও। আর তার আগে রামঅওতার ফিরে এসে বউয়ের চিকিৎসা করিয়ে ফেলুক। সে তো নিজেই এই কৌশলে খুব নিপুণ। দুদিনেই সব-কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু বুড়ি কিছু বুঝতেই চাইল না। এদিক-ওদিকে সকলের কাছে অভিযোগ করতে লাগল যে তার হাঁটুতে আগের চেয়ে বেশী যন্ত্রণা হচ্ছে তার কারণ এইসব কুঠিবাড়িতে লোকে বেশি পরিমাণে নিষিদ্ধ দ্রব্য খেতে শুরু করেছে। কোনো-না-কোনো কুঠিতে পায়খানা লেগেই আছে। তার টাল-মাটাল বুঝানোওলারা জ্বলে পুড়ে যায়। মেনে নাও যে বউ মেয়েছেলের জাত, অজ্ঞ, বোকা। বড় বড় সম্ভ্রান্ত মহিলার পদস্খলন হয়ে যায়, কিন্তু ঐ বড় বড় ঘরের ইজ্জতদার শাশুড়িরা তো কানে তেল দিয়ে বসে থাকে না। কিন্তু কে জানে কেন এই বুড়ি ষাট বছরের হয়ে গেছে। যে বিপদকে সে খুব সহজেই কুঠিবাড়ির জঞ্জালের নীচে কবর দিয়ে দিতে পারে, তাকে চোখ এড়িয়ে সকলে সহ্য করে নিত।

রামঅওতারের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় বুড়ি ছিল। সব সময়েই ধমক দিত— 'রামঅওতারকে আসতে দাও। বলে দেব। তোদের হাড় মাস এক করে দেবে।'

আর এখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রামঅওতার জীবন্ত ফিরে আসছে। সমস্ত পরিবেশটাই দম বন্ধ করে নিয়েছিল। লোকে এক ভয়ংকর হাঙ্গামার অপেক্ষায় ছিল।

কিন্তু লোকেদের খুব রাগ হয়েছিল যখন বউ ছেলের জন্ম দিল। তাকে বিষ দেবার বদলে বুড়ি খুব খুশি হয়েছিল। রামঅওতাব চলে যাওয়ার দু' বছর বাদে ছেলে হবার পর বুড়ি একেবারেই

চমকিত হয় নি। ঘরে ঘরে ফাটা-ছেঁড়া পুরনো কাপড় আর অভিনন্দন কুড়োতে লাগল। তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা তাকে হিসেব করে অনেক বুঝিয়েছিল যে এই ছেলে রামঅওতারের হতেই পারে না, কিন্তু বুড়ি সবকিছু বুঝেও নস্যাৎ করে দিয়েছিল। তার বলবার কথা ছিল যে আষাঢ়ে রামঅওতার যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিল— তখন বুড়ি হলুদ কুঠির নয়া ঢঙের ইংরেজী পায়খানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, এখন চৈত্রমাস শুরু হয়েছে আর জ্যৈষ্ঠ মাসে বুড়িয়ার লু লেগেছিল কিন্তু সে খুব জোর বেঁচে গিয়েছিল। যখনি তার হাঁটুতে বেদনা বেড়ে যেত সে বলত—'বৈদ্যজী পুরো হারামী। ওষুধের মধ্যে খড়ি মিশিয়ে দেয়।' এরপর সে আসল কথা থেকে সরে গিয়ে নষ্ট মেয়েছেলে আর বোকাদের মতো উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করত। কারুর কারুর মাথায় এই কথা ঢুকেছিল যে এই কথা ঐ চালাক বুড়িকে বোঝানো যাবে না, কারণ সে না বোঝার সিদ্ধান্ত করে বসে আছে।

ছেলেটা হবার পর সে রামঅওতারকে চিঠি লিখিয়েছিল।··· 'রামঅওতার সমীপে— চুম্বন ও স্নেহ-সম্ভাষণের পরে অত্র সব কুশল জানিবে আর তোমার কুশল জানাইবে আর ভগবানের নিকট তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি আর তোমার ঘরে একটি পুত্রের জন্ম হইয়াছে সে-কারণে তুমি এই পত্রকে 'তার' বলিয়া জানিবে আর শীঘ্র আসিবে।'

লোকে ভেবেছিল রামঅওতার কিছুটা নারাজ হবে। কিন্তু সকলের আশায় ছাই পড়েছিল যখন রামঅওতারের খুশিতে ভরা পত্র এসেছিল যে সে ছেলের জন্য মোজা বেনিয়ান নিয়ে আসছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল আর, ব্যস, এখনি তার আসার কথা। বুড়ি নাতিকে হাঁটুর উপর শুইয়ে খাটের উপর বসে রাজত্ব করছিল। আচ্ছা, এর চেয়ে সুন্দর বার্ধক্য আর কী হতে পারে! সব কুঠির কাজ ঝটপট হয়ে যাচ্ছিল। মহাজনের সুদ সময়মত কায়দা-মাফিক চুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল আর হাঁটুর উপর নাতি-শুয়েছিল।

শেষপর্যন্ত লোকে ভেবেছিল, রামঅওতার যখন আসবে, আসল

ব্যাপার বুঝতে পারবে, তখন দেখে নেয়া যাবে। আর এখন রামঅওতার যুদ্ধ জিতে আসছে। শেষ তক ও তো সিপাহী বটে। রক্ত কেন গরম না হবে। লোকের হৃদয় ছিল উৎসাহ-ভরা। পিছন-মহলের বাতাবরণ বউয়ের সংকীর্ণ নজরের কারণে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল আর দু-চারটে খুন হবার আর নাক কাটবার আশায় জেগে উঠেছিল।

যখন রামঅওতার ফিরে এসেছিল তখন ছেলেটার বয়স বছরখানেক। পিছন-মহলে হৈ-চৈ লেগে গিয়েছিল। বাবুর্চি হাঁড়িতে খুব জল ঢেলে দিয়েছিল, যাতে সে নিশ্চিন্ত হয়ে কচ্ কচ্ করে মজা চাখতে পারে। ধোপারা মাড়ের কড়াই নাবিয়ে মাটিতে রেখে দিয়েছিল আর ভিশ্তী তার ডোল কুয়ার ধারে ফেলে দিয়েছিল।

রামঅওতারকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বুড়ি তার কোমর ধরে চেঁচাতে শুরু করল। কিন্তু পরক্ষণেই দাঁত বার-করা ছেলেটাকে রামঅওতারের কোলে দিয়ে এমনি হাসতে শুরু করেছিল যেন সে কোনোদিন কাঁদেই নি।

রামঅওতার ছেলেটাকে দেখে এতই লজ্জা পেয়েছিল যেন ছেলে-টাই তার বাপ। ঝটপট বাক্স খুলে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করেছিল। লোকে ভেবেছিল কুক্রী বা চাকু বার করছে কিন্তু সে যখন তা থেকে লাল বেনিয়ান আর হলদে মোজা বার করল, তখন সব চাকরবাকরদের পৌরুষের উপর যেন একটা জোর ঘা পড়ল।

'ধেত্তেরীকে। শালা সিপাহী হয়েছে ··· যুগ ভরে হিজড়া···'

আর বউ এমন সংকুচিতা হচ্ছিল যেন সে নববিবাহিতা বধূ। সে কাঁসার থালায় জল ভরে রামঅওতারের দুর্গন্ধভরা ফৌজী বুট খুলে নিয়েছিল আর পা ধুয়ে জল খেয়েছিল।

লোকে রামঅওতারকে বুঝিয়েছিল। বিদ্রূপ করেছিল। তাকে বোকা— বুদ্ধু বলেছিল, কিন্তু সে বোকার মতোই দাঁত বার করে হেসেছিল যেন কিছুই সে বুঝতে পারছে না। রতীরামের দ্বিরাগমন

হওয়ার কথা ছিল, সে চলে গিয়েছিল।

রামঅওতারের এই কাজে লোকে যতটা আশ্চর্য হয়েছিল তার চেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ হয়েছিল। আমাদের বাবা, যিনি সাধারণত চাকর-বাকরদের সম্পর্কে কৌতূহল দেখাতেন না, তিনিও কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলেন। সারা কানুনের জ্ঞান প্রয়োগ করে রামঅওতারকে জব্দ করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

'কী রে, তুই তিন বছর পরে ফিরলি ?'

'হুজুর ঠিক খেয়াল নেই, কিছু কম-বেশি এতই হবে …'

'আর তোর ছেলের বয়স বছরখানেক হবে ?'

'এতটাই তো মনে হয় হুজুর, কিন্তু শ্বশুর বড় বদমাশ…'

রামঅওতার লজ্জা পেয়েছিল।

'আরে, তুই এখন হিসাব কর…'

'হিসাব ? কী হিসাব করব হুজুর ?' রামঅওতার মরা-মরা গলায় বলেছিল।

'উল্লুকের বাচ্চা, এটা কী করে হল ?'

'আমি তা কেমন করে জানব, হুজুর। ভগবানের দান।'

'ভগবানের দান ? তোর মাথা·· এই ছেলে তোর হতে পারে না'··· বাবা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে জব্দ করতে চাইছিলেন যে ছেলেটা হারামী হলে সে কিছুটা জব্দের মত হয়ে যায়। ফের মরা-মরা গলায় বেকুবির সঙ্গে বলল—

'তা আমি কী করব, হুজুর, হারামজাদীকে আমি খুব মেরেছি···' ক্রোধভরে ছিটকে গিয়ে সে বলল।

'আরে, তুই একেবারে উল্লুকের বাচ্চা···বদমায়েশ মাগীটাকে বাইরে বার করে দিস নি কেন ?'

'না হুজুর, এ কি কখনো হতে পারে ?' রামঅওতার হে—হে করছিল।

'কেন রে ?'

'হুজুর, আড়াইশ-তিনশ টাকা আবার একটা বিয়ের জন্য কোথা

থেকে আনব? আর ভাই-বেরাদারীকে খাওয়াতে একশ-দুশ' টাকা খরচা হয়ে যাবে…'

'কেন রে, বেরাদারীকে কেন তোর খাওয়াতে হবে? বউয়ের বদমায়েশীর জরিমানা কেন তোকে দিতে হবে?'

'তা আমি জানি না, হুজুর। আমাদের সমাজে এই রকমই হয়ে থাকে…'

'কিন্তু ছেলেটা তোর নয়, রামঅওতার… ঐ হারামী রতীরামের।' বাবা রেগে গিয়ে বোঝালেন।

'তাতে কী হয়েছে, হুজুর… রতীরাম আমার ভাইয়ের মতো— …অন্য কেউ তো নয়… নিজেরই রক্ত সম্পর্কের…

'তুই একেবারে উল্লুকের বাচ্চা।' বাবা খচে গেলেন।

'হুজুর, ছেলেটা বড় হয়ে আমার কাজ গুছিয়ে নেবে।'

রামঅওতার সবিনয়ে বোঝাল। 'সে দু হাত লাগাবে, তখন বুড়ো বয়সের ভার কমে যাবে…'

রামঅওতারের মাথা লজ্জায় ঝুঁকে পড়ল। আর কে জানে কেন একদম রামঅওতারের সঙ্গে সঙ্গে বাবার মাথা ঝুঁকে গেল— যেন তার কাঠামোর উপর লাখ-লাখ কোটি কোটি হাত ছেয়ে গেল… এই হাতগুলি পাপপঙ্কিল নয়, শুদ্ধ। এ তো জয়ী— সংগ্রামী হাত যা দুনিয়ার মুখ থেকে ময়লা ধুয়ে দিচ্ছে। তার বুড়ো বয়সের বোঝা তুলছে।

এই মাটিতে লেগে-থাকা কচি-কচি কালো হাত ধরিত্রীর সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে দিচ্ছে।

বচ্‌ছো পিসি

যখন প্রথমবার আমি তাকে দেখেছিলাম তখন সে রহমান ভাইয়ের বাড়ির জানালায় বসে লম্বা-লম্বা গালি দিচ্ছিল আর অভিযোগ করছিল। এই জানালা আমাদের আঙিনার দিকে খোলা যেত আর কানুন অনুযায়ী তা বন্ধ রাখা যেত, কারণ পর্দানশীন বিবিদের সামনাসামনি হওয়ার ভয় ছিল। কোনো বিয়ে-শাদী, লেখালিখি, বিস্‌মিল্লাহ্‌র বিধি হলে রহমান ভাই তখুনি বাঈজীদের ডেকে আনাত আর গরীবের ঘরেও ওয়াহীদা জান, মুশতরী বাঈ আর অনবরী কাহারবা নেচে যেত।

কিন্তু মোহল্লা টোলার মেয়েরা তার নজরে আপন মা-বোন ছিল। তার ছোট ভাই বুন্দু আর গেন্দা ঐসব দিনে তাকা-ঝাঁকের ব্যাপারে মাথা ভাঙাভাঙি করেছিল। ঐরকমই রহমান ভাই মোহল্লার নজরে কোনো উঁচু মর্যাদায় আসীন ছিল না। সে বউয়ের জীবিতাবস্থাতেই আপন শালীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছিল। ঐ অনাথ শালী ছাড়া এই বউয়ের আর কেউ বেঁচে ছিল না। বোন এখানেই পড়ে থাকত। তার বাচ্চাকে পালত। কোল বুকের দুধ খাওয়ানোরই অভাব ছিল। বাকি সারা গু-মুত পরিষ্কার সে ই করত। আর কোনো হতচ্ছাড়ী তার বোনের বাচ্চার মুখে তাকে একদিন স্তন দিতে দেখেছিল। রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল, আর জানা গিয়েছিল যে বাচ্চাদের মধ্যে অর্ধেক হুবহু মাসির মতো দেখতে। ঘরে রহমানের বউ ইচ্ছে করলে বোনের দুর্গতি করতে পারত, কিন্তু পাঁচজনের সামনে কখনো অভিযোগ করে নি। একথাই বলত— 'যে কুমারীর লাঞ্ছনা করবে তার চোখ হাঁটুর সামনে আসবে।' হাঁ, বরের সন্ধান হামেশাই শুকিয়ে যেত, কারণ ঐ পোকা-ভরা কাবাবের বর কোথায় জুটবে? একটা চোখ বড় কড়ির মত ফুলে ছিল, একটা পা অল্প ছোট ছিল। কনুই বাঁকিয়ে হাঁটত।

সারা মোহল্লায় এক অদ্ভুত রকমের বয়কট হয়েছিল। রহমান ভাইয়ের কাছে কোনো কাজের দরকার হলে লোকে জোরগলায় বলে নিত। মোহল্লায় থাকবার অনুমতি দিয়েছি— একি কম দয়া ছিল! রহমান ভাই একে নিজের সবচেয়ে বড় সম্মান বলে মনে করতেন।

তার কারণ এই ছিল যে সে প্রায়ই রহমান ভাইয়ের জানালায় বসে লম্বা-চৌড়া গালি দিত, কারণ বাকি মোহল্লার লোক বাবার কাছে নত হত। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কে শত্রুতা করবে? ঐদিন প্রথমবার আমি বুঝেছিলাম যে আমাদের একমাত্র আপন পিসি বাদশাহী বেগম ছিলেন আর লম্বা লম্বা গালি আমাদের পরিবারকেই দিয়ে চলেছেন।

মায়ের মুখ ছিল বিষণ্ণ, তিনি ভিতরের ঘরে সংকুচিত হয়ে বসে-ছিলেন— যেন বচ্ছো পিসির কণ্ঠস্বর তাঁর উপর বজ্রের মতো ফেটে পড়ছিল। ন'মাসে-ছ'মাসে এইভাবে বাদশাহী বেগম রহমান ভাইয়ের জানলায় বসে আওয়াজ করতেন। বাবামশায় ওঁর দৃষ্টির আড়ালে মজা করে আরামকেদারায় লম্বা হয়ে শুয়ে সংবাদপত্র পড়তেন আর কখনো কখনো সুযোগ বুঝে এইসব কথার জবাবে কোন ছোট ছেলেকে দিয়ে এমনসব কথা বলিয়ে দিতেন যে বাদশাহী পিসি ফের পটকার মতো আওয়াজ করে উঠতেন আর অঙ্গার বর্ষণ করতেন। আমরা সবাই খেলাধুলা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আঙিনায় আলাদা আলাদা দল পাকিয়ে দাঁড়িয়ে যেতাম। গুটুর গুটুর করে আমাদের প্রিয় পিসির দোষারোপণ শুনতাম। জানালায় বসে তিনি তাঁর লম্বা-চৌড়া আকারপ্রকারে তাকে কানায় কানায় ভরে থাকতেন। তাঁর রূপ রঙ বাবার সঙ্গে খুব মিলে যেত— যেন তিনি গোঁফ ফেলে দিয়ে দুপাট্টা পরে বসে গিয়েছেন— দোষারোপ আর গালি শোনার পরেও আমরা খুব নিশ্চিন্তভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতাম।

উচ্চতায় সাড়ে-পাঁচ ফুট, চার আঙুল চওড়া কব্জি, বাঘের মতো চোয়াল, কর্কশুভ্র মাথার চুল, বড় বড় কথা, বড় বড় দাঁত, ভারী চিবুক; আর আওয়াজের কথা কে বলবে, বাবার চেয়ে কেবল এক

মাত্রা নিচে হবে।

পিসি ঠাকরুন সবসময় শাদা কাপড় পড়তেন। যেদিন পিসেমশাই মস্উদ আলী মেথরানীর সঙ্গে রঙ্গরহস্য শুরু করলেন সেদিন পিসি তার বদলে সব চুড়ি ঝনঝন করে ভেঙে ফেললেন। রঙিন দুপাট্টা খুলে ফেললেন। সেইদিন থেকে তিনি তাকে 'মরহুম' বা মরতে চলেছে বলে উল্লেখ করতেন। মেথরানীকে ছোঁয়ার পর তিনি ঐ হাতে তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করতে দেননি।

এই ঘটনা একেবারে যৌবনকালে ঘটেছিল আর সেদিন থেকেই তিনি 'বৈধব্য' পালন করে আসছেন। আমাদের পিসে আমাদের মায়ের চাচাও ছিলেন। তাতে কে জানে কী গণ্ডগোল ছিল। আমার বাবা আমার মায়ের চাচা হতেন আর বিয়ের আগে থেকেই, যখন তিনি ছোট ছিলেন, তখন আমার বাবাকে দেখে তিনি পেচ্ছাব করে ফেলতেন, আর যখন তাঁর একথা বোধগম্য হল যে তাঁর 'আশীর্বাদ' ঐ ভয়ানক লোকটার সঙ্গেই হবে তখন তিনি তাঁর দাদীর অর্থাৎ বাবার পিসির পেটরা থেকে আফিম চুরি করে খেয়েছিলেন। আফিম পরিমাণে বেশি ছিল না, আর তিনি কিছুদিন ভুগে নিরাময় হয়ে গিয়েছিলেন। তখন বাবা আলিগড় কলেজে পড়তেন। তার অসুখের খবর শুনে পরীক্ষা না দিয়েই চলে এসেছিলেন। অনেক কষ্ট করে আমার নানা— যিনি বাবার পিসতুত ভাই হতেন আর তাঁর বন্ধুও ছিলেন— তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পরীক্ষা দিতে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। যতদিন পর্যন্ত উনি ছিলেন ততদিন ক্ষুধাতৃষ্ণায় টলছিলেন। আধ-খোলা চোখে আমার মা দেখেছিলেন তার চওড়া ছায়া পর্দার পিছনে বৃথাই লাফিয়ে বেড়াচ্ছে—

'উমরাও ভাই! যদি তার কিছু হয়ে যায় তো··· '

দৈত্যের গলার আওয়াজে কাঁপন ছিল। নানা মিঞা খুব হেসেছিলেন।

'না রে ভাই। ভরসা রাখো··· কিছু হবে না।'

ঐদিন আমার ছোট্টখাট্ট সরল মা একদম মহিলা হয়ে গেলেন।

তার হৃদয় থেকে দৈত্যের অংশে জাত মানুষটির ভয় একেবারে চলে গেল। তবু আমার পিসিঠাকরুন বলেন, আমার মা জাদুকরী, আর বিয়ের আগে থেকেই তার ভাইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটিয়ে গর্ভপাত করিয়েছিল। আমার মা নিজের জোয়ান ছেলেদের সামনে যখন এই গালি শুনতেন তখন এমনি ভেউ ভেউ করে কাঁদতেন যে আমরা তাঁর প্রহার ভুলে গিয়ে তাঁকে আরো বেশি ভালবাসতাম। কিন্তু এই গালাগালি শুনে বাবার গম্ভীর দৃষ্টিতে পরী নাচতে থাকত। তিনি খুব আদরের সঙ্গে ছোট ভাইকে দিয়ে বলাতেন—

'পিসি আজ কী খেয়েছে?'

'তোর মায়ের কল্‌জে।'

ঐ অর্থহীন জবাব শুনে পিসি জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যেতেন। বাবা ফের জবাব দেওয়াতেন— 'আরে পিসি, তোমার মুখে ঘা হয়ে গেছে··· জোলাপ নাও, জোলাপ··· '

তিনি আমার জোয়ান ভাইয়ের তরতাজা লাশের জন্য কাক-চিলকে আমন্ত্রণ জানাতেন। কে জানে কেন তার নববধূ বেচারী ঐ সময় কোথায় ছিল আর নিজের স্বপ্নে বরের ভালবাসায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। পিসি বৈধব্যের আশীর্বাদ দিতেন আর আমার মা দু'কানে আঙুল দিয়ে অস্ফুটস্বরে বলতেন—

'জল্ তু জলান তু। আয়ী বলা কো টাল তু।'

বাবা ফের উস্‌কানি দিতেন আর ছোটভাই শুধাত—

'পিসি ঠাকরুন, মেথরানী-পিসির মেজাজ তো ভালই?' আর আমাদের ভয় হত যে পিসি কখনো জানালা দিয়ে লাফিয়ে না পড়ে।

'আরে যা সাপের বাচ্চা··· আমার সঙ্গে তর্ক করিস না— জুতো মেরে মুখ ভেঙে দেব। ঐ বুড়োটা অন্দরে বসে ছোঁড়াগুলোকে কী শেখাচ্ছে! মুগলের বাচ্চা হোস তো বেরিয়ে এসে কথা বল··· '

'রহমান ভাই, এ রহমান ভাই, এই পাগলা কুত্তীকে বিষ খাওয়াচ্ছ না কেন?'

আব্বার শেখানো-মতো ছোট ভাই ভয়ে ভয়ে বলত। তার তো

ঐভাবে ভীত হবার কোনো দরকার ছিল না, কারণ সবাই জানত কণ্ঠস্বর তার কিন্তু কথা বাবা মহাশয়ের—এই কারণে ছোট ভাইয়ের কোনো পাপ হবে না। কিন্তু ফের একেবারে বাবার-মতো চেহারার পিসির সামনে কিছু বলতে তার ঘাম বেরিয়ে যেত।

আমার দাদুর বাড়ি আর নানার বাড়ির মধ্যে আশমান-জমিনে কত তফাৎ ছিল! নানার বাড়ি ছিল হাকিমদের গলিতে আর দাদুর বাড়ি ছিল গাড়ীওয়ালাদের বাজারে। নানার বংশ সলীম চিশ্‌তীর পরিবারভুক্ত ছিল— যাকে মুগল বাদশারা মুরশিদ উপাধি দিয়ে মুক্তির পথ চিনেছিলেন। হিন্দুস্তানে বসবাস করার এক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছিল। এদেশী রঙ-রেওয়াজ নিয়েছিল। চেহারা নরম হয়েছিল। মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল।

দাদুর বংশ বাইরে থেকে সবচেয়ে শেষের বারে এসেছিল। মানসিকতার দিক থেকে তারা এখন পর্যন্ত ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেড়াচ্ছিলেন। রক্তে উত্তাপ বিকীর্ণ হচ্ছিল। খাঁটি তলোয়ারের মতো রূপ আর রঙ। লাল ফিরিঙ্গীদের মতো মুখ। গরিলাদের মতো উচ্চতা। গলার আওয়াজ বাঘের মতো। হাত পা কড়ি বরগার মতো।

নানার বংশের লোকদের হাত পা নরম-নরম। কবি-কবি চেহারা, মৃদু কণ্ঠে কথা বলায় অভ্যস্ত। বেশির ভাগই ছিল হাকিম, পণ্ডিত, মৌলবী। ঐ থেকেই গলির নাম হয়েছিল হাকিমদের গলি। কেউ কেউ কারবার-ব্যবসায়ে জড়িত হয়েছিল। শাল, কাপড়, সোনা-রুপোর ব্যবসায়ী আর আতরওলা হয়েছিল। যদিও আমার দাদুর বংশের লোকেরা এইরকম লোকদের সবজিওলা কসাইও বলত, কারণ তারা নিজেরা ফৌজের লোক ছিল। কুস্তী, পালোয়ানী, সাঁতারে নাম করেছিল। পাঞ্জা কষা, তলোয়ার চালানো আর দাবা-পাশা খেলা নানার বাড়ির প্রিয় খেলা ছিল। দাদুর বংশীয়েরা এই সবকিছুকে হিজড়েদের খেলা বলে মনে করতেন।

কথায় বলে যখন জ্বালামুখী পাহাড় ফুটতে থাকে তখন লাভা

উপত্যকার কোলে নেমে আসে। বোধ হয় ব্যাপার এই ছিল যে আমার দাত্থর বাড়ির লোকেরা নানার বাড়ির লোকেদের দিকে নিজেরাই চলে এসেছিলেন। এই মিলন কবে কে শুরু করেছিলেন— সবকিছু বংশ-লতিকায় লেখা আছে, কিন্তু আমার ঠিক মনে নেই। আমার দাত্থর জন্ম হিন্দুস্তানে হয় নি। দিদিমাও ঐ বংশের ছিলেন কিন্তু এক ছোটবোন অবিবাহিতা ছিল। কে জানে কী করে শেখদের ঘরে তার বিয়ে হয়েছিল। বোধহয় আমার মায়ের দাত্থ আমার দাত্থকে কোনোরকম জাত্থ করেছিলেন। তার ফলে তিনি নিজের বোনকে. পিসি ঠাকরুনের বর্ণনা অনুযায়ী, সবজিওয়ালা কসাইদের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের পরলোকগত পতিকে গালি দেবার সময় তিনি হামেশা আপন বাপকে কবরে শান্তি না পাওয়ার অভিশাপ দিতেন, কারণ তিনি চুঘতাই পরিবারের মর্যাদা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার পিসির ছিল তিন ভাই। আমার জ্যাঠা, আমার বাবা আর আমার কাকা। বড় তুজন তার জ্যেষ্ঠ, চাচা সকলের চেয়ে ছোট। তিন ভাইয়ের এক আদরের বোন। সবসময়ে নজর উঁচু। আর চট করে রেগে যেত। সে সর্বদা তিন ভায়ের উপর হুকুম করত আর স্নেহ আদায় করত। একেবারে বাচ্চাদের মতোই। ঘোড়া চড়ায়, তীর চালানোয় আর তলোয়ার চালানোয় অভ্যস্ত ছিল। হাত পা ছড়িয়ে দিলে তাকে বড় বলে মনে হ'ত। সে পালোয়ানদের মতো বুক টান করে চলত। বুকের ছাতিও ছিল তেমনি— চার চারটে মেয়ের বুকের ছাতির মতো।

বাবা মজা করে মাকে খোঁচা দিতেন।

'বাদশাহী বেগমের সঙ্গে কুস্তী লড়বে ?'

'উই ! তোবা তোবা,' পণ্ডিত বিদ্বান বাপের মেয়ে আমার মা কানে হাত রেখে বলতেন। কিন্তু বাবা ছোটভাইকে দিয়ে তখনি পিসিকে চ্যালেঞ্জ পাঠাতেন।

'পিসি ! আমাদের মায়ের সঙ্গে লড়বেন ?'

'হাঁ-হাঁ, ডেকে নিয়ে আয় তোদের মাকে, তাল ঠুকে আসুক। আর মেরে গাধা-না বানিয়ে দিই তো আমি মির্জা করীম বেগের সন্তান নই। বাপের রক্ত গায়ে থাকে তো মুল্লাজাদীকে ডেকে নিয়ে আয়…'

আর আমার মা নিজের লখনউএর বড়ো ঘেরের পায়জামা সামলে ঘরের কোণে সেঁধিয়ে যেতেন।

'পিসি ঠাকরুন! ঠাকুরদাদা গাঁওয়ার ছিলেন না? বড় নানাজান ওঁকে আমদনামা পড়াতেন…'

আমাদের পর-নানার দাদা কোনো একসময়ে ঠাকুরদাদাকে কিছু পড়িয়েছিলেন। বাবা খোঁচা দেবার কথা তচনচ করে বলিয়ে দিতেন।

'আরে, ও হাতে-মাটির ঢেলা আমার বাবাকে কী পড়িয়েছিল? বদমাশ কোথাকার! আমাদের রুটির টুকরোয় পালিত হ'ত।' সলীম চিশ্‌তী আর আকবর বাদশাহের সম্পর্কের হিসাব নিতে শুরু করতেন। আমরা চুঘতাই আকবর বাদশাহের পরিবারে ছিলাম, যার জন্যে আমার নানার বাড়িকে সলীম চিশ্‌তীর পীর-মুরশিদ বলা হত।

কিন্তু পিসি বলতেন— 'ছাই! পীর মুরশিদের লেজ! কবরখানার পাহারাদার ছিল, পাহারাদার!'

তিন ভাই ছিল কিন্তু তিনজনের সঙ্গেই তার লড়াই হত আর সে রেগে গেলে তিনজনেরই চরম দুর্গতি করে দিত। বড় ভাই খুব শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। তাঁকে ঘৃণা করে বলত ফকির ভিখারী। আমার বাবা সরকারী চাকরিতে ছিলেন, তাঁকে বলত বিশ্বাসঘাতক, ইংরেজের গোলাম। কারণ মুগল রাজ্য ইংরেজই খতম করেছিল নচেৎ আজ ঘৃত পাতলা ডাল-খানেঅলা জোলার দল, অর্থাৎ আমার পিসেকে, বিয়ে করার বদলে তিনি লাল কেল্লায় জেবুন্নিসার মতো গোলাপজলে স্নান করে কোনো দেশের শাহনশাহের বেগম বনে বসে থাকতেন। তৃতীয় ভাই, অর্থাৎ আমার চাচা, খুব বড় বদমাশদের দলে ছিলেন আর সিপাহীরা ভয়ে ভয়ে ম্যাজিস্ট্রেট-দাদার ঘরে তার হাজিরী নিতে

আসত। তিনি কয়েকটা খুন করেছিলেন। ডাকাতি করেছিলেন। মদ খাওয়া আর বেশ্যাবাজীতে তিনি নিজেই নিজের উদাহরণ ছিলেন। পিসি তাঁকে ডাকু বলতেন— যা ছিল তার কেরিয়ার-এর বড় শোভাবর্ধক বর্ণনা।

কিন্তু যখন তিনি আপন পতির প্রতি বিরক্ত হতেন তখন বলতেন —'মুখপোড়া! আমি হারামজাদী বজ্জাত নই। আমি তিন ভাইয়ের এক বোন। তাদের খবর দিয়ে দিলে তুই না থাকবি দুনিয়াতে, না থাকবি ধর্মে। আর কিছু নয়, যদি ছোট ভাই শুনে ফেলে তো পলকের মধ্যে আঁতের নাড়িভুঁড়ি বের করে হাতে দিয়ে দেবে। ডাকু আছে, ডাকু— তার হাত থেকে বেঁচে গেলে মেজো ভাই, ম্যাজিস্ট্রেট, তোকে জেলে পাঠিয়ে দেবে। সারাজীবন তোকে চাকিতে ঘোরাবে। আর তার হাত থেকেও যদি বেঁচে যাস তবে আল্লার শরণাগত বড় ভাই তোকে পরলোকে মাটিতে মিশিয়ে দেবে। দেখ, আমি মুগলের বাচ্চা। তোর মায়ের মতো শেখের বিবি নই।'

কিন্তু আমার পিসি ভালোমতো জানতেন যে তিন ভাই তাঁর উপর করুণা করে— আর তারা বসে বসে মুচকি হাসি হাসে। ঐ মিষ্টি মিষ্টি বিষ-ভরা মুচকি হাসি যার সাহায্যে আমার নানার বাড়ির লোকেরা আমার দাদার বাড়ির লোকেদের বছরের পর বছর জ্বালিয়ে আসছে।

প্রতি ঈদ-বকরীদে আমার বাবা ছেলেদের নিয়ে ঈদগাহ থেকে সোজা পিসিমার ওখানে দোষারোপ আর গালি দেওয়া শুনতে যেতেন। তিনি ঝট করে পর্দা ফেলে দিয়ে ঘরের ভিতর থেকে আমার জাদুকরী মা আর ডাকু মামাদের গালি দিতেন। চাকর ডেকে এনে সিমাইয়ের পায়েস পাঠাতেন কিন্তু এ কথা বলে দিতেন —'পড়শীরা পাঠিয়েছে।'

'এতে বিষ মেশানো নেই তো…' বাবা খোঁচা দেবার জন্য বলতেন। আর পিসি সারা নানার বংশকে ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে দিতেন। সিমাই খেয়ে বাবা ঈদী আশীর্বাদী টাকা দিতেন। পিসি তা তক্ষুনি

মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন—'নিজের শালাদের দাও। তারাই তোমার রুটিতে পালিত হয়েছে।' আর বাবা চুপচাপ চলে আসতেন। তিনি জানতেন পিসি ঠাকরুন ওই টাকাগুলি তুলে চোখে ছোঁয়াবেন আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাঁদবেন। ভাইপোকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ঈদী দিতেন—

'হারামজাদা, যদি বাবা-মাকে বলেছ তো তোমাদের টুকরো টুকরো করে কেটে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।'

বাবা-মায়ের জানা ছিল ছেলেরা কত ঈদী পেয়েছে। যদি কোনো ঈদের সময় কোনো কারণে বাবা না যেতে পারলে ডাকের পর ডাক আসতে থাকে—'নূসরত খানম বিধবা হয়ে গেছে। বেশ হয়েছে। আমার কল্‌জে ঠাণ্ডা হয়েছে।'

খারাপ-খারাপ সংবাদ সন্ধ্যা পর্যন্ত আসতেই থাকে আর তিনি নিজেই রহমান-ভাইয়ের কুঠিতে গালি বর্ষণ করতে চলে আসতেন।

একদিন ঈদের সিমাইয়ের পায়েস ইত্যাদি খেতে খেতে কিছুটা গরমির সঙ্গে বিবমিষা হল, বাবার বমি হয়ে গেল।

'নাও বাদশাহী খানম। বলা-কওয়া মাফ করে দিয়ো। আমি তো চললাম।' বাবা আর্তনাদ করতে থাকেন। পিসি চারদিকে পর্দা ফেলে বুকে করাঘাত করতে থাকেন। বাবাকে বদমায়েশীভাবে হাসতে দেখে উল্টে দোষারোপ করতে করতে চলে যেতে থাকেন।

'বাদশাহী খানম, তুমি এসে গেছ আর মৃত্যুদেবীও ঘাবড়ে গিয়ে পালিয়ে গিয়েছে, নয় তো আজ আমি খতম হয়ে গিয়েছিলাম,' বাবা বললেন।

জিজ্ঞাসা করবেন না পিসি কত সাংঘাতিক গালি দিয়েছিলেন। তিনি বিপজ্জনকভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—'আল্লাহ্ চান তো বাজ পড়বে। নালাতে পড়ে গিয়ে দম বেরিয়ে যাবে, লাশে কাঁধ দেবার মতো কেউ বেঁচে থাকবে না।'

আর বাবা তাকে খোঁচা দেবার জন্যে দুটো টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

'ভাই আমাদের খানদানী ডোমনীদের গালি দিলে তাদের বখশিশ

তো দিতেই হবে।'

আর খুব বিরক্তির সঙ্গে পিসি বলে পাঠালেন — 'বখশিশ দাও নিজের মায়ের বোনদের ...' আর নিজের মুখে করাঘাত করতে লাগলেন। নিজেকেই বললেন— 'এই বাদশাহী বাঁদী, তোর মুখে কালি পড়ুক। নিজের লাশে নিজেই পিটছিস!'

আসলে পিসির ভাইদের সঙ্গে শত্রুতা ছিল। ব্যস্, তাদের নামেই আগুন জ্বলে যেত। এমনিই বাবাকে ছাড়া মা নজরে এসে গেলে গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতেন। আদরের সঙ্গে 'নচ্ছো' 'নচ্ছো' বলে ডাকতেন—'বাচ্চারা ভালো আছে তো?' —আর একেবারে ভুলে যেতেন যে এই বাচ্চারা ওই বজ্জাত ভাইয়েরই ছেলে— তাকে তিনি সৃষ্টির আদি থেকে গালি দিয়ে আসছেন আর শেষদিন পর্যন্ত দোষারোপ করে যাবেন। মা তাঁর ভাইঝিও হতেন। কত গণ্ড-গোল ছিল। আমার দাদুর বাড়ি আর নানার বাড়ির সম্পর্ক ধরে আমার নিজের মা নিজের বোনও হতেন। এইভাবে আমার বাবা আমার ভগ্নীপতিও হতেন। আমার দাদুর বংশের লোকদের আমার নানার বংশের লোকেরা কত দুঃখই না দেয়! আশ্চর্য মনে হল যখন আমার পিসির মেয়ে মস্মরত খানম আমার জাফর মামুকে হৃদয় দিয়ে বসল।

হয়েছিল কী, আমার মায়ের দাদী অর্থাৎ বাবার পিসি যখন অসুখে মরো মরো তখন দুই তরফের লোকই সেবা করার জন্য হাতে হাত লাগিয়েছিল। আমার মামুও নিজের দাদীকে দেখতে গিয়েছিল আর মস্মরত খানমও নিজের মায়ের সঙ্গে তার পিসিকে দেখতে এসেছিল।

বাদশাহী পিসির মনে কোনো ভয়ডর ছিল না। সে জানত যে আমার নানার বংশের লোকদের তরফ থেকে তাদের আপন সন্তানের হৃদয়ে অনুক্ষণ ঘৃণা ভরে দেয়, আর পনেরো বছরের মস্মরত খানম-এর এমন কী বয়স হয়েছে! মায়ের কনুইয়ের সঙ্গে লেগে সে ঘুমোত। দেখাত যেন দুধ খাচ্ছে।

আমার মামু আপন কমল-শরবৎ-ভরা চোখে রোরুদ্যমানা সুন্দরী

মম্মরতকে দেখে ওখানেই জমে গিয়েছিল।

দিনভর বড়রা বুড়িরা শুশ্রূষা করে শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিল, আর আজ্ঞাবাহী ছোটরা শিয়রে বসে, রোগীর উপর যতটা নয়, একে অপরের উপর ততটা নজর দিচ্ছিল। যখন মম্মরত বরফ-ভেজানো কাপড় বড় ঠাকরুনের কপালে মুখে দেবার জন্য হাত বাড়াচ্ছিল তখন সেখানে আগে থেকেই জাফর মামুর হাত মজুদ ছিল।

পরের দিন বড়ঠাকরুন হঠাৎ চোখ খুলেছিলেন। কাঁপতে কাঁপতে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে উঠে বসেছিলেন। উঠে বসে পরিবারের জির্মাদার লোকদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যখন সবাই উপস্থিত হয়েছিল তখন হুকুম দিয়েছিলেন— 'কাজীকে ডাক।'

লোকে অবাক হয়ে গিয়েছিল— বুড়ি কাজীকে কেন ডেকে পাঠাচ্ছে? শেষ সময়ের সৌভাগ্য বানাবে? কারুর দম ফেলবার সাহস ছিল না।

'দুজনকে নিকাহ্ পড়াও।' লোকে অবাক হয়ে ভেবেছিল কোন্ দুজনকে। কিন্তু এদিকে মম্মরত যখন পট করে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল তখন জাফর মামু বিরক্ত হয়ে বাইরে চলে গেল। চোর ধরা পড়েছে। নিকাহ্ হয়ে গেল। বাদশাহী পিসি অবাক হয়ে গেল।

ওদের মধ্যে কোনো বিপজ্জনক কথা হয় নি, দুজনে কেবল হাত ধরাধরি করেছিল, তবু বড় ঠাকরুনের কাছে এটাই ছিল সীমা।

আর তখন বাদশাহী পিসির হার্ট-অ্যাটাক হয়েছিল. সে ঘোড়া আর তলোয়ার ছাড়াই লাশের পর লাশ ফেলে দিয়েছিল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মেয়ে-জামাইকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বিবশ হয়ে বাবা বর-কনেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। মা তো চাঁদের মতো ভাইবউ দেখে ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন। খুব ধুম-ধাম করে সোহাগরাতের পরদিনের ভোজ হয়ে গেল।

বাদশাহী পিসি ঐ দিন থেকে মেয়ের মুখ দেখে নি। ভাইয়ের সঙ্গে পর্দা করে নিয়েছিল। স্বামীর সঙ্গে গোড়া থেকেই পটছিল না। দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আর তার হৃদয়ে ও

মাথায় বিষ চড়ে গিয়েছিল। জীবন সাপের মতো ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছিল।

'বুড়ি নাতির জন্যে আমার মেয়েকে ফাঁসাতে এক ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছিল।'

সে বরাবর এ কথাই বলে চলেছিল, কারণ সত্যিই তিনি এর পরে আরো বিশ বছর বেঁচে ছিলেন। কে জানে পিসি হয়তো ঠিক কথাই বলেছিল।

মৃত্যু-মুহূর্ত পর্যন্ত ভাইবোনের মধ্যে মিল হয় নি। যখন বাবার চতুর্থবার হার্ট-অ্যাটাক হল তখন একেবারে শেষ সময় এসে গিয়েছিল। তখন তিনি পিসি ঠাকরুনকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন—'বাদশাহী খানম, আমার শেষ সময় এসে গিয়েছে। হৃদয়ের শেষ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চাও তো এসো।...'

কে জানে ওই সংবাদের মধ্যে কোন্ বাণ লুকিয়ে ছিল। বোনের প্রসারিত হৃদয়ের মধ্যে ভাই ধরা পড়ল। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে, বুক চাপড়াতে চাপড়াতে, ভূকম্পে গড়িয়ে-পড়া শাদা পাহাড়ের মতো বাদশাহী খানম সেই দেউড়ীতে আছড়ে পড়ল— যেখানে আজ পর্যন্ত সে পা রাখে নি।

'নাও বাদশাহী, তোমার দুয়া পুরো হতে চলেছে।' বাবা কষ্ট করেও মুচকি হাসি হাসলেন। এখন তাঁর চোখে ভাষা ছিল।

পিসি ঠাকরুন— সাদা চুল সত্ত্বেও তাকে সেই ছোট্ট 'বচ্ছো'র মতো দেখাচ্ছিল, যে ছোটবেলায় চাঞ্চল্য দেখিয়ে ভাইদের তার কথা মেনে নিতে বাধ্য করত। তার রাঙা আঁখি ছাগলছানার সরল আঁখির মতো সবকিছু স্বীকার করে নিয়েছিল। অশ্রুর বড় বড় ফোঁটা তার মর্মরশুভ্র গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল।

'বচ্ছো বোন, আমাকে খুব গালমন্দ করো' বাবা স্নেহের সঙ্গে বলেছিলেন। আমার মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বাদশাহী খানমকে গালমন্দ করতে অনুনয় করেছিলেন।

'ইয়া আল্লাহ্... ইয়া আল্লাহ্'— পিসি চিৎকার করে উঠতে

চাইছিল কিন্তু কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। 'ইয়া···ইয়া···ইয়া··· আল্লাহ্··· আমার জীবন রসুলের দুঃখ···' আর সে সেই বাচ্চাদের মতো বিবশ হয়ে পড়েছিল যাদের পাঠ মনে থাকে না।

সকলেরই মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বাবার শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল। ইয়া খুদা, আজ পিসির মুখ দিয়ে ভাইয়ের জন্য একটা গালিও বেরুল না।

তাকে গালি দিতে শুনে তিনি যেমন করে মুচকি হাসি হাসতেন ঠিক তেমনি করেই বাবা হাসছিলেন।

সত্যি কথাই, বোনেরা গালি দিলে ভাইদের লাগে না। তা মায়ের দুধে-ডোবা হয়ে থাকে।